Superior Suny

ডিসেম্বর, ২০১৬

রহস্য পত্রিকা

অতিপ্রাকৃত গল্প

মৃত্যুর ওপারে

ওয়েস্টার্ন উপন্যাসিকা

জালিয়াত

হরর গল্প

অভিশাপ

রোমাঞ্চ গল্প

ত্রাণকর্তা

BoiLovers.com Presents

বিচিত্র পৃথিবীর বিচিত্র উদ্ভিদ

অতিপ্রাকৃত উপন্যাসিকা

ইনফার্নো

ঘুরে এলাম স্বর্গরাজ্য

প্রবা প্রকাশনা

BoiLovers.com
Present

Book is free for all

Contact

www.boilovers.com

www.facebook.com/SuperiorSuny

01843-456129

৩৩ বর্ষ * ২ সংখ্যা * ডিসেম্বর ২০১৬

রহস্য পত্রিকা

এই সংখ্যায়

ভ্রমণ অভিজ্ঞতা
ঘুরে এলাম স্বর্গরাজ্য ৮
শেখ মহিউদ্দিন

অনুবাদ গল্প
শার্টের কলার ১৫
রূপান্তর: খসরু চৌধুরী

ফিচার
বিচিত্র পৃথিবীর বিচিত্র উদ্ভিদ ১৮
সান্তা রিকি
সুস্বাস্থ্যের জন্য হাঁটুন ৪১
ডা. ওয়ানাইজা
চিয়ারলিডার
সুড়সুড়ির বিনোদন ৬৩
অন্বেষা বড়ুয়া
জানা-অজানা ৮৯
শাহরীন সোনিয়া
ট্রিসমাস নাকি টিটেনাস? ১০৮
ডা. মোঃ ফারুক হোসেন
ম্যালেরিয়ার ওষুধ ১১১
ডা. মোঃ ফজলুল কবির পাভেল
প্রশ্ন-উত্তর ১৩৯
ফরিদা ইয়াসমিন

রোমাঞ্চ গল্প
ত্রাণকর্তা ২২
রূপান্তর: মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
রাতের কল ৪৯
রূপান্তর: মাহবুবুর রহমান শিশির

আত্ম-উন্নয়নমূলক গল্প
জীবনদর্শন ৩২
অর্পণ দাশগুপ্ত

রহস্য গল্প
মুখোশ ৩৭
ইমরান হোসাইন ইমু

মিনি রোমাঞ্চ গল্প
নাগদহ ৪৩
আমিনুর রহমান মোঃ তারেক

হরর গল্প
অভিশাপ ৫৭
মিজানুর রহমান কল্লোল

ওয়েস্টার্ন উপন্যাসিকা
জালিয়াত ৬৬
মোঃ খালেদুল ইসলাম খান

অতিপ্রাকৃত উপন্যাসিকা
ইনফার্নো ৯০
তৌফির হাসান উর রাকিব

ভৌতিক গল্প
প্রতিশোধ ১১২
রূপান্তর: সৈয়দা আফসানা মান্নান

অতিপ্রাকৃত গল্প
মৃত্যুর ওপারে ১১৯
রিয়াজুল আলম শাওন

অলৌকিক গল্প
সেলফি ১২৭
প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

মেট্রোপলিটন গল্প
মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন ১৩৪
ডিউক জন

আরও রয়েছে

খোলা চিঠি ৫ ইতিহাসের গল্প ৭ আত্ম-উন্নয়ন ৩০
আপনার স্বাস্থ্য ৩৪ রোমাঞ্চকর দুটি অভিজ্ঞতা ৪৫
বিজ্ঞান বার্তা ৫২ ভ্রমণ স্মৃতি ৫৪ অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতা ৮৭
গল্পকলি ১০৯ ঘর-সংসার ১১৪ ভাগ্যচক্র ১২৪ শব্দ-ফাঁদ ১৩৩
ভৌতিক উপকথা ১৪০ বই-পরিচিতি ১৪৪

সম্পাদক
কাজী আনোয়ার হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
কাজী শাহনূর হোসেন
কাজী মায়মুর হোসেন

শিল্প সম্পাদক
ধ্রুব এষ

প্রকাশনা ও মুদ্রণ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগ
রহস্যপত্রিকা
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: ৮৩১৪১৮৪
মোবাইল: ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
www.faccbook.com/shebaofficial

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭

প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

মূল্য :: চল্লিশ টাকা

NEED DONATION

CAN DONATE

BOILOVER.COM

IF YOU WANT

Donate on

01843-456129

খোলা চিঠি

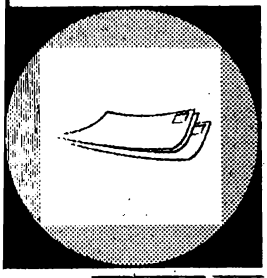

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

আশরফি করিম

মাত্র কয়েক দিন আগে রায়েরবাজার গিয়েছিলাম। পুকুর সংলগ্ন ভাঙাচোরা এক লাল দেয়াল–দেয়ালে এক জানালাও আছে–কিন্তু কোনও কপাট নেই–এ জানালা যে বন্ধ হবার নয়–মূল ফটক পেরিয়ে জুতো হাতে নিয়ে সামনে এগোলাম–আর একটু এগিয়ে বুঝলাম বেকুব কেবল আমি একাই। যত্রতত্র টোকাই আর ফকির–ঠিকই আছে–আমি যে অধিকারে এখানে ঢুকেছি, বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে তাদেরও সমান অধিকার। বাঁধানো বেঞ্চগুলো সব কপোত-কপোতীদের দখলে। চারদিকে অযত্ন আর অবহেলার ছাপ। অপরিষ্কার–বুঝলাম শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস অর্থাৎ, ১৪/১২/১৫-এর পর শ্রাবণ দিনের বৃষ্টি ছাড়া আর কেউ ধোয়া-মোছা করেনি। বিস্ময় বুঝি পুরোটাই বাকি ছিল–বিকেলের সোনা রোদ শেষে নিকষ কালো রাত নেমে এল, কিন্তু এক বিন্দু আলো জ্বলল না কোথাও। এ আঁধারে সব অন্যায় কত সহজ। এত বড় এক শোকের দেয়াল–ডেভিড কপারফিল্ডের জাদুর মত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। '৭১ থেকে ২০১৬–তাঁরা তাঁদের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে চলে গেলেন–কিন্তু আমরা তাঁদের স্মরণে এখানে একটা প্রদীপও জ্বেলে রাখতে পারলাম না। না–সেদিনের তোলা কোনও ছবিই দিলাম না। মোবাইলের ক্যামেরায় এমন কোনও ফ্রেম খুঁজে পেলাম না যেটা আমি দেখতে চাই।

মোঃ রাফিজুল হোসেন উজ্জ্বল

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লেখানোর একটা সুপ্ত বাসনা পৃথিবীর সবার মাঝেই রয়েছে। আর তার জন্য কত মানুষ কত ধরনের প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে তা তো সবারই জানা। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশের নামও গিনেস বুকে উঠে গেছে–পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মানব পতাকা তৈরি করে। শুনে নিশ্চয়ই সব বাঙালির বুকটা ফুলে উঠেছে। ছোট একটি দেশ হয়েও আমরা রেকর্ড তৈরি করতে জানি।

খবরের কাগজ খুললে বিভিন্ন খারাপ খবর মনটা বিষিয়ে দেয়। আমরা কোথায় বাস করি! মানুষ হিসেবে কি আমাদের এতটুকু মূল্য নেই? মাত্র দশ টাকার জন্য বন্ধু, বন্ধুকে খুন করে। কেউ আবার জনসমাবেশে বোমা মেরে মানুষ হত্যার জন্য স্ত্রীর ব্যাঙ্ক হিসাবে টাকা নেয়। কেউ অফিসে বসে গুনে-গুনে ঘুষ নেয়। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সেবার পরিবর্তে আমাদের দেয় নানা ধরনের ভোগান্তি। বড়-বড় আমলারা তাদের সম্পদ বৃদ্ধিতেই ব্যস্ত বেশি। আমাদের শিক্ষার মান দিনকে দিন নিম্নমুখী হচ্ছে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে নেই পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা। সাগর-রুনি, তনু হত্যার কোনও বিচার পায় না তাদের পরিবার। সরকারি-বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলো থেকে চলছে হরিলুট। বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার

বিজ্ঞপ্তি

রহস্যপত্রিকায় লিখতে হলে লেখার সাথে অবশ্যই ফেরত খাম (নাম-ঠিকানা ও ডাকটিকেট সহ) বা পোস্টকার্ড পাঠাতে হবে। লেখা মনোনীত হোক বা না হোক আপনার ঠিকানায় চিঠি দিয়ে তা জানিয়ে দেয়া হবে। আমাদের মনোনীত কোনও লেখা অন্য কোনও পত্রিকায় পাঠালে অবশ্যই যথাশীঘ্রি সম্ভব আমাদের জানাতে হবে। সেক্ষেত্রে সেই লেখাটা আমরা ছাপব না। খোলা চিঠি ও প্রশ্নোত্তর বিভাগগুলোর জন্য ফেরত খাম পাঠাতে হবে না। যে-কোনও লেখার কপি রেখে পাঠাবেন, তবে ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়।

হয় তরুণী, প্রেমে সাড়া না দেয়ায় নবগ্রামের নবম শ্রেণীর নিতু মণ্ডলকে দিনে-দুপুরে কুপিয়ে হত্যা করে তারই এক প্রতিবেশী। খবরের কাগজ খুললেই সব মন খারাপ করা খবর। এর ভিতর কিছু-কিছু খবর আবার আমাদের মনকে বেশ চাঙা করে তোলে। বেঁচে থাকার আশা জাগায়। তেমন এক আশার খবর দিলেন তারাগঞ্জবাসী। যেখানে আমরা বনভূমি ধ্বংস করার প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেছি, যেখানে আমরা পাহাড় কেটে সমতলভূমি তৈরি করে তাতে সুউচ্চ ভবন করছি পরিবেশ ধ্বংস করে, সেখানে কেউ-কেউ তাঁদের ক্ষুদ্র বলয় থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছেন এই বৈরী পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ পেতে। কেউ আবার নেন সাহসী পদক্ষেপ। তেমনি একটি সাহসী উদ্যোগ নিলেন তারাগঞ্জের ইউএনও জিলুফা সুলতানা। দেশের নিম্নতম প্রশাসনিক ইউনিট উপজেলা। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত জেলা রংপুরের একটি উপজেলা তারাগঞ্জ। সেই উপজেলার সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করার কারিগর জিলুফা সুলতানা। তাঁর ছোট বুকের ছোট একটি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সহায়তা নিয়েছেন স্থানীয় নেতাদের। উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের আস্থা অর্জন করেছেন। আর প্রেরণা ও সমর্থন পেয়েছেন স্থানীয় জনগণের। সবার সমর্থনে তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন 'সবুজ তারাগঞ্জ গড়ি' প্রকল্পের। পরিকল্পনা করেন এক ঘণ্টায় আড়াই লাখ গাছ লাগানোর। মনের সুপ্ত কোণে হয়তো লুকানো ছিল রেকর্ড গড়ার স্বপ্ন। এক ঘণ্টায় ২ লাখ ২৩ হাজার ৩৯০টি গাছ লাগিয়ে রেকর্ড করেছিল ফিলিপাইন। জিলুফা সুলতানা এই রেকর্ড ভাঙার উদ্যোগ নিয়েছেন। সহজ কথায় রথও দেখা হলো, কলাও বেচা হলো। গাছও লাগানো হলো, রেকর্ডও ভাঙা গেল। সব প্রতিকূল অবস্থাকে নিজের অনুকূলে এনে তিনি এই অসাধ্য কাজটি সমাধা করেছেন। ১৫৩টি রাস্তায় ৪০ প্রজাতির আড়াই লাখ গাছ রোপণে অংশ নিয়েছেন সমাজের সব স্তরের মানুষ। নারী ও পুরুষ, যুবক-কিশোর ও বৃদ্ধ, শিক্ষক-কর্মচারী, খেতমজুর-দিনমজুর থেকে সবাই। ভোরে ফজরের নামাজের পর সব মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেয়া হয়, বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে, ড্রামে শব্দ তুলতেই গর্ত খুঁড়ে গাছের চারা লাগানো শুরু করেন সবাই। আগে থেকেই সমস্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রস্তুত ছিল আড়াই লাখ গাছের চারাও। আম, কাঁঠাল, আমলকী, আতা, বেল, জলপাই, জামরুল, লটকন, নিম, অর্জুনসহ সবই দেশীয় প্রজাতির চারা লাগানো হয়েছে। এগুলো বড় হলে বৃক্ষনির্ভর প্রাণীর জন্য বড় উপকার হবে। মানুষের জন্য হবে বড় এক সম্পদ। বেশি উপকৃত হবে আমাদের পরিবেশ। চারাগুলো যখন পরিপূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হবে তখন তারাগঞ্জের চেহারা আমূল পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তারাগঞ্জ পরিণত হবে একটি সবুজ চিরসুন্দর উপজেলায়। এই আড়াই লাখ চারা সংগ্রহ করা কোনও সহজসাধ্য কাজ ছিল না। সবাইকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করাও কোনও সহজ কাজ ছিল না। কাজটির রূপকার জিলুফা সুলতানা হলেও মূল কষ্টসাধ্য কাজটি কিন্তু করেছেন তারাগঞ্জবাসী। সত্যিকার তারা কিন্তু তাঁরাই।

গিনেস রেকর্ডে আমাদের নাম উঠেছে কি না তা জানা নেই। কিন্তু গিনেসে নাম উঠুক আর না-ই উঠুক আখেরে লাভ কিন্তু আমাদেরই হয়েছে। আমরা দেখলাম সদিচ্ছা থাকলে আর কুশলী হলে অনেক বড় কাজেও গোটা সমাজকে সম্পৃক্ত করা যায়। আর তা করে দেখাতে পারেন ইউএনও পর্যায়ের একজন কনিষ্ঠ কর্মকর্তা; যেখানে আমাদের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বড়-বড় রাঘব বোয়াল কর্মকর্তারা শুধু বিবৃতি দিয়েই খালাস। রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলা স্বপ্নের উদ্যান হবে বলে যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন সে স্বপ্নের অংশীদার গোটা সমাজ। আমরা কি পারি না তারাগঞ্জের মত আমাদের দেশের সমস্ত উপজেলাকে সবুজে মুড়ে দিতে? আমরা চাইলেই অনেক কিছু পারি, তার নজির ইতিহাসে অনেক আছে। আমরা চাইলেই আমাদের এই কংক্রিটের শহরটাকে আবার একটি সবুজ শহরে পরিণত করতে পারি। আমরা যদি নিজ উদ্যোগে আমাদের বিল্ডিঙের আশপাশে, সামনের রাস্তায় একটি করে গাছ লাগাই তা হলেই আমাদের এ শহর আবার প্রাণ ফিরে পাবে। আমরা ফিরে পাব বিশুদ্ধ বাতাস আর বুক ভরে নিতে পারব নির্মল শ্বাস। শুধু দরকার ছোট একটি স্বপ্নের–যা দেখেছিলেন জিলুফা সুলতানা।■

ক্ষমা

রুবেল কান্তি নাথ

সে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

একদিন জয়নাব গর্ভবতী অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে উটের পিঠে চেপে মক্কা ছেড়ে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাচ্ছিলেন।

পথের মাঝে হাব্বার তাঁদের গতিরোধ করল। জয়নাবকে উটের পিঠ থেকে নামিয়ে আনল। আতঙ্কে জয়নাবের গর্ভপাত হয়ে যায়, আর তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

হাব্বার পালিয়ে গেলেও কয়েক মাস পর ধরা পড়ে গেল। তাকে মুহম্মদের কাছে নিয়ে আসা হলে সে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

কন্যার হত্যাকারী জেনেও শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দিলেন হযরত মুহম্মদ (সাঃ)।

তিনি চাইছিলেন সমস্ত আরবের মানুষ, যারা ভিন্ন-ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে হানাহানি-মারামারি করে চলেছে, তাদের এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করতে, যাতে তারা হানাহানি-পারস্পরিক বিদ্বেষ ভুলে ভ্রাতৃত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়ে। ■

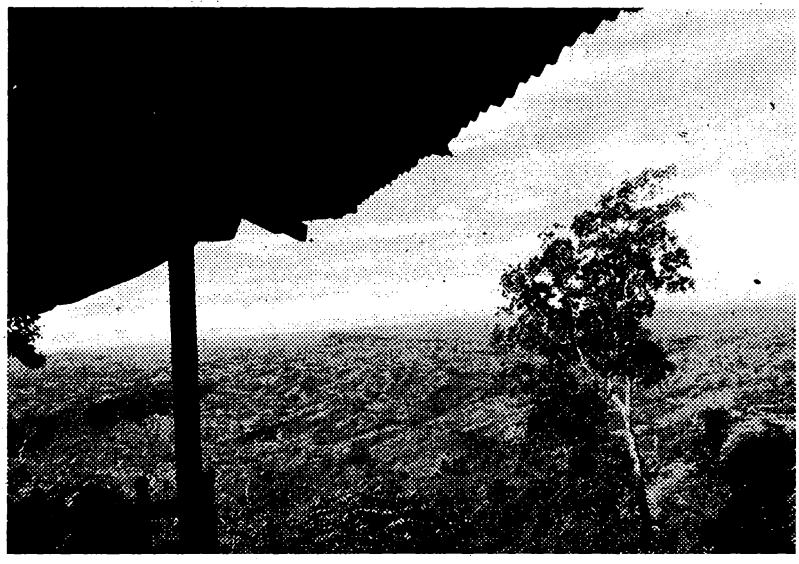

ঘুরে এলাম স্বর্গরাজ্য

শেখ মহিউদ্দিন

গত সেপ্টেম্বরে আমার ছোট মেয়ের কাছে শুনলাম, 'গ্রিন বেল্ট' নামে সদ্য জন্ম নেয়া, কয়েক বন্ধু মিলে গড়া, ছোট একটি সংস্থা এক ট্যুর প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছে। খবরটা সে পেয়েছে ফেসবুক থেকে। আমি ফেসবুক ব্যবহার করি না বলে এ ব্যাপারে অবগত ছিলাম না। ছিন্নমূল ছেলে-মেয়েদের জন্য ওরা দুটি স্কুল পরিচালনা করে। বাচ্চাদের জন্য বই-খাতা, পেন্সিল, এসব তো জোগাড় করে দেয়ই, বিনামূল্যে চিকিৎসাও করে। বন্ধু-বান্ধব মিলে বিনা বেতনে শিক্ষা দান করে। এ-ও জানলাম, ওই ট্যুর প্রোগ্রাম থেকে আয় করা অর্থের বড় একটা অংশ চলে যাবে 'স্বপ্ন রথ' নামে ওই স্কুলের ফাণ্ড-এ। তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম, যাব ওই প্যাকেজ ট্যুর-এ। ছিন্নমূল ছেলে-মেয়েদের সহযোগিতা করার বাসনা মনের গহীনে বাস করলেও সাধ্যে কুলোয় না সবসময়।

২৯ সেপ্টেম্বর সপরিবারে রওনা হলাম। গন্তব্য রাঙ্গামাটি জেলার অখ্যাত এক গ্রাম–সাজেক। এ, বর্তমানে যার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে সম্ভবত বিদেশেও।

রাত দশটা ত্রিশের গাড়িতে আমাদের পনেরো জনের দলটি প্রথমে যাব খাগড়াছড়ি। বাস ঢাকা শহর পেরিয়ে যেতেই ঝিমুনি এসে গেল। ঝিমুতে-ঝিমুতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ কেটে

গেছে জানি না, হঠাৎ বাসের বেরসিক সুপারভাইজারের হাঁক শুনে মনোরম কাঁচা ঘুমটা ভেঙে মেজাজ খিঁচড়ে গেল। চোখ কচলে তাকিয়ে দেখি কুমিল্লার চোদ্দগ্রামে রেস্টুরেন্ট-কাম-রিফ্রেশমেন্ট হাউস-এ বাসটা দাঁড়িয়ে। রাত তখন দুটো বেজে দশ। লোকটা কুড়ি মিনিটের বিরতি ঘোষণা করল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তলপেটে চাপ অনুভব করলাম। তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে নিজেকে হালকা করে নিলাম। হাত-মুখ ধুয়ে কয়েকটা বিস্কুট আর এক কাপ কড়া চায়ে অতিকষ্টে ঘুম তাড়াবার চেষ্টায় লেগে পড়লাম। চোখের পলকে যেন কুড়ি মিনিট পেরিয়ে গেল।

বাসে ওঠার পর আবার সেই ঝিমুনি, তারপর ঘুম, এভাবে কেটে গেল বেশ কিছু সময়। মোটামুটি গভীর ঘুমেই ঢলে পড়েছিলাম, হঠাৎ বাসের প্রচণ্ড দুলুনিতে ঘুম ভাঙার পর দেখি পাহাড়ি পথে এঁকে-বেঁকে চলেছি। কখনও বেশ উপরে উঠছি, আবার পরমুহূর্তে নিচে নামছি। খুব ঘন-ঘন বাঁক নিচ্ছে গাড়ি। আশপাশের যাত্রীদের কাছ থেকে জানলাম, মীরসরাই সদরের কাছাকাছি এসে, ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে খাগড়াছড়ির দিকে চলেছি। রাত তখন চারটা। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল, আচমকা ঘন কুয়াশায় সামনের রাস্তা একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেল। ড্রাইভার আগের মত একই গতিতে নির্বিকারে চালিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। রীতিমত আতঙ্কিত হয়েছিলাম তখন। সুপারভাইজারের কাছ থেকে শুনলাম ওটা আসলে কুয়াশা নয়, মেঘের ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা। যদিও কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার রাস্তা দেখতে পেলাম পরিষ্কার। গাড়ি যখন উপরে উঠছিল, মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গে চলেছি। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার, তবু হেড-লাইটের আলোয় যা দেখেছি তা কখনও ভুলবার নয়। সে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই। যতটুকু দেখতে পেয়েছি, মুগ্ধ-নয়নে মন ভরে উপভোগ করেছি সিটে খাড়া হয়ে বসে।

প্রকৃতি এখানে অকল্পনীয় সুন্দর।
যদিও সূর্যের প্রখরতায় প্রাণ ওষ্ঠাগত,
তবু চোখ একেবারে জুড়িয়ে যায়।

আস্তে-আস্তে ভোর হয়ে এল, সৌন্দর্য আরও বেশি মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠল। ভোর ছ'টায় খাগড়াছড়ি শহরের কেন্দ্রে এসে পৌঁছলাম। তখনও বৃষ্টি পড়ছিল। এরই মধ্যে আমাদের নির্দিষ্ট গাইডের সঙ্গে কথা হয়েছে মোবাইলে। তার সাহায্যে এক হোটেলে উঠে ভালভাবে ফ্রেশ হয়ে, সকালের নাস্তা সেরে, এগিয়ে গেলাম আমাদের জন্য নির্ধারিত 'চাঁদের গাড়ি'-র কাছে।

বৃষ্টির মধ্যেই চললাম। গন্তব্য দীঘিনালা উপজেলার মোটামুটি দুর্গম এলাকায় হাজাছড়া ঝর্না। সম্পূর্ণ পাহাড়ি এলাকা। ক্রমেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। বৃষ্টিস্নাত সে-প্রকৃতির রূপ অবিশ্বাস্য ঠেকল আমার কাছে। পথে পড়ল কাসালং নদী, পেরিয়ে এলাম ব্রিজ দিয়ে। অতঃপর ছোট্ট একটা বাজারে এসে নামলাম চাঁদের গাড়ি থেকে।

এবারে পনেরো-কুড়ি মিনিটের হাঁটা-পথ। পথ মানে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে হয়। মাঝে-মাঝে পেরোতে হলো ছোট-ছোট নালা, ওগুলোতে বইছে ঝর্নার বেশ ঠাণ্ডা পানি। খুবই আরামদায়ক। কোনও-কোনও জায়গা বেশ পিচ্ছিল। লাঠি নিয়ে হাঁটতে হয়।

গন্তব্যে পৌঁছনোর অন্তত পাঁচ মিনিট আগে থেকে শুনলাম ঝর্নার পানি পড়ার জোরাল শব্দ আর সেই সঙ্গে দর্শনার্থীদের আনন্দ-চিৎকার। ঝর্নার সামনে যখন পৌঁছলাম, বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, বেশ ক'মিনিট স্থাণু হয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ ধরে দু'চোখ ভরে দেখেও যেন সাধ মেটে না। ছবিও তোলা হলো অসংখ্য। সকালে বৃষ্টির মধ্যে শীত অনুভব করছিলাম, বেলা এগারোটার দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে সূর্য প্রচণ্ড তাপ ছড়াতে শুরু করেছে। কিন্তু ঝর্নার শীতল পানি ক্লান্তি একেবারে দূর করে দেয় নিমিষে। শেষমেশ গাইডের তাড়া খেয়ে মন না চাইলেও ফিরে আসতে হলো গাড়ির কাছে।

দুপুর বারোটা বেজে কয়েক মিনিট। প্রচণ্ড রোদে হেঁটে আসতে-আসতে ঘেমে নেয়ে

একসা। বাজার থেকে কলা, বিস্কুট আর ডাবের পানি দিয়ে প্রাক্-মধ্যাহ্নভোজ সারতে হলো। কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছতে হবে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার প্রবেশমুখে। এরই মাঝে পেরিয়ে এসেছি খাগড়াছড়ির আরেক ছোট নদী মাসালং। সাজেকগামী গাড়িগুলোকে সার দিয়ে দাঁড়াতে হবে। ঠিক দুপুর একটায় কাফেলার সামনে-পেছনে সেনাবাহিনীর গাড়ি অবস্থান করবে, তারপরই রওনা দিতে হবে। তার আগে প্রতিটি গাড়িতে ক'জন যাত্রী, গাড়ির ড্রাইভারের নাম, সবকিছু সেনাবাহিনীর চেক পোস্ট-এ এন্ট্রি করা হলো। ফেরার সময় সবাই ঠিকমত পৌঁছল কি না তা সেই চেক পোস্ট-এ রিপোর্ট করতে হবে।

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যাত্রা শুরু সাজেক অভিমুখে। জানতাম পাহাড়ি পথ, বেশ অনেকগুলো চড়াই-উতরাই পেরোতে হবে। কিন্তু এতটা রোমাঞ্চকর! পাহাড়ি রাস্তা এঁকে-বেঁকে ক্রমশ উপরে উঠছে তো উঠছেই। অপ্রশস্ত রাস্তা, দু'পাশে খাদ। কোথাও পাশে গভীর খাদ আর অত্যন্ত ভীতিকর দুয়েকটা ঢাল। একজায়গায় প্রায় একশো ফুট খাড়া নিচে নেমেই আবার চড়াই। যেন রোলার কোস্টার।

এভাবে চলতে-চলতে, ভয়ানক রোমাঞ্চে ভাসতে-ভাসতে দু'ঘণ্টার রাস্তা পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছলাম বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নে। এটা ছোট একটা গ্রাম, মাত্র কয়েকটা পরিবার। দর্শনার্থী কয়েকগুণ বেশি। প্রকৃতি এখানে অকল্পনীয় সুন্দর। যদিও সূর্যের প্রখরতায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, তবু চোখ একেবারে জুড়িয়ে যায়।

হাজাছড়া ঝর্নার পথে...

আমাদের গাইড রকিব শাওনের কথা কিছু না বললেই নয়। তার চমৎকার তত্ত্বাবধান আর অতুলনীয় আতিথেয়তায় আমরা সত্যিই মুগ্ধ। ও আমাদের জন্য গ্রাম্য কটেজ-এর ব্যবস্থা করে দিল। কটেজে ঢুকেই কাপড় ছেড়ে আমরা চারজন একে-একে গোসল সেরে নিলাম ট্যাপের পানিতে। এত উপরে এরকম পানির ব্যবস্থা, আশাই করিনি। প্রাণ-জুড়ানো ঠাণ্ডা পানিতে স্নান সেরে অনেকটা সতেজ হয়ে গেলাম, যদিও পেটে তখন ছুঁচো দৌড়চ্ছে প্রাণপণে।

বেলা আড়াইটা বা তিনটা। প্রচণ্ড রোদ, পনেরো মিনিটের মত হেঁটে যেতে হবে রেস্টুরেন্টে। পাঁচশো ফুট লম্বা সুন্দর উঁচু-নিচু পাকা রাস্তা, দু'ধারে বিচিত্র রঙের টাইল-এ তৈরি চমৎকার সরু ফুটপাত। গ্রামবাসীর জন্য বিশুদ্ধ পানির বিশাল ট্যাঙ্ক, সবই সেনাবাহিনীর কল্যাণে। কত পরিচ্ছন্ন! আর এই ভর-দুপুরেও প্রকৃতি কত সতেজ! সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮০০ ফুট উপরে উঁচু-নিচু রাস্তা দিয়ে হাঁটছি–দু'পাশে যতদূর চোখ যায় শুধুই সবুজ। পাহাড় আর পাহাড়, দু'পাশে কোথাও গভীর খাদ। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! এখানে সেনাবাহিনী, আনসার ও বিজিবি, সবারই ঘাঁটি রয়েছে।

রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে গেলাম ভয়ে-ভয়ে, পাহাড়ি গ্রাম্য জায়গা, ভাগ্যে কী জুটবে কে জানে! রীতিমত অবাক–কচি বাঁশের সুস্বাদু তরকারি (আক্ষরিক অর্থেই 'বাঁশ খাওয়া' যাকে বলে!), সুন্দর চালের ভাত, দেশি মুরগির ঝোল আর অতি উপাদেয় ডাল রান্না। বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম পেটপুরে। অবিশ্বাস্য!

খাওয়ার পর গরমে একেবারে হাঁসফাঁস করতে লাগলাম। কোনরকমে প্রখর রোদে পুড়তে-পুড়তে কটেজে ফিরে শুয়ে পড়লাম। ঘুমে চোখ বুজে আসতে চায়, কিন্তু গরমে ঘর একেবারে উত্তপ্ত। চারপাশ কাঠের আর ছাদ টিনের। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার যেতে হবে হেলিপ্যাড-এ আর কংলক পাহাড়ের চূড়ায়।

রোদ একটু পড়ে আসতেই বেরোলাম কংলক বিজয়ের জন্য। সেই সুন্দর, পরিষ্কার পাহাড়ি পাকা রাস্তাটা কিছুদূর গিয়ে শেষ হয়ে গেল। এরপর কিছুটা কাঁচা রাস্তা চাঁদের গাড়িতে চড়ে অবশেষে হাঁটতে লাগলাম সাজেক থেকে আরও পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু কংলক পাহাড়ের চূড়ার দিকে। একজায়গায় এসে থমকে গেলাম।

ফুট দুয়েক পথ খুবই সংকীর্ণ, তারপর একেবারে খাড়া দশ-বারো ফুট উঠে গেছে চূড়া পর্যন্ত।

হাজাছড়া ঝর্না

ফিরে এলাম। ক'জন দুঃসাহী বালককে দেখলাম গাছের শিকড়-বাকড় ধরে উপরে উঠতে। ৩০-৩৫ বছর আগে হলে অবশ্য আমিও ওদের সঙ্গী হতাম। ওখান থেকে আট কিলোমিটার দূরে ভারতের মিজোরাম বর্ডার। বর্ডারের ওপারে ভারতীয় বাড়ি-ঘর দেখে মনে হয় খুব দূরে নয়।

ফিরে আসতে-আসতে দেখলাম আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। দ্রুত হেঁটে গাড়িতে, তারপর গাড়ি করে এলাম সেনাবাহিনীর তৈরি, বেশ বড় সমতল জায়গা–হেলিপ্যাড-এ। ততক্ষণে আকাশে ঘন কালো মেঘ জমেছে। বৃষ্টি নামবে ভালভাবে। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখছি চারদিক। মেঘ ক্রমশ ঘন হয়ে নিচে নেমে আসছে। এবার গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। পাহাড়ের উপর ঝড়ের কবলে পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি গাড়িতে ফিরে এলাম। গাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে আসছে ঝড়ের গতিতে। ভয়ও লাগছে কিছুটা। যখন কটেজে পৌঁছলাম ততক্ষণে বৃষ্টির ফোঁটা বেশ বড়-বড়।

কটেজে ঢুকতে না ঢুকতেই বৃষ্টি নামল তুমুল বেগে। সন্ধ্যাও হয়ে গেছে। মেঘের জন্য সূর্যাস্ত দেখতে পারলাম না। মনের দুঃখে কটেজের বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছিলাম, ভাল লাগছিল খুব। এরপর শুরু হলো ঝড়। কটেজের ভিতরে যেতে বাধ্য হলাম। বাতাসের তোড়ে টিনের ঘর কেঁপে-কেঁপে আমাদের বুকেও কাঁপন ধরিয়ে দিল। ঝড় অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি, কিন্তু বৃষ্টি আর থামে না। রাত দশটা পর্যন্ত তুমুল বৃষ্টি হলো। এরপর বৃষ্টি কিছুটা কমে এল।

সাজেক-এর একমাত্র পাকা রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে লেখক।

রাত আটটায় আমাদের রাতের খাবারের জন্য রেস্টুরেন্টে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও সম্ভব হয়নি। সাজেকে বিদ্যুৎ নেই, নেই কোনও মোবাইলের নেট-ওয়র্ক। অবশ্য রাস্তায় ও কটেজে সৌর-বিদ্যুতের টিমটিমে বাতি আছে, সেগুলোও সেনাবাহিনীর সৌজন্যে।

সবাই ছাতা নিয়ে রেস্টুরেন্টের উদ্দেশে হাঁটা ধরলাম। ভীষণ ক্লান্ত থাকায় ভেবেছিলাম দ্রুত খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু ভদ্র, শান্ত-নম্র, কিন্তু প্রাণোচ্ছল আমাদের সেই

গাইড, যার কথা অনেকদিন আমার মনে থাকবে, সেই শাওন লাঞ্চের সময় কথা দিয়েছিল—রাতের মেনু হবে পরোটা আর চিকেন বারবিকিউ। বৃষ্টি না হলে আমরা সবাই মিলে হই-হুল্লোড় করে বারবিকিউ বানাতে হাত লাগাতাম। বৃষ্টির কারণে তা হলো না বলে ভেবেছিলাম যাহোক একটা কিছু খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। শাওন তার কথা রাখবেই। ভাবলাম, এই অজ-পাড়াগাঁয়ে বারবিকিউ! কী আর হবে! খেতে বসে তাজ্জব বনে গেলাম, এত সুন্দর কস্মিনকালেও আশা করিনি। পরোটাও বিশেষ ধরনের। ঢাকার মাঝারি মানের যে কোনও রেস্টুরেন্টের চেয়ে কোনও অংশেই কম না। পরিমাণেও ছিল যথেষ্ট। পরোটা আর সেই কাবাব আমি অনেক বছর পর এতটা খেলাম। বৃষ্টিভেজা রাতে বারবিকিউ! ব্যাপারই আলাদা। সুনসান রাত, আমাদের এই দল আর সেই রেস্টুরেন্টের ক'জন স্থানীয় কর্মচারী ছাড়া অন্য কেউই জেগে ছিল না তখন। রাত একটু বেশিই হয়ে গেল ঘুমোতে। ভোর চারটায় অ্যালার্ম দিয়ে রাখলাম। মেঘের জন্য সূর্যাস্ত ঠিকমত দেখতে পারিনি, তাই সূর্যোদয় কোনভাবেই মিস করতে চাই না।

সময় মতই ঘুম ভাঙল। পাঁচটার মধ্যে হেলিপ্যাডে না গেলে সূর্যোদয় দেখা হবে না। বেশ অন্ধকার থাকতেই ঘর থেকে বেরিয়ে হেলিপ্যাডের দিকে হেঁটে গেলাম। রাস্তায় টহলরত সেনাবাহিনীর লোকেদের দেখলাম, ওরাও টর্চ জ্বেলে দেখল, কিছু বলল না। ওখানে যখন পৌঁছলাম, ভোরের আলো একটু-একটু করে ফুটতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুবাকাশ লালচে হয়ে উঠল। রাতে কখন বৃষ্টি থেমে গেছে জানি না, বৃষ্টি থাকলে ভোরটা মাঠে মারা যেত।

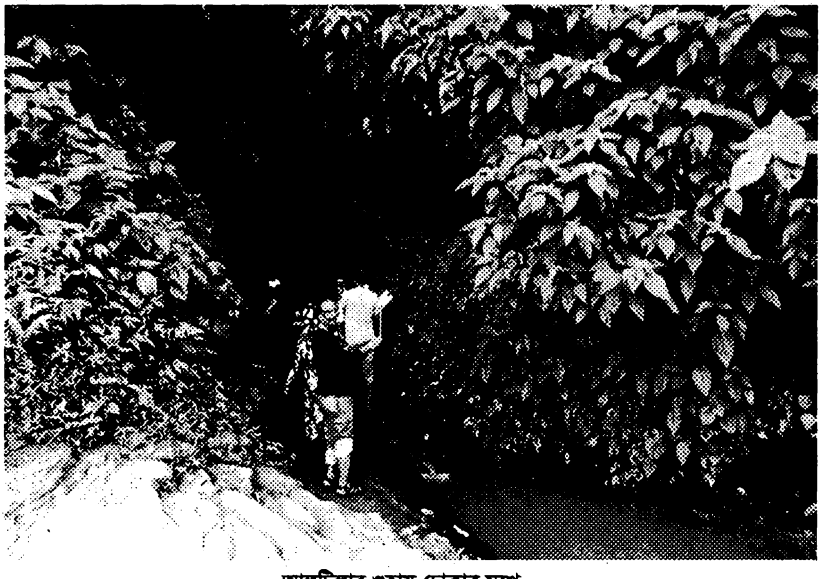

আলুটিলার গুহায় ঢোকার মুখে...

আস্তে-আস্তে আলো বাড়ছিল আর সৌন্দর্য যেন একটু-একটু করে বিকশিত হচ্ছিল। অপূর্ব স্বর্গীয় সৌন্দর্য। তখন আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা মেঘ তুলোর মত খুব ধীরে উড়ে বেড়াচ্ছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার বেশ কিছুটা নিচে, প্রায় চারদিকে ধবধবে সাদা মেঘ-পুঞ্জ একেবারে

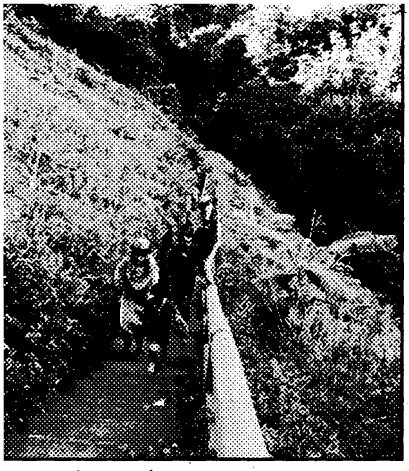

রিসাং ঝর্না থেকে ফেরার পথে...

যেন স্থির হয়ে জমে আছে। যদি বৃষ্টি হত, অনায়াসে আমরা মেঘ ছুঁতে পারতাম।

এর আগে রাস্তায় চাঁদের গাড়িতে আসবার সময় পথের সৌন্দর্যের কথা বলেছিলাম–ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য নেই, আর হেলিপ্যাডের সেই ভোরের সৌন্দর্য! কী আর বলব! বর্ণনা করা আরও বেশি অসাধ্য।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা ওখানেই কাটালাম। কিছুতেই যেন ছেড়ে আসতে পারছিলাম না। ফিরে আসতেই হলো, কারণ দশটার মধ্যে চাঁদের গাড়ি রওনা হবে খাগড়াছড়ির উদ্দেশে। তার আগে খিচুড়ি, আলু ভর্তা আর হাঁসের মাংস দিয়ে সকালের খাওয়া সেরে নিতে হবে। সে খাবারও ছিল অতুলনীয়।

যাহোক, সকাল দশটায় ফিরতি পথে চড়ে বসলাম চাঁদের গাড়িতে। ছেড়ে আসতে বাধ্য হলাম স্বপ্নের সাজেক!

দুপুরে খাগড়াছড়ি শহরে খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর অদূরে আলুটিলায় ঘুরে এলাম এক সুড়ঙ্গে। সে-ও ভারি রোমাঞ্চকর। তারপর গেলাম তেরাং নামে একজায়গায় রিসাং নামের ঝর্না দেখতে।

সন্ধ্যার পর ফিরলাম খাগড়াছড়ির সেই আগের হোটেলে। সেখানে গোসল সেরে কাপড় বদলে ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে রাতের খাবার খেয়ে ঢাকার উদ্দেশে বাসে উঠলাম। রাত ন'টায় বাস ছাড়ল, ভোর হবার দু'ঘণ্টা আগেই ঢাকার কমলাপুরে বাস থেকে নামলাম। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলাম। ■

অদূরে যে-চার্চটি দেখা যাচ্ছে, ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটি।

শার্টের কলার

মূল ▮ হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসেন
রূপান্তর ▮ খসরু চৌধুরী

প্রথম ভালবাসার কথা আমি কোনওদিন ভুলব না; সে ছিল একটা গার্টার, যেমন সুন্দরী তেমনই নরম।

একজন নিপাট ভদ্রলোকের নানা জিনিসপত্রের মাঝে ছিল একটা বুট-জ্যাক (বুটজুতো পরা এবং খোলার যন্ত্র) আর একটা হেয়ার-ব্রাশ; কিন্তু সেইসঙ্গে তার ছিল পৃথিবীর সেরা একটা শার্টের কলার, আর সেই কলার নিয়ে এখন আমাদের একটা গল্প শুনবার আছে। কলারটা এত বুড়ো হয়ে পড়েছিল যে এবার সে ভাবতে লাগল বিয়ে করার কথা; একদিন নিজেকে সে দেখতে পেল একটা কাপড় কাচার গামলায়, আর সেই গামলাতেই তার পাশে পড়ে আছে একটা গার্টার (মোজা বাঁধার ফিতে)। 'বিশ্বাস করো,' বলল শার্টের কলার, 'আজ পর্যন্ত আমি এত ছিপছিপে আর নমনীয়, এত ফিটফাট আর নরম কোনওকিছু দেখিনি। তা, তোমার নামটা জানতে পারি?'

'বলব না,' জবাব দিল গার্টার।

'বাড়িতে তুমি থাকো কোথায়?' জানতে চাইল শার্টের কলার। কিন্তু গার্টার স্বভাবতই লাজুক, কীভাবে এরকম প্রশ্নের জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারল না।

'মনে হয় তুমি একটা বেল্ট,' বলল শার্টের কলার, 'অন্তর্বাস জাতের বেল্ট। বুঝতে পারছি যে তোমার উপকারও আছে, শোভাও আছে, আমার ছোট্ট প্রিয়ে।'

'আমার সঙ্গে কথা বলবে না তুমি,' রেগে গেল গার্টার; 'মনে হয় না এভাবে কথা বলার মত পাত্তা তোমাকে আমি দিয়েছি।'

'তোমার মত সুন্দর চেহারাই কি,' বলল শার্টের কলার, 'উৎসাহ পাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়?'

'সরে যাও; এত কাছে এসো না,' বলল গার্টার, 'হাবভাবে তো তোমাকে একদম মানুষ মনে হচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই আমি একজন নিপাট ভদ্রলোক,' বলল শার্টের কলার, 'আমার আছে একটা বুট-জ্যাক আর একটা হেয়ার-ব্রাশ।' কথাটা সত্য নয়, কারণ, এগুলো তার প্রভুর; কিন্তু শার্টের কলার হলো অহঙ্কারী।

'এত কাছে এসো না,' বলল গার্টার; 'কাউকে এত কাছে আসতে দেয়ার অভ্যেস আমার নেই।'

'যত্তসব ভান!' বলল শার্টের কলার।

তারপর কাপড় কাচার গামলা থেকে তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে, মাড় দিয়ে, রোদে শুকানোর জন্য ঝুলিয়ে দেয়া হলো একটা চেয়ারের ওপর, আর তারপর রাখা হলো ইস্ত্রির টেবিলে। এবার এল গনগনে ইস্ত্রি। 'জনাবা বিধবা,' বলল শার্টের কলার, 'খুব গরম লাগছে। আমি বদলে যাচ্ছি। হারিয়ে ফেলছি আমার সব ভাঁজ। তুমি ফুটো করে ফেলছ আমার শরীর। আঁউ! আমি তোমাকে দিচ্ছি বিয়ের প্রস্তাব।'

'ওরে, বুড়ো ন্যাকড়া,' বলল চ্যাপটা ইস্ত্রি, গর্বিত ভঙ্গিতে কলারের ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে-করতে, কারণ, নিজেকে সে ভাবে বাষ্পীয়-ইঞ্জিন, যা কামরার সারি টানতে-টানতে রেললাইনের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে গড়াতে-গড়াতে। 'ওরে, বুড়ো ন্যাকড়া!' বলল সে আবার।

শার্টের কলারটার ধারের সুতোগুলো একটু খুলে গেছে, তাই কাঁচি আনা হলো তা কেটে সমান করতে। 'আহ্!' আনন্দধ্বনি করল শার্টের কলার, 'যেভাবে দুই পা মেলতে পারো, চাইলে তুমি হতে পারবে শ্রেষ্ঠ এক নর্তকী। এত চমৎকার কোনও কিছু আমি আর দেখিনি; আমি নিশ্চিত কোনও মানুষ এমনটা করতে পারবে না।'

'পারবে না বলেই আমার ভাবা উচিত,' জবাব দিল কাঁচি।

'তুমি হবে একজন কাউন্টেস,' বলল শার্টের কলার; 'কিন্তু আমার আছে বলতে, যা থাকে একজন নিপাট ভদ্রলোকের, একটা বুট-জ্যাক আর একটা চিরুনি। তোমাকে দেয়ার জন্যে আমার একটা জমিদারি থাকলে খুব ভাল হত।'

'কী! সে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে নাকি?' বলল কাঁচি, আর রেগে আগুন হয়ে, ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ করে সে এমনভাবে কেটে ফেলল শার্টের কলার যে সেটাকে অচল বলে ফেলে দেয়া ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না।

'এবার আমি হেয়ার-ব্রাশকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে বাধ্য,' ভাবল শার্টের কলার; তাই একদিন সে মন্তব্য করল, 'কী অপূর্ব তোমার চুল, প্রিয়ে। কখনও কি তুমি ভাবনি কারও বাগ্‌দত্তা হওয়ার কথা?'

'একথা যে আমি ভাবব তা তোমার বোঝা উচিত ছিল,' জবাব দিল হেয়ার-ব্রাশ; 'আমি হয়েছি বুট-জ্যাকের বাগ্‌দত্তা।'

'বাগ্‌দত্তা হয়ে গেছ!' চিৎকার ছাড়ল শার্টের কলার, 'এখন আর কেউ নেই যাকে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারি,' আর তারপর সে এমন ভান করতে লাগল যেন ভালবাসা ব্যাপারটাকেই সে ঘৃণার চোখে দেখে।

বেশ অনেকটা সময় কেটে গেল, তারপর শার্টের কলারটাকে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো একটা পেপার মিলে। অসংখ্য ন্যাকড়া গড়াগড়ি যাচ্ছে সেখানে, তবে ভাল জাতের ন্যাকড়াগুলো থেকে খারাপগুলো রাখা হয়েছে আলাদা করে। সব ন্যাকড়ারই বলার আছে নিজ-নিজ নানারকম গল্প, বিশেষ করে ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী শার্টের কলারটার। 'জীবনে এত ভালবাসার ব্যাপার ঘটেছে আমার যে, গুনে শেষ করা যাবে না,' বলল শার্টের কলার, 'প্রেমিকারা আমাকে কোনও অবসর পেতে দেয়নি। একথা সত্য যে আমি ছিলাম একজন নিপাট ভদ্রলোক, কারও সঙ্গেই মেলামেশা করতাম না। আমার ছিল একটা বুট-জ্যাক আর একটা হেয়ার-ব্রাশ,

অথচ সেগুলো আমি কখনওই ব্যবহার করিনি। আমি যখন নিচের দিকে ভাঁজ হয়ে থাকতাম, তখন দেখলে তোমরা বুঝতে আমার চেহারা! প্রথম ভালবাসার কথা আমি কোনওদিন ভুলব না; সে ছিল একটা গার্টার, যেমন সুন্দরী তেমনই নরম, কেবল আমার খাতিরে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কাপড় কাচার একটা গামলায়। এক বিধবাও আমার পেছনে কম ঘুরঘুর করেনি, তার ভালবাসা ছিল খুব গরম, কিন্তু আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে সে হয়ে গেল কালো। তারপর এল শ্রেষ্ঠ এক নর্তকী, আবেগের বশে সে আমার এমন ক্ষত সৃষ্টি করল যে আজও ভুগছি। এমনকী আমার হেয়ার-ব্রাশও খেয়েছে ভালবাসায় গড়াগড়ি, কিন্তু আমার অবহেলায় ঝরে গেছে তার সব চুল। হ্যাঁ, আমার রয়েছে এই ধরনের বিশাল সব অভিজ্ঞতা, কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় দুঃখের মূলে রয়েছে সেই গার্টার–মানে বলতে চাইছি, অন্তর্বাস জাতের বেল্ট–যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কাপড় কাচার গামলায়। যা-ই হোক, আমার ভেতরটা ভরে আছে বিবেকে, আর তাই বুঝতে পারছি যে এখন সত্যিই আমার কাগজে পরিণত হবার সময় এসেছে।'

শেষমেশ এটাই হলো শার্টের কলারের পরিণতি। সমস্ত ন্যাকড়াকে পরিণত করা হলো সাদা কাগজে, আর শার্টের কলার পরিণত হলো অবিকল সেই জাতের কাগজে, যা আমরা দেখছি এই আধুনিক কালে, এবং সেই কাগজের ওপরেই ছাপা হয়েছে এই গল্প। ঘটনাটা ঘটেছে তার শাস্তি হিসেবে, অহঙ্কার প্রকাশ করার জন্য একগাদা মিথ্যে বলার ফলে। এটা আমাদের সবার জন্যে একটা সাবধানবাণীও বটে, কারণ, এমন কাজ যেন আমরা না করি যে আমাদেরও একদিন ঢুকতে হয় ন্যাকড়ার ব্যাগে, সাদা কাগজে পরিণত হবার জন্য, যে-কাগজের ওপর হয়তো ছাপা হবে আমাদের সারা জীবনের গল্প, যেখানে এমনকী গোপনতম কথাটিও রবে না গোপন! এবং কাগজে ছাপা অবস্থায় সেই গল্প পৃথিবীর সবার হাতে-হাতে পৌঁছে যাওয়া মোটেই কোনও আনন্দের বিষয় নয়, ঠিক যেমনটা ঘটল অহঙ্কারী শার্টের কলারটার ক্ষেত্রে। ■

বৈধ লাইসেন্সধারীর নিকট আগ্নেয়াস্ত্র

বিক্রয় হবে

১

ভাল অবস্থায় ইটালির বিখ্যাত পেট্রো বেরেটা কোম্পানির একটি ১২ বোর শট গান ডাবল ব্যারেল, সাইড-বাই-সাইড, পৌনে ৩ ইঞ্চি চেম্বার, ২৮ ইঞ্চি ব্যারেল। বাড়ির নিরাপত্তা, শিকার ও ক্লে পিজিয়ন শুটিং-এর জন্য আদর্শ।

২

১টি আমেরিকার তৈরি স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন .২২ বোর পিস্তল। ম্যাগাযিন ক্যাপাসিটি ১০ বুলেট। মোট ৪টি ম্যাগাযিনসহ।

৩

সেইসঙ্গে আরও আছে ক্যালিবার .১৭৭ এয়ারগানের জন্য বিদেশি পেলেট।

যোগাযোগ:

মমিনুল ইসলাম

ফোন: ৮৩১৪১৮৪

(শুক্রবার ছাড়া সকাল ৮টা–৪টা)

মোবা: ০১৬৭৩-৯৮৫৯২৪

বিচিত্র পৃথিবীর বিচিত্র উদ্ভিদ

সান্তা রিকি

এদের কবর ভেদ করে ওঠা মরা মানুষের হাতের মত দেখায়।

বৈচিত্র্য এমন একটি জিনিস যা মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুকে সহজেই নিজের দিকে নিয়ে আসে। 'আমি বিচিত্র, আমি আলাদা, আমি উদ্ভট'–এই তিনটা বৈশিষ্ট্য মনোযোগ আকর্ষণের জন্য যেন যথেষ্ট। বিচিত্র এই পৃথিবীতে বৈচিত্র্যের কোনও সীমা নেই। শুধু জায়গা কিংবা প্রাণীকুল যে বৈচিত্র্যময় হয়ে থাকে তা কিন্তু নয়, এমন অনেক উদ্ভিদ রয়েছে যা বৈচিত্র্যের সংজ্ঞা সুন্দরভাবে দেখিয়ে দেয়। পৃথিবীতে এই ধরনেরই কিছু বিচিত্র উদ্ভিদ রয়েছে যাদের আকার, আকৃতি, অবয়ব মানব অঙ্গের সঙ্গে মেলে। এমনই কিছু উদ্ভিদের সঙ্গে চলুন পরিচিত হওয়া যাক।

ব্লিডিং টুথ ফাঙ্গাস

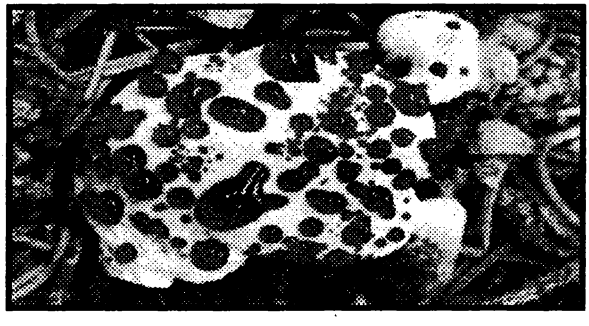

এটি ফাঙ্গাস ধরনের উদ্ভিদ এবং আকারে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এর অভ্যন্তর থেকে যখন লাল বর্ণের আঠাল তরল পদার্থ নির্গত হয়ে মাটিতে পড়ে তখন এর সঙ্গে মানুষের রক্ত মিশ্রিত দাঁতের তুলনা করলে খুব একটা মন্দ হয় না! এই লাল বর্ণের তরল পদার্থটি মূলত রস যা ওই ফাঙ্গাসের দেহ থেকে রাতে বের হয়। রাতে তাদের মূলে বাড়তি পরিমাণ জলীয় বাষ্প জমা হয় যা ফাঙ্গাসের ছোট-ছোট ফুটো দিয়ে নির্গত হয়ে যায়। এই ঘটনা সাধারণত অল্পবয়সী ফাঙ্গাসের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। এই ব্লিডিং টুথ ফাঙ্গাসকে 'স্ট্রবেরিস অ্যাণ্ড ক্রিম' বলা হয়ে থাকে। যদিও এটা বিষাক্ত ধরনের ফাঙ্গাস নয়, তারপরেও তিক্ত স্বাদের কারণে এটা খাওয়ার যোগ্য নয়। এই ফাঙ্গাসটি মুক্ত পরিবেশ থেকে সিজিয়াম-১৩৭ নামের আইসোটোপ সংগ্রহ করতে সক্ষম যা ভারী মৌল এবং নির্দিষ্ট মাত্রার বাইরে বিষাক্ত হিসেবে পরিচিত। এই ব্লিডিং টুথ ফাঙ্গাসকে আমেরিকা এবং ইউরেশিয়াব্যাপী পাওয়া যায়। এরা সাধারণত পাইন গাছের সংলগ্ন জায়গাগুলোতে জন্মায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে এর দেহ থেকে নিঃসৃত পদার্থ আট্রোমেস্টিন এবং মানুষের রক্তের হেপারিন একই যৌগ দিয়ে গঠিত।

ডল'স আইজ

এই উদ্ভিদের বেরি জাতীয় ফলগুলো অনেক বেশি বিষাক্ত এবং দেখতে বিদঘুটে ধরনের হয়ে থাকে। সাধারণত বেরি জাতীয় ফলগুলো গাছের লাল রঙের কাণ্ডের সাথে লেগে থাকে এবং এগুলো দেখতে পাথরের চোখ কিংবা পুতুলের চোখের মত হয়। ফলগুলো ক্যারিওজেনিক হওয়ায় এটা খেলে কিছু সময়ের মধ্যেই হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মানুষ মারা যায়। এই

ল মানুষের জন্য ক্ষতিকারক হলেও পাখিরা একে অনায়াসে খেয়ে থাকে। শুধু যে এর ফল বা গাছ মানুষের জন্য ক্ষতিকারক তা নয়; এর বীজ, মূল, কাণ্ডের সংস্পর্শে এলেও মানুষ চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

হুকার'স লিপস

এ ধরনের উদ্ভিদ মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশ, যেমন: পানামা, কোস্টারিকা, কলম্বিয়া এবং ইকুয়েডরে পাওয়া যায়। ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এই গাছের পাতার একটি বিশেষায়িত অংশ, ব্রাক্ট, উজ্জ্বল লাল বর্ণ ধারণ করে, যাঁকে দূর থেকে লিপস্টিক দেয়া মানুষের পাউট করা ঠোঁটের মত দেখায়। পাতার এই উজ্জ্বল লাল বর্ণের বিশেষায়িত অংশ হামিংবার্ড এবং প্রজাপতিদের আকৃষ্ট করতে সাহায্য করে। হুকার'স লিপসকে 'হট লিপস' বা 'ফ্লাওয়ার লিপস'-ও বলা হয়ে থাকে। এই গাছের ছাল

এবং পাতা চর্মরোগ এবং কাশির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। পানামার স্থানীয় অধিবাসীরা এই উদ্ভিদ শ্বসনতন্ত্রের সমস্যার কাজে ব্যবহার করে থাকে।

ব্রেইন মাশরুম

আমেরিকান মাশরুম সংগ্রাহকদের কাছে মোরেল বেশ চাহিদাসম্পন্ন মাশরুম। ঋতুবিশেষে এই মোরেল প্রতিটি ২০ পাউণ্ড করে বিক্রি হয়ে থাকে। কিন্তু সব থেকে সমস্যার ব্যাপার হচ্ছে, অনেক মাশরুম সংগ্রাহক আসল মোরেল এবং ফল্‌স্ মোরেলের পার্থক্য বোঝে না। এই ফল্‌স্ মোরেলগুলো দেখতে মানুষের মস্তিষ্কের মত হয়ে থাকে। আসল মোরেলের কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া না থাকলেও ফল্‌স মোরেল অনেক বেশি বিষাক্ত। এই অবধি মাশরুম খেয়ে যতগুলো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে শতকরা ২০ জনের মৃত্যুর কারণই হচ্ছে ফল্‌স্ মোরেল। এই ফল্‌স্ মোরেলের অনেক প্রজাতি রয়েছে যার মধ্যে কিছু প্রজাতি অন্যগুলোর তুলনায় কিছুটা কম বিষাক্ত। এসব মোরেলকে নর্ডিক দেশগুলোতে সস্বাদু খাবার হিসেবে বিবেচনা করা

হয়ে থাকে। এসব এলাকার লোকজন খাওয়ার আগে মোরেলগুলোকে ভালভাবে সিদ্ধ করে নেয় এবং তারপরে নিখুঁতভাবে সেগুলোকে ধুয়ে নেয়। এসব কিছুর পরেও এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে কার্সিনোজেনিক উপাদান জাইরোমিটিন থেকেই যায় যা মানবদেহের অনেক ক্ষতি করে থাকে।

রিংকল্ড পিস মাশরুম

এই মাশরুমের মাথাটি বিভিন্ন আকৃতির এবং বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে। এটাকে 'নেটেড রডোটাস' বা 'রোজি ভেইনক্যাপ' বলা হয়ে থাকে। আকার এবং আকৃতির কারণে রিংকল্ড পিস মাশরুমের সাথে মানুষের হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী এমনকী ফুসফুসের সামঞ্জস্য দেখা যায়। এর

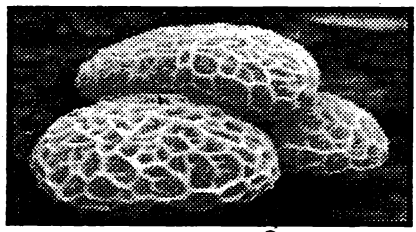

ছাতার মত মাথার অংশ জেলাটিনাস এবং এতে সাদা-সাদা অভিক্ষেপের মত অংশ দেখা যায়। ব্লিডিং টুথ ফাঙ্গাসের মত এর মূল থেকেও গাটাশন প্রক্রিয়াতে এক ধরনের লাল অথবা কমলা বর্ণের রস নিঃসৃত হয়। এটিকে ব্রিটেন, আয়ারল্যাণ্ড, ইটালি, জার্মানি, পোল্যাণ্ড এবং উত্তর আমেরিকার দেশসমূহের এল্ম প্রজাতির পচে যাওয়া বৃক্ষের আশপাশে পাওয়া যায়।

উড ইয়ার

একে গাছের কান অর্থাৎ 'ট্রি ইয়ার' অথবা 'জেলি ইয়ার' বলা হয়ে থাকে। এই জেলির মতন মাংসল, কাপের মত, লালচে বাদামি বর্ণের ফাঙ্গাসটির আকৃতি মানুষের কানের মত। এরা সাধারণত গুচ্ছ ধরে কোনও পচা গাছের বাকলে কিংবা জীবন্ত গাছে জন্ম নিয়ে থাকে। কাপ ফাঙ্গাসের মত এরা ভঙ্গুর নয়, বরং স্থিতিস্থাপক হয়। এই উড ইয়ার রক্তের কোলেস্টেরল কমানোর কাজে সাহায্য করে থাকে। উড ইয়ার জাপান এবং চীনে খুব স্বল্প পরিসরে হার্টের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। চাইনিজরা একে 'হাড়বিহীন মাংস' হিসেবেও অভিহিত করে থাকে এবং তারা এটিকে প্রায় ৪০০০ বছর ধরে খাওয়া

এবং চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করছে।

স্ন্যাপড্রাগন সিড পড

এই উদ্ভিদের ফুলের বিশেষত্ব এর ড্রাগনে চোয়ালের মত অবয়ব। বিশ্বাস করা হয়ে থাকে স্ন্যাপড্রাগন মূলত একটি বুনোফুল যা ইটালি ব স্পেনে জন্ম নিয়েছিল। একে নিয়ে এসব অঞ্চলে অনেক উপকথাও রয়েছে। এর মধ্যে একটি এরকম, যদি কোনও মানুষ এই ফুলটি তার ঘরে সাজিয়ে রাখে বা কাউকে ঘর সাজানোর জন্য দেয়, সেই মানুষটি অন্য মানুষের কাছে মোহনীয়

বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। এরকম আরেকটি উপকথা অনুসারে, যদি কোনও বাড়িতে স্ন্যাপড্রাগন ফুলের গাছ থাকে তা হলে সেই বাড়ি অভিশাপ এবং কালোজাদুর সংস্পর্শ থেকে মুক্ত থাকবে। স্ন্যাপড্রাগনের ফল বিষাক্ত ধরনের হয়ে থাকে। ভিক্টোরিয়ানদের মতে, স্ন্যাপড্রাগন প্রতারণার প্রতীক। গ্রীষ্মের শেষ দিকে এই ফুলের পাপড়িগুলো মরে ঝরে পড়ার ফলে এর নিচের সবুজ রঙের বীজপত্রটি উন্মুক্ত হয়ে যায়। পরের মাসগুলোতে তা আস্তে-আস্তে গাঢ় বাদামি র ধারণ করে এবং শুকিয়ে ফেটে যায়। এর ফলে এর ভেতরের বীজগুলো বীজপত্রের তিনটি গর্তের মত অংশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। গর্ত তিনটির কারণে এই সময় বীজপত্রটিকে মানব খুলির মত দেখায়।

পার্পল জেলিডিস্ক ফাঙ্গাস

এটি পত্রঝরা উদ্ভিদের মরা কাঠে জন্মায়। প্রথম পর্যায়ে এরা দেখতে ছোট-ছোট গোলাকার পাতার মত হলেও পরবর্তীতে এরা পিরিচের আকৃতি ধারণ করে। যখন এই ফাঙ্গাসগুলো গুচ্ছ ধরে থাকে, এরা দড়ির মত একে অপরের সাথে জোড়া লেগে যায়, যা দেখতে অনেকটা মানুষের

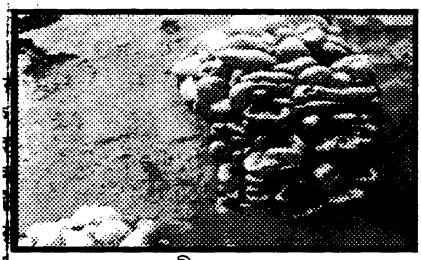

অন্ত্রের মত হয়। জীবনের প্রথম দশাতে এরা অযৌন অবস্থায় থাকে এবং কনিডিয়া স্পোরের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে থাকে। পরবর্তীতে সন্নিবেশিত হলে এরা ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয় এবং এই পর্যায়ে তারা যৌন এবং অযৌন স্পোরের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে থাকে। এরা বড় ধরনের গাছে পরজীবী হিসেবে জন্মায়। সাধারণত বিচ গাছে এদের দেখা যায় যা ব্রিটেন, আয়ারল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

ডেভিল'স ফিঙ্গারস মাশরুম

এটিকে 'অক্টোপাস স্টিঙ্কহর্ন'-ও বলা হয়ে থাকে। পূর্ণাঙ্গ জীবদ্দশাতে এই উদ্ভিদ অক্টোপাসের মত চার থেকে আটটি শুঁড় বিশিষ্ট হয় যা গাঢ় লাল বর্ণের হয়ে থাকে। এই শুঁড়গুলোর চারপাশে কালো চাকতির মত অংশ থাকে যাতে সাকশন কাপ থাকে। এই কালো চাকতির মত অংশ, গ্লেবা থেকে অনেক সময় পচা মাংসের মত গন্ধ বেরোয়। এই গন্ধের ফলে মাছি জাতীয় প্রাণী

এদের দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ডেভিল'স ফিঙ্গারস সাদাটে, অর্ধ সমাধিস্থ, ডিমের মত কন্দমূল সহযোগে থাকে। যখন এটি কন্দমূল থেকে আলাদা হয়, এর আঙুলের মত অভিক্ষেপগুলো সাদা হয় এবং এদের কবর ভেদ করে ওঠা মরা মানুষের হাতের মত দেখায়। ■

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

প্রকাশিত হয়েছে

কিশোর থ্রিলার

ভলিউম-১৪০

তিন গোয়েন্দা

শামসুদ্দীন নওয়াব

গ্রেমলিন/শামসুদ্দীন নওয়াব: বদলী সেক্রেটারি আসার পর থেকে একে-একে বিগড়ে যেতে লাগল গ্রীন হিলস স্কুলের যন্ত্রপাতি। মহিলা কি গ্রেমলিন? দুষ্টু প্রাণীটার সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত মিল। বিপদের গন্ধ পেল তিন গোয়েন্দা।

ঘড়ি-রহস্য/শামসুদ্দীন নওয়াব: জ্যাক নানার সঙ্গে গোল্ডউইন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে তিন গোয়েন্দা। ভুতুড়ে ক্লক টাওয়ার। মাঝরাতে রহস্যময় আলো। অচেনা পদচিহ্ন। গুপ্তধনের সঙ্কেত। তদন্তে জড়িয়ে পড়তে আর কী চাই ছেলেদের?

মেঘ-ড্রাগন/শামসুদ্দীন নওয়াব: মার্লিন বিষণ্ণতায় ভুগছে। তার জন্য কিশোর আর জিনার কাছে সাহায্য চাইল মরগ্যান। প্রাচীন জাপানে যেতে হবে ওদের। খুঁজে বের করতে হবে সুখের উপায়। সঙ্গে আছে এক গাইড বই আর এক জাদুদণ্ড–সেটা ব্যবহারের আবার তিনটে বিশেষ নিয়ম রয়েছে। মিশন সম্পূর্ণ করতে এ দুটোই কি যথেষ্ট? দেখাই যাক না।

দাম ■ সাতাত্তর টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ত্রাণকর্তা

মূল ▮ জ্যাক রিচি
রূপান্তর ▮ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

আমি দুইয়ে-দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেললাম। অপহরণের মামলা।

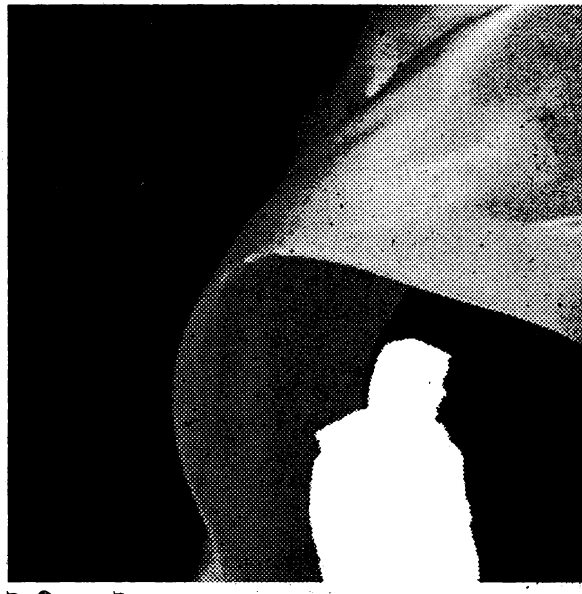

[কারডুলা একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। সেই সঙ্গে ভ্যাম্পায়ার। সাধারণ ভ্যাম্পায়ারদের সব ক্ষমতা ওর আছে। এই যেমন–বাদুড়ের রূপ ধারণ করা, অস্বাভাবিক শক্তি আর মোটা চামড়া। রক্ত বা রহস্য কোনওটাতেই ওর অরুচি নেই।]

আমার ঠিক আধ ব্লক সামনে, টেলিফোন বুথের আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরোল লোকটি। আঁকড়ে ধরল মহিলাটির হ্যাণ্ড ব্যাগ।

লোকটার টানের চোটে, হাত থেকে ব্যাগটা প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে, ফিতা ধরে ফেললেন মহিলা। শুরু হলো দু'জনের মাঝে টানা-হ্যাঁচড়া।

রাত অনেক হয়েছে। তা-ও প্রায় আধ ডজন পথচারী এখনও বাইরে। চাইলেই এগিয়ে আসতে পারত, কিন্তু ঘটনা দেখে সবাই কেন যেন মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করল।

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। মানুষের যে কী হয়েছে! আজকাল কেউ সেধে ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

আমি দৌড়ে গিয়ে ছিনতাইকারীর ডান হাতটা সর্বশক্তিতে চেপে ধরলাম। বুঝতে পারলাম, হাতের অনেকগুলো হাড় ভেঙে ফেলেছি। চিৎকার করল ছিনতাইকারী, হাত থেকে ব্যাগটা ছেড়ে দিল। মাথার উপর তুলে, প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে রাস্তার পাশে রাখা ডাস্টবিনের দিকে ছুঁড়ে মারলাম

তাকে। লোকটার দেহের চাপ সহ্য করতে পারল না সেটা, ভেঙে পড়ল। একগাদা ময়লার মাঝে পড়ে রইল ছিনতাইকারী।

এবার মহিলার দিকে ফিরলাম। বয়স পঁচিশের আশপাশে হবে। ঘন কালো চুল আর চোখজোড়া বেগুনী।

'ম্যাডাম,' বললাম, 'আশা করি ব্যথা পাননি?'

বড়-বড় চোখজোড়া এখনও স্বাভাবিক আকৃতি ফিরে পায়নি। 'জি না, পাইনি।'

আমি টেলিফোন বুথের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, 'এখনই পুলিস ডাকছি।'

চোখে যেন ভয়ের ছায়া দেখতে পেলাম। 'তার মনে হয় দরকার হবে না। আসলে বলতে চাচ্ছি যে, আমার তো কোনও ক্ষতি হয়নি। পার্সটা নিতে পারেনি। শুধু-শুধু পুলিসকে জড়িয়ে কী লাভ?'

মহিলার জামায় লাগানো ব্রোচের উপর নজর পড়ল আমার। ই আর ডব্লিউ–এই দুটি অক্ষর ওতে খোদাই করা। 'ম্যাডাম, আপনি আসলেই দয়ালু। কিন্তু সম্ভবত এই বদমাশ এর আগেও ছিনতাই করেছে। আর আপনার মত সচেতন নাগরিক যদি পুলিসে অভিযোগ না করে, তা হলে সামনেও করবে।'

ব্লকের শেষ মাথায় পুলিসের গাড়ির লাইট দেখতে পেয়ে হাত নাড়লাম।

'কী করছেন আপনি?' জানতে চাইলেন মহিলা।

'পুলিসকে ডাকছি।'

রাগত স্বরে বললেন, 'নিজের চরকায় তেল দিন।' এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন মহিলা। আমি বাধা দিলাম না। দরকার কী? এগিয়ে গেলাম অজ্ঞান ছিনতাইকারীর দিকে। পরে থাকা মুখোশটা ধরে টান দিলাম। দেখে মনে হলো, লোকটার বয়স পঁয়ত্রিশের মত হবে।

পুলিসের গাড়িটা আমার পাশে এসে থামলে, দু'জন অফিসার নেমে এলেন। এক নজরে সব কিছু দেখে নিয়ে বললেন, 'কী হচ্ছে এখানে?'

আমি সব কিছু খুলে বললাম।

অফিসারদের একজন চারপাশ দেখে আমাকে বললেন, 'আমি কোনও মহিলাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

আমি গলা পরিষ্কার করে বললাম, 'চলে গিয়েছেন।'

অফিসার অজ্ঞান ছিনতাইকারীকে ভাল করে দেখলেন, 'আমি কোনও মুখোশও দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমি খুলে ফেলেছি। এই আবর্জনার কোথাও না কোথাও আছে।'

অফিসার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'জনাব, আপনি বিপদে পড়ে গিয়েছেন। এই ডাস্টবিনগুলো শহরের সম্পত্তি। দাম খুব একটা কম না।'

অন্য অফিসারটি অ্যাম্বুলেন্স ডাকার জন্য গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

প্রথম অফিসারের চোখে এখনও সন্দেহের দৃষ্টি। 'এখানে যা দেখতে পাচ্ছি, তা হলো–একজন মাটিতে পড়ে আছে, আর তার মাথার কাছে আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে। কোনও মহিলাকেও দেখছি না, মুখোশও নজরে পড়ছে না। আসল ঘটনা কী? আপনাকে আমাদের সাথে থানায় যেতে হবে, স্যর।'

'অফিসার,' বললাম, 'আমি একজন লাইসেন্সধারী গোয়েন্দা। আমার নাম কারডুলা।' পকেটের দিকে হাত বাড়ালাম, কার্ডটা দেখাব। কিন্তু পরক্ষণেই জমে গেলাম। কারণ অফিসার যে তাঁর অস্ত্র আমার দিকে তাক করেছেন!

'একচুলও নড়বে না।' হুমকি দিলেন তিনি, 'মাথার উপরে হাত তোলো।'

কথা মত কাজ করলাম। অফিসার আমাকে সার্চ করে দেখলেন। কিন্তু কোনও অস্ত্র পেলেন না। 'হাত দুটো পিঠে রাখো।'

প্রথমে পেলাম ঠাণ্ডা ইস্পাতের স্পর্শ, এরপর কানে এল হাতকড়ার তালা লাগবার আওয়াজ। 'এসব...' বললাম, 'কী হচ্ছে? অর্থহীন সব ব্যাপার-স্যাপার।'

'অর্থহীন?' শ্রাগ করলেন অফিসার। 'তা হলে আর চিন্তা কী? কাল সকালেই ছাড়া পেয়ে যাবে।'

সকাল? না, না। সকাল হলে তো চলবে না।

অ্যাম্বুলেন্স এলে অফিসারের নজর ওদিকে চলে যাবে ভেবে চুপ করে রইলাম। হলোও তাই। আর সেই সুযোগে দৌড় দিলাম। দুটি দালানের মাঝখানের অন্ধকার গলিতে ঢুকে

পড়লাম।

অন্ধকারের আড়াল নিয়ে হাত গলে ফেলে দিলাম হাতকড়া। আশ্রয় নিলাম দালানের উপরতলার এক জানালার কারনিসে।

নিচে তাকাতেই দেখলাম, অফিসার দু'জন আমার পিছু-পিছু গলিতে ঢুকে পড়েছেন, হাতে উদ্যত অস্ত্র। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলছেন চারপাশে।

ওঁদের একজন হাতকড়াটা খুঁজে পেলেন। হাতে নিয়ে বললেন, 'খুলল কীভাবে? এখনও তো তালাবদ্ধ।'

গলির অন্য মাথা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ওঁরা দু'জন।

আমিও জায়গাটা থেকে পালিয়ে, নিজের অফিসে চলে এলাম।

জ্যানোস, আমার পরিচারক কাম ড্রাইভারকে বন্ধ দরজার সামনে দেখতে পেলাম। আমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছে।

'জ্যানোস,' বললাম, 'বাইরে কী ভয়াবহ অবস্থা, তা আন্দাজও করতে পারবে না।'

পার্কিঙে রাখা আমার গাড়ির দিকে যেতে-যেতে সব খুলে বললাম।

জ্যানোস ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবল। বলল, 'আসলেই অদ্ভুত, স্যর।'

'তো আর বলছি কী? আমি সচেতন নাগরিকের মত কাজ করলাম, আর পুলিস কি না আমাকেই জেলে পুরে দিতে চায়?'

'সে কথা বলছি না। বলছি যে, এরকম একজন ছিনতাইকারী, যে কি না পার্সটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবে, সে মুখোশ কেন পরবে?'

আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। জ্যানোস গাড়ি চালাচ্ছে। 'আর তা ছাড়া রাত চারটার সময় এরকম বয়সের এক মেয়েই বা কেন রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরবে?' বলল সে, 'আবার পতিতা-টতিতা...'

'না,' এবার আমার বলার পালা। 'দেখে তো ভদ্র ঘরের বলেই মনে হলো। অবশ্য, আজকাল এতে কিছু যায়-আসে না।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর জ্যানোস আমার গোয়েন্দাগিরির খবর জানতে চাইল, 'মিস্টার ডেকারের কী খবর?'

'ভাল না।' বললাম, 'মিসেস ডেকার যেমনটা ভেবেছেন, তাঁর স্বামী ব্যবসার জন্য শহর ছেড়ে যাননি। গিয়েছেন একজন মিস লেসলির অ্যাপার্টমেন্টে। রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত ওখানেই ছিলেন।'

আমি বিশাল এক ভিক্টোরিয়ান ম্যানশনে থাকি। শহরে থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে, নির্জন এক এলাকায় আমার বাড়ি। বাড়ি পৌঁছে, বেসমেন্টে চলে গেলাম। সাধারণত সূর্য ওঠার দশ মিনিট আগ পর্যন্ত আমি বই পড়ি। এরপর ঘুমোতে যাই।

পরদিন সন্ধ্যায়, জ্যানোস আমাকে সরাসরি মিস লেসলির অ্যাপার্টমেন্টের সামনে নামিয়ে দিল। আমি আবার কাজে লেগে পড়লাম। মি. ডেকারের উপর নজরদারি করার কাজ।

সন্ধ্যাটা সিনেমা দেখে আর দামী রেস্তোরাঁয় খাবার খেয়ে কাটালেন দু'জন। এরপর ফিরে এসে রাত বারোটার দিকে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি আড়াইটা পর্যন্ত দেখে ক্ষান্ত দিলাম। রওনা দিলাম আমার অফিসের দিকে।

গতরাতের ব্যবহার করা রাস্তাটা দিয়ে আজকেও হেঁটে ফিরছি, এমন সময় একটা পরিচিত দেহাবয়ব নজরে এল।

নাহ, ভুল করিনি। কেননা দেহটা কাছে এলে দেখতে পেলাম, ইনি গতরাতে দেখা মহিলাই।

হাঁটতে-হাঁটতে গতরাতের অকুস্থলে প্রায় পৌঁছে গিয়েছেন, এমন সময় ফোনবুথের আড়াল থেকে একটা লোক লাফ দিয়ে এসে তাঁর পার্সটা আঁকড়ে ধরল।

এবারও গতকালের মত টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হলো।

আশপাশের পথচারীরাও মুহূর্তের মাঝে নেই হয়ে গেল।

আগের রাতের মত, আজও আমি লোকটার হাত আঁকড়ে ধরলাম। ছুঁড়ে দিলাম বাতাসে।

ছুঁড়ে দিয়েই বুঝতে পারলাম, আজকেও সে আরেকটা ডাস্টবিনের উপর গিয়ে পড়তে যাচ্ছে। হলোও তাই।

আমি মহিলার দিকে ফিরে তাকালাম, দেখলাম চোখে রাগ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

'চুলোয় যাও!' বললেন তিনি। গতরাতের মত আজকেও উধাও হয়ে গেলেন।

আমি তাঁর চলে যাওয়া দেখলাম। এরপর শ্রাগ করে ছিনতাইকারীর দিকে এগিয়ে গেলাম। মুখোশটা খুলে ফেললাম একটানে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো। এসব হচ্ছেটা কী! গতরাতের মানুষটাকেই দেখা যাচ্ছে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো? ভুল করে কোনও সময়-সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়িনি তো? এই ঘটনাটা কি আমার সাথে বার-বার ঘটতে থাকবে?

ঘুরে দাঁড়ালে কি পুলিসের গাড়ি দেখতে পাব?

ঘুরব না...ঘুরব না করেও, ঘুরে দাঁড়ালাম। আসলে যেন, কেউ আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে বাধ্য করল। একটা গাড়ি দেখতে পেলাম, ছাদে লাইট লাগানো। পুলিসের গাড়ি? নাকি ট্যাক্সি?

জানার জন্য অপেক্ষা করলাম না। দৌড় দিলাম মহিলা যেদিকে উধাও হয়ে গিয়েছেন সেদিকে। দেখতে পেলাম মহিলা রাস্তা পেরিয়ে ডানে মোড় নিচ্ছেন। নজরের আড়াল হতে দেয়া যাবে না–ভাবলাম। পিছু নিলাম তাঁর।

আরও দুই ব্লক হেঁটে একটা বড় অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ গিয়ে ঢুকলেন তিনি। মহিলাকে এলিভেটরে চড়তে দেখলাম। উপরের লাইট দেখে বুঝতে পারলাম, তিনি ১৯তম ফ্লোরে যাচ্ছেন।

বিল্ডিং-এর বাইরে লাগানো নামের তালিকা পরীক্ষা করে, ১৯ তলায় শুধু একটা নামই দেখতে পেলাম, ডব্লিউ দিয়ে যেটি শুরু হয়েছে। রিচার্ড ওয়াকার। ১৯০৩ নাম্বার অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন।

এলিভেটরে চড়ে ১৯ তলায় উঠে এলাম। আশপাশে তাকিয়ে একটা ছোট খোলা ইউটিলিটি ক্লজিট দেখতে পেলাম। দেরি না করে ১৯০৩ নাম্বার অ্যাপার্টমেন্টের ডোর বেল বাজিয়ে দিলাম। আর সঙ্গে-সঙ্গে এসে লুকালাম ক্লজিটে।

কে খুলবে দরজা? রিচার্ড ওয়াকার? নাকি কোনও চাকর? লোকটার কি চাকর আছে? না। আমি ভাবলাম, এই সময়ে যে জেগে আছে, একমাত্র সে-ই দরজা খুলবে। এর অর্থ, আমি যে মহিলাকে অনুসরণ করছি, তাঁর দরজা খোলার সম্ভাবনাই বেশি।

এক ইঞ্চি ফাঁক করে রাখা ক্লজিটের দরজা দিয়ে দেখতে পেলাম, আমি সঠিক।

মহিলাটি দরজা খুলে একবার করিডরের উপর নজর বুলালেন। কাউকে দেখতে না পেয়ে, বিরক্ত হয়ে লাগিয়ে দিলেন আবার।

অফিসে ফিরে দেখি, জ্যানোস আজকেও আমার জন্য অপেক্ষা করছে। গাড়িতে উঠে আজকের ঘটনাও বললাম ওকে।

অনেকক্ষণ ভেবে উত্তর দিল, 'আজকের জন্যও কি মুখোশ পরে এসেছিল?'

আমি মাথা নেড়ে জানালাম–হ্যাঁ।

জ্যানোস দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'কাকতালীয় ব্যাপার-স্যাপার বেশি হয়ে যাচ্ছে। প্রথম ব্যাপারটা হলো, আপনার পরপর দুই দিন একই সময়, একই জায়গায় উপস্থিত থাকা।'

'এটা আসলে কাকতালীয় কিছু না। আমি মিস লেসলির অ্যাপার্টমেন্টের উপর নজর রাখছিলাম। এধরনের কেসে আমি সাধারণত রাত দুটোর দিকে ক্ষান্ত দিই। আর ওখান থেকে অফিসে আসার সবচেয়ে শর্টকাট রাস্তাও এটাই।'

জ্যানোস ভ্রূ কুঁচকাল। 'কিন্তু একই লোককে পরপর দুই রাত ডাস্টবিনে ফেলার ব্যাপারটা কেমন-কেমন না?'

'ভেবে দেখো, এটাও তেমন কাকতালীয় কিছু না। যখন কেউ কোনও কিছু ছুঁড়ে দেয়, তখন অবচেতনভাবেই সে কোনও একটা কিছুকে টার্গেট বানিয়ে নেয়। এই যেমন–কোনও গাছ বা কোনও পাথর। এক্ষেত্রে ডাস্টবিন ছিল সবচেয়ে কাছের লজিকাল টার্গেট।'

জ্যানোস কিন্তু ব্যাপারটাকে ছেড়ে দিল না। 'এই ডাস্টবিনটা কি গতরাতেরটাই ছিল? নাকি নতুন একটা?'

আমি কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দিলাম, 'না, জ্যানোস। এখন মনে পড়ছে। ওই ফুটপাতে দুটো ডাস্টবিন ছিল। একটা আরেকটা থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে। গতরাতে একটা ভেঙেছি আর আজ একটা।'

জ্যানোসকে দেখে মনে হলো, নির্ভার হয়ে গিয়েছে। 'আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনি কোনও সময়-সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়েছেন হয়তো। এখন অনন্তকালের জন্য আপনাকে এই একই কাজ করে যেতে হবে। তবে, আমি যতদূর জানি এধরনের পরিস্থিতিতে একই ডাস্টবিন বার-বার ভাঙা হয়।'

জ্যানোস ফ্রি-ওয়েতে উঠে গতি বাড়িয়ে

দিল। 'তবে মহিলার ব্যাপারটা সন্দেহজনক। একই মহিলার গভীর রাতে একই জায়গায় পরপর দু'রাত উপস্থিত থাকার ব্যাপারটা আমাকে ভাবাচ্ছে। দু'বারই পার্স ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালানো হয়েছে আর দু'বারই একই লোক সেই চেষ্টাটা করেছে।'

'জ্যানোস,' আমি বললাম, 'প্রথমবার যেভাবে ছুঁড়ে মেরেছিলাম, তাতে ছিনতাইকারীকে অবশ্যই হাসপাতালে যেতে হবে। আর কিছু না হলেও, হাতে প্লাস্টার থাকার কথা। অথচ ঠিক পরের দিন ওকে দেখতে পেলাম–সম্পূর্ণ সুস্থ!'

জ্যানোসের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেল। 'এর সমাধান আমি জানি। আমার বিশ্বাস লোক একজন নয়, দু'জন! যমজ ভাই। তবে ট্রিপলেট (তিনজন) বা কোয়াড্রুপলেট-ও (চারজন) হতে পারে।'

আমি মেনে নিলাম।

'আমারও তাই মনে হয়। আগামীকালও একই সময়ে একই জায়গায় থাকব। দেখি যমজ না অন্য কিছু।'

সন্ধ্যাটা শুরু হলো মিস লেসলির অ্যাপার্টমেন্টের উপর নজরদারি করা দিয়ে। রাত দশটায় মি. ডেকার তাঁর সুটকেস হাতে বিদায় নিলেন। একটা ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন, আমিও তাঁর পিছু-পিছু গেলাম।

এরপর অফিসে ফিরে মিসেস ডেকারের জন্য একটা রিপোর্ট লিখলাম। আমার বিলের সঙ্গে রিপোর্টটাও তাঁকে মেইল করে দিলাম।

পরবর্তী কয়েকটা ঘণ্টা কাটল নতুন ক্লায়েন্টের জন্য অপেক্ষা করে। যখন রাত তিনটা বাজল, তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, আজ আর কেউ আসছে না।

ওয়াকার নামের মহিলাটির জন্য জায়গা মত গিয়ে অপেক্ষা করব কি না ভাবলাম। কিন্তু ঠিক করলাম, মেয়েটার অ্যাপার্টমেন্ট থেকেই ওকে অনুসরণ করাটা ভাল হবে।

ভাগ্য ভাল যে, সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম, কেননা সাড়ে তিনটার সময় মহিলা বের তো হলেন, কিন্তু হাঁটা শুরু করলেন রাস্তার উল্টো দিকে। হাতে সেই বড় হ্যাণ্ড ব্যাগটা এখনও শোভা পাচ্ছে। কিন্তু এবার তিনি দাঁড়ালেন একটা বইয়ের দোকানের সামনে, ভাবখানা এমন যে বই দেখছেন। কিন্তু আড়চোখে রাস্তার ডানে-বাঁয়ে তাকানোটা আমার নজর এড়ায়নি।

যখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি একা, তখন জলদি করে ফুটপাতে রাখা ডাস্টবিনের কাছে চলে গেলেন তিনি। হ্যাণ্ড ব্যাগ খুলে একটা বড় বাদামি প্যাকেট বের করলেন। ঢাকনা খুলে ফেলে দিলেন ভেতরে। এরপর যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে চলে গেলেন দূরে।

আমার ভ্রূ কুঁচকে গেল। ঘুরে ফিরে এত ডাস্টবিন কেন বার-বার আসছে?

ব্লকের শেষ মাথায় একটা নড়াচড়া দেখতে পেলাম। হাতে ব্রিফকেস নিয়ে একটা লম্বা লোক হেঁটে আসছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এতক্ষণ কোনও অন্ধকার কোণে লুকিয়ে ছিল। ডাস্টবিনের কাছে এসে হাত ঢুকিয়ে দিল ভিতরে। হাতড়ে-হাতড়ে প্যাকেটটা খুঁজে বের করে ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে ফেলল। এরপর চলে গেল। আমি পিছু নিলাম।

ফুটপাতের পাশে পার্ক করে রাখা একটা গাড়িতে চড়ে বসল লোকটি।

প্রায় মিনিট বিশেক গাড়ি চালাবার পর, শহরের শিল্প এলাকায় ঢুকে পড়ল। চলার মাঝে বেশ কয়েকবার সামনে-পিছে গাড়ি চালিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে যে কেউ পিছু নেয়নি। গাড়ি থামল একটা জীর্ণ দেখতে গুদাম-ঘরের সামনে।

লোকটা গুদাম-ঘরে ঢুকে পড়লে, আমি একটা ফোকর খুঁজে নিয়ে ওর পিছু-পিছু ঢুকে পড়লাম।

পরিত্যক্ত গুদাম-ঘর।

লোকটাকে বিশাল ঘরটার একেবারে কোনায় চলে যেতে দেখলাম। ভালমত খেয়াল করে দেখি, ওখানে একটা চেয়ার পাতা। আর তাতে একজনকে বেঁধে রাখা হয়েছে। লোকটার বয়স পঞ্চাশের বেশি হবে না, কপালের দু'পাশের চুলে রূপালি রঙ ধরেছে।

একজন ভারী লোক লম্বা লোকটাকে সম্ভাষণ জানাল। ভারী লোকটার শোল্ডার হোলস্টারে একটা অস্ত্র শোভা পাচ্ছে, 'তা, ম্যাক্সি, এবার কোনও অসুবিধা হয়নি তো?'

ম্যাক্সি ব্রিফকেসে আলতো বাড়ি মেরে বলল, 'জলবৎ তরলং, পিট।' বাদামি প্যাকেটটা বের করে এনে ডলারের নোটগুলো ঢেলে দিল সামনে রাখা ডেস্কে। শুরু করল গোনা।

আমি দুইয়ে-দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেললাম। অপহরণের মামলা। চেয়ারে বাঁধা লোকটার চেহারার সঙ্গে ১৯০৩ নং অ্যাপার্টমেন্টের মেয়েটার চেহারার অনেক মিল। ইনি সম্ভবত মেয়েটার বাবা।

তাঁকে অপহরণ করে মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে।

এলিজাবেথ ওয়াকারকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল, ফুটপাতের পাশের ডাস্টবিনে টাকা ফেলতে। কোন্ ফুটপাত, সেটাও নিশ্চয়ই বলে দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু দুটো অভাবনীয় ঘটনা ঘটে যায়। প্রথমত, এলিজাবেথের পার্স কেউ একজন ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে আর দুই, আমি ওকে বাধা দিই। আর তা করতে গিয়ে ধ্বংস করে ফেলি নির্ধারিত ডাস্টবিন।

নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া এলিজাবেথের আর কিছু করার ছিল না। লম্বা কিডন্যাপার, মানে ম্যাক্সি নিশ্চয়ই ধারে-কাছে কোথাও ছিল। ঘটনাটা নিজ চোখেই দেখেছে। আর যেহেতু এরকম ঘটনা পরপর দু'দিন ঘটার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য, তাই ফোন করে আবারও একই কাজ করার নির্দেশ দেয়। তবে এবার টাকা একটু দূরের ডাস্টবিনটায় ফেলবার কথা বলে।

কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে যায়, ধ্বংস হয় দ্বিতীয় ডাস্টবিনটাও।

ম্যাক্সির অবশ্য ডাস্টবিনে টাকা ফেলার ব্যাপারটা মনে ধরে গিয়েছিল। তাই সে তৃতীয়বারেও ডাস্টবিনেই টাকা ফেলবার নির্দেশ দেয়। তবে রাস্তাটা চেঞ্জ করে দেয়। এবার কোনও ঝামেলা হয়নি।

ওদের গোনা শেষ হলো।

'পিট,' ম্যাক্সি বলল, 'টাকা পুরোটাই আছে। খুব কষ্ট হয়েছে কামাতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরেছি আমরা।'

পিটকে দেখে মনে হলো কী যেন হিসাব মেলাচ্ছে। 'আমি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখলাম, ম্যাক্সি। আমার বিশ্বাস হয় না।'

'কী বিশ্বাস হয় না?'

'এই যে পরপর দুই দিন দুইবার দুইজন ছিনতাইকারীর পার্স ছিনতাইয়ের গল্পটা। আর কালো কোট পরা লোকটার তাদেরকে পুতুলের

প্রকাশিত হয়েছে
যুদ্ধোপন্যাস ভলিউম
দুটি বই একত্রে

স্যাবটাজ: নিয়াজ মোরশেদ/ কাজী আনোয়ার হোসেন

১৯৪৩ সাল। আফ্রিকা-বিজয়ের পর সিসিলি হয়ে আসতে চাইছে মিত্রবাহিনী ইউরোপের অধিকৃত মেইনল্যাণ্ডে। কিন্তু তার আগে ক্যারিডি নামের বিশাল এক জার্মান ট্রেনফেরি ডুবাতে না পারলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে সমস্ত আক্রমণ। বার কয়েক ব্যর্থ চেষ্টার পর স্যাবটাজ-টিমের নেতৃত্বের ভার পড়ল মেজর রাহাতের ওপর। রওনা হলো সে অসাধ্য সাধনে, যেমন করে হোক ডুবিয়ে দেবে ক্যারিডি। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-চিফের যুবক বয়সের এক রোমহর্ষক কাহিনি।

দাগী আসামী: রওশন জামিল/ কাজী আনোয়ার হোসেন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। আজকের মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান তখন এক তরুণ মেজর। হঠাৎ এক দায়িত্ব চাপল কাঁধে–কোর্টমার্শালে সাজা পাওয়া বারোজন কয়েদিকে দক্ষ করে তুলতে হবে স্যাবটাজে। সুইসাইড স্কোয়াড হিসেবে নাৎসি লাইনের পেছনে কাজ করবে এরা। নেতৃত্বে থাকতে হবে তাকে। ভয়ঙ্কর সব লোকজন; খুনে, বদমাশ। পারবে রাহাত ওদের বাগে আনতে?

দাম ■ একশ' একত্রিশ টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মত ত্রিশ ফুট দূরে ছুঁড়ে দেয়াটা।'

'ঘটনাটা অস্বাভাবিক, তা আমি জানি, পিট। কিন্তু সত্য।'

পিট হোলস্টার থেকে অস্ত্রটা হাতে নিল। 'না, ম্যাক্সি। কী হয়েছিল তা আমি তোমাকে বলছি। প্রথমবারের টাকা তুমি ঠিকই নিয়ে নিতে পেরেছ। কিন্তু এখানে না এনে কোথাও লুকিয়ে ফেলেছ। আর আমাকে শুনিয়েছ গাল গপ্পো। এরপর ওই ওয়াকার মেয়েটাকে ফোন করে জানিয়েছ, পণ বেড়ে গিয়েছে। আরও পঞ্চাশ লাগবে।'

'তুমি ভুল করছ, পিট।'

পিট মাথা নাড়ল। 'আর যেহেতু প্রথমবারে কোনও সমস্যা হয়নি, তাই একই কাজ করেছ দ্বিতীয়বারেও। এবারও টাকাটা লুকিয়ে আমাকে ওই গল্প শুনিয়েছ।'

'পিট, আমি কসম খেয়ে বলছি...'

'আবার ফোন করলে মেয়েটাকে। কিন্তু তিনবার বেশি হয়ে যায় বলে, এবার আর সেই একই খেলা না খেলে আমার কাছে নিয়ে এলে টাকাগুলো।' পিট যেন গর্জে উঠল। 'এর মানে তুমি পাচ্ছ এক লাখ পঁচিশ হাজার ডলার আর আমি পাচ্ছি কি না মাত্র পঁচিশ হাজার! এত বড় আস্পর্ধা তোমার!' হাতের অস্ত্রের নাচন দেখে আমিই ভয় পেয়ে গেলাম, ম্যাক্সির কথা তো বলাই বাহুল্য।

ম্যাক্সি হাত তুলে কাঁপতে-কাঁপতে বলল, 'ওকে, পিট। মেনে নিচ্ছি। তুমি যেভাবে বললে, ঠিক সেভাবেই হয়েছে সব কিছু। কিন্তু যদি তুমি এখন আমাকে মেরে ফেল, তা হলে টাকাটা চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে।' ঠোঁট দিয়ে জিভটা ভেজাল একবার। 'আমি বলব টাকাটা কোথায়। শুধু...শুধু পিস্তলটা...'

আমি ম্যাক্সির বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। ভাল বুদ্ধি খাটিয়েছে। পিটের বলা সব কথা সত্যি–এই দাবি করলে এতক্ষণে কপালে ফুটো নিয়ে পড়ে থাকতে হত। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ, মিথ্যা হলেও, স্বীকার করে নেয়ায় জানটা আরও কিছুক্ষণ বাঁচবে। কে জানে, এরই মাঝে হয়তো নিজেকে বাঁচাবার সুযোগ মিললেও মিলতে পারে।

তবে মুগ্ধ হয়ে লাভ নেই। আমার কাজে নামার সময় হয়ে এসেছে। এতক্ষণ ছাদের সঙ্গে লটকে ছিলাম। এবার লাফ দিয়ে নামলাম ওই দু'জনের সামনে।

হঠাৎ আমার আবির্ভাবে চমকে উঠে, নিজের অজান্তে গুলি করে বসল পিট। বুকের হাড়ে লেগে ছিটকে গেল সেটা।

আমার হাতের এক আঘাতে পিস্তলটা হাতছাড়া হয়ে গেল পিটের। পরের আঘাতটা করলাম পাশ থেকে। এরপর কী হলো, সেটা পিট কোনওদিন বলতে পারবে না।

এদিকে ম্যাক্সি এতক্ষণে আমাকে আরেকটা চেয়ার দিয়ে আঘাত করেছে। ঘুরে দাঁড়ালাম। অবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের হাতে ধরা চেয়ারের ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল সে। ছিনতাইকারীদেরকে যেমন করে ছুঁড়ে ফেলেছি, ওকেও তেমনি ছুঁড়ে ফেললাম। দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ল ম্যাক্সির দেহ।

ওয়াকারকে বাঁধনমুক্ত করে ডেস্কে রাখা টেলিফোনটা দিয়ে ফোন করলাম পুলিসকে। ওয়াকার আমার দিকে বড়-বড় চোখ করে তাকিয়ে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে আছ।'

আমি একবার হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। আমি পুলিস আসার আগেই পালাতে চাই। ওরা আমাকে এখানে পেলে, জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আটকাতে চাইবে। সূর্য ওঠার পর যদি আমি বাইরে থাকি, তা হলে...

'তুমি কে?' ওয়াকার জিজ্ঞেস করল।

মুচকি হাসলাম, 'এই মুহূর্তে নামটা গোপন রাখতে চাই।'

মাস্টার লাইব্রেরী অ্যাণ্ড স্টেশনারী
প্রোপ্রাইটর: আলহাজ্ব মোঃ নজির আহম্মদ মাস্টার
ব্যাংক রোড, চৌমুহনী
নোয়াখালী।
এখানে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের সমস্ত নতুন বই পাওয়া যায়।
মোবাইল: ০১৭১২-১৩৭৩২৪, ০১৭১৮-৬২০৬৯২

'কিন্তু তোমার তো পুরস্কার পাওয়া উচিত।'

পুরস্কার? ক্ষতি কী? হাজার হলেও, ঘাম তো ঝরাতে হয়েছে। বুলেট লেগে পরনের শার্ট আর স্যুটেরও দফারফা।

অপহরণের টাকা থেকে কিছু দিয়ে দিতে বলব নাকি? না। সবটাই প্রমাণ।

আমি আবার হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। 'দুঃখিত। কিন্তু আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা সম্ভব না। তবে আমি আপনার সাথে অবশ্যই দেখা করব। হয়তো আগামীকাল সন্ধ্যাতেই।'

বেরিয়ে যাবার পথে দেখি, ম্যাক্সি একটা ডাস্টবিনের উপর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে!

মনে-মনে হাসলাম। একেই বলে কাকতালীয়!

অফিসে ফিরে দেখি, জ্যানোস চিন্তিত মুখে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সময় নষ্ট না করে চড়ে বসলাম গাড়িতে। সূর্য ওঠার মাত্র তিন মিনিট আগে বাড়ি পৌঁছলাম।

পরদিন সূর্য ডুবলে জ্যানোস আমাকে ওয়াকারের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে নামিয়ে দিল।

১৯তম ফ্লোরে উঠে ১৯০৩ নং অ্যাপার্টমেন্টের বেল বাজালাম।

দরজা খুললেন এলিজাবেথ ওয়াকার। আমাকে দেখে চোখ যেন গোল আলু হয়ে গেল। 'আবার আপনি!'

ওয়াকার আমাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এলেন, 'এলিজাবেথ, এ লোকের কথাই তোমাকে বলেছি।'

এলিজাবেথ আমাকে ঢুকতে দিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা যে ওঁর পছন্দ হচ্ছে না সেটাও বুঝিয়ে দিলেন।

অ্যাপার্টমেন্টটা বিশাল। তবে, ভিতরে যেসব আসবাব ব্যবহার করা হচ্ছে তা দেখলে কেউ ওদের কাউকে অপহরণ করার কথা চিন্তাতেও আনবে না।

এক মাঝবয়সী, গোমড়ামুখী মহিলাকে দেখতে পেলাম। হাতে কোট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, 'আমি যাচ্ছি। নয়টার দিকে ফিরব।'

মহিলা চলে গেলে ওয়াকার বললেন, 'ও ম্যাগী। একটু অভদ্র, কিন্তু ঘরে থেকে কাজে সাহায্য করবে এমন কাউকে আজকাল পাওয়াই যায় না।' মেয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা সে যাচ্ছেটা কোথায়?'

'হসপিটালে। ওর ভাইদেরকে দেখতে। ওদের কথা মনে আছে না? মাঝে-মাঝে ম্যাগীকে দেখতে আসে?'

ওয়াকার নড করলেন, 'ওহ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। যমজ দুই ভাই না?'

এলিজাবেথ নড করলেন, 'কাকতালীয় ব্যাপার। প্রথমে একজন কী যেন একটা দুর্ঘটনায় পড়ে কবজি আর পাঁজরের কয়েকটা হাড় ভেঙে ফেলেছে। আর ঠিক তার পরদিন অন্যজনও কবজি আর পাঁজরের হাড় ভেঙে ফেলেছে। ম্যাগী এ ব্যাপারে আমাকে কিছুই জানায়নি। হাসপাতাল থেকে ফোন না এলে সম্ভবত জানতে পারতামও না।'

আমি যে এতক্ষণ খুব মনোযোগের সঙ্গে কথা শুনছিলাম, তা বলাই বাহুল্য। 'আপনি কখন কোথায় মুক্তিপণের টাকা দিতে যাবেন, সেটা কি ম্যাগী জানত?'

এলিজাবেথ আবারও নড করলেন। 'জানত। অপহরণের কথাও জানত। কারণ অপহরণ করার সময়, ওকে ঠেলে সরিয়েই তো অপহরণকারীরা ঘরে ঢুকেছিল!'

ব্যাপারটার সাথে ম্যাগীও জড়িত নাকি? মনে হয় না। পিট তো তিন ভাগ করার কথা কিছু বলেনি। বলেছিল, পঞ্চাশ হাজারের মাত্র পঁচিশ ও পাবে।

সে যাই হোক, ম্যাগী নিশ্চয়ই অপহরণটাকে নিজের কাজে লাগাতে চেয়েছিল। প্রথমে নিজের এক ভাইকে টাকা হস্তান্তরের জায়গায় পাঠিয়েছিল। এলিজাবেথের হ্যাণ্ড ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে পারলেই, এখন ম্যাগী আর ওর দুই ভাই পঞ্চাশ হাজার ডলারের মালিক বনে যেত।

কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়টাও। কে জানে, ম্যাগীর ভাইরা ট্রিপলেট হলে হয়তো আরেকবার চেষ্টা চালাত।

আমি নিজেও বসলাম, ওয়াকার পরিবারের সদস্যদ্বয়কেও বসতে বললাম। এরপর জানালাম, কেন ওঁদের ম্যাগীর বদলি খোঁজা দরকার... ■

ভারতের সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকার নিম্ন বর্ণের হিন্দু ছিলেন বলে, স্কুলের বারান্দায় বসে-বসে ক্লাস করতেন। তাঁকে ক্লাসের বেঞ্চে বসতে দেয়া হত না।

ভয়কে জয় করতে শিখুন

টিপলি দেবী চৈতি

রবীন্দ্রনাথ স্কুল পালিয়েছিলেন। নজরুল তো বেশি পড়তেই পারেননি। লালন তো বোঝেনইনি স্কুল কী। আজ মানুষ তাঁদেরকে নিয়ে গবেষণা করে, পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করছে!

●

অ্যান্ড্রু কার্নেগীকে তো ময়লা পোশাকের জন্য পার্কেই ঢুকতে দেয়া হয়নি! ৩০ বছর পরে উনি সেই পার্কটি কিনে নেন। আর সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেন, 'সবার জন্য উন্মুক্ত'।

●

স্টিভ জবস্ শুধুমাত্র একদিন ভাল খাবারের আশায় সাত মাইল পায়ে হেঁটে গির্জায় যেতেন!

●

ভারতের সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকার নিম্ন বর্ণের হিন্দু ছিলেন বলে, স্কুলের বারান্দায় বসে-বসে ক্লাস করতেন। তাঁকে ক্লাসের বেঞ্চে বসতে দেয়া হত না। কোনও গাড়ি তাঁকে নিত না। মাইলের পর মাইল হেঁটে তিনি পরীক্ষা দিতে যেতেন!

●

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আতিউর রহমানের ক্যাডেট কলেজে ভর্তির টাকা হাটুরেদের কাছ থেকে তুলে, জোগাড় করতে হয়েছিল তাঁর চাচাদের। গরু না থাকায়, তিনি নিজ জমিতে লাঙল টেনেছিলেন একসময়!

●

সুন্দর চেহারার কথা ভাবছেন? শেখ সাদীর চেহারা যথেষ্ট কদাকার ছিল। লতা মঙ্গেশকারের চেহারা মোটেও সুশ্রী নয়। তৈমুর লং খোঁড়া ছিলেন। নেপোলিয়ন ছিলেন বেঁটে। শচীন টেণ্ডুলকারের উচ্চতা তো জানাই আছে। আব্রাহাম লিংকনের মুখ ও হাত যথেষ্ট বড় ছিল!

লতা মঙ্গেশকার

●

স্মৃতিশক্তির কথা ভাবছেন? আইনস্টাইন নিজের বাড়ির ঠিকানা ও ফোন নাম্বার মনে রাখতে পারতেন না!

কিছুই আপনার উন্নতির পথে বাধা হতে পারে না। যদি কোনও কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে তা আপনার ভিতরের ভয়। ভয়কে জয় করতে শিখুন। সাফল্য আপনার হাতের মুঠোয় ধরা দেবেই। ■

(ইন্টারনেট থেকে পাওয়া)

BoiLovers.com
Present

Book is free for all

Contact

www.boilovers.com

www.facebook.com/SuperiorSuny

01843-456129

জীবনদর্শন

অর্পণ দাশগুপ্ত

স্বামীটি হেসে উঠল এবং খাপ থেকে তলোয়ার বের করে স্ত্রীর গলার দিকে এমনভাবে তাক করল যে স্ত্রীর গলা থেকে তলোয়ারের ডগার দূরত্ব বড়জোর এক ইঞ্চি হবে।

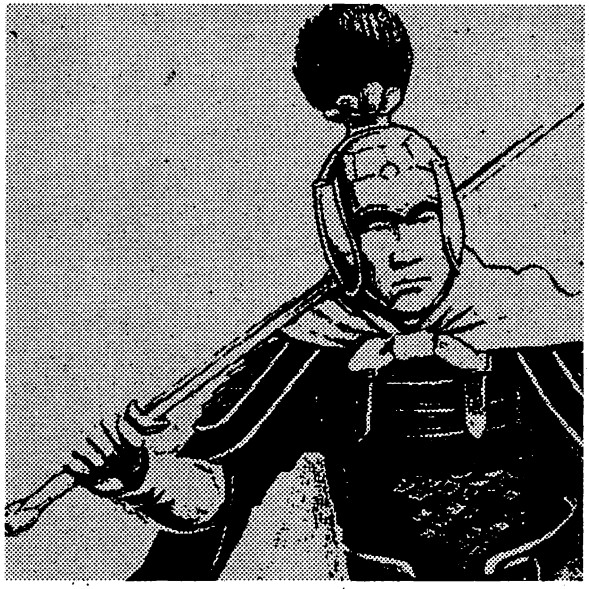

এক চাইনিজ ওয়ারিয়র তার স্ত্রীকে নিয়ে বাসা থেকে বেশ দূরের এক লেকে ঘুরতে গিয়েছিল। দু'জন মিলে প্যাডল বোটে করে মনের সুখে লেকের স্বচ্ছ জলের সৌন্দর্য অবগাহন করছে। ওরা মাঝ লেকের দিকে অবস্থান করছে, এমন সময় হঠাৎ করে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়ঙ্কর ঝড় সৃষ্টি হলো। স্বামীটি সাহসী ছিল, কিন্তু স্ত্রী ভয় পাচ্ছিল, কারণ ঝড়ের প্রচণ্ডতা এত বেশি যে ওদের ছোট বোট যে-কোনও মুহূর্তে ডুবে যাবে। স্বামীটি খুব শান্তভাবে মাথা ঠাণ্ডা করে বসে রইল যেন কিছুই ঘটছে না। স্ত্রী অবাক হয়ে স্বামীকে প্রশ্ন করল, 'তোমার কি ভয় লাগছে না? আমরা যে-কোনও সময় মারা পড়তে পারি। এটাই আমাদের শেষ মুহূর্ত হতে পারে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আমরা আর কখনওই তীরে ফিরতে পারব না। যদি অলৌকিক কিছু না ঘটে তা হলে আজ আমাদের বাঁচার কোনও রাস্তা নেই।'

স্বামীটি স্মিত হেসে উত্তর দিল যে তার ভয় লাগছে না।

স্ত্রীটি এবার রেগে গিয়ে স্বামীর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, 'তোমার ভয় লাগছে না! তুমি কি পাগল? তুমি পাথর নাকি অন্য কিছু?'

স্বামীটি হেসে উঠল এবং খাপ থেকে তলোয়ার বের করে স্ত্রীর গলার দিকে এমনভাবে তাক

করল যে স্ত্রীর গলা থেকে তলোয়ারের ডগার দূরত্ব বড়জোর এক ইঞ্চি হবে।

স্বামীর কাণ্ড দেখে স্ত্রী হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ?' স্বামী এবার স্ত্রীর প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

এবার স্ত্রী হেসে ফেলল। 'আমি কেন ভয় পাব! তুমি আমার স্বামী। তলোয়ার যদি তোমার হাতে থাকে, আমার ভয় পাবার কিছুই নেই। কারণ আমি জানি তুমি আমাকে কত ভালবাস!'

স্বামী এবার তলোয়ার খাপে ভরে স্ত্রীকে বলল, 'এটাই আমার উত্তর। এ কারণেই আমি শান্ত আছি। কারণ আমি জানি সৃষ্টিকর্তা আমাকে ভালবাসেন, এবং এই ঝড় তাঁর হাতেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই আমার ভয় পাবার কিছুই নেই।'

আমাদের জীবনেও ঝড় আসে। খারাপ সময় আসে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে আমরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। কী করা উচিত ভেবে না পেয়ে আমরা দিশেহারা হয়ে যাই। কিন্তু আমাদের মাথাতে তখন এটা কাজ করে না যে, সৃষ্টিকর্তা কত ভালবেসে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন, পানি, খাদ্য সহ কত অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছেন। আমাদের জীবনে যে খারাপ সময় আসে, যে ঝড় আসে তা সৃষ্টিকর্তাই নিয়ন্ত্রণ করেন। যদি আমরা সে ঝড় থেকে বেঁচে উঠতে পারি ভাল, না পারলেও ভাল। কারণ সবকিছু তাঁর হাতেই। কাজেই যা হবে, তা ভালর জন্যই হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, আমাদের চর্ম চক্ষে আমরা এই ভালটা কোথায় সেটা দেখতে পারি না, জানতে পারি না, অনুভব করতে পারি না। যেজন্য আমরা সৃষ্টিকর্তার উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে দিশেহারা হয়ে যাই, ভেঙে পড়ি।

বিশ্বাস মানুষকে অনেক কিছু থেকে মুক্তি দেয়। তাই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সৃষ্টিকর্তার উপর এই বিশ্বাস রাখুন যে, তিনি যা করেন তা আপনার মঙ্গলের জন্যই। ■

(ইন্টারনেট থেকে পাওয়া)

১৩/১২/১৬ প্রকাশিত হচ্ছে
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর
দ্য গোস্ট কিংস
রূপান্তর: সাইফুল আরেফিন অপু

পাহাড়ি ঢল যখন র‍্যাচেলকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক তখন ঈশ্বর প্রেরিত দূত হয়ে ওকে বাঁচাতে এল রিচার্ড ড্যারিয়েন। প্রেমের দেখা পেল ও। প্রমত্তা নদী, পাহাড়ি ঢল আর হিংস্র সিংহের থাবা এড়িয়ে বেঁচে যাওয়ায় নেটিভরা ওর নাম দিল ইনকোসাজানা অর্থাৎ স্বর্গীয় কন্যা। জুলুল্যাণ্ডে ইনকোসাজানার উপস্থিতি চাইল রাজা ডিনগান। বোয়েরদের সাথে লড়াইয়ে যাবে কিনা, ইনকোসাজানার কাছে তা জানতে চাইল ডিনগান। ওদিকে প্রথম দর্শনেই র‍্যাচেলের প্রেমে পড়ল নিশাচর ইসমাইল। ডিনগানের সাথে ষড়যন্ত্র করে র‍্যাচেলের বাবা-মাকে হত্যা করল ইসমাইল। চাইল বন্দি করে ওকে দখল করতে। একই সময় সবার চোখে মৃত হিসেবে উপস্থাপন করা হলো রিচার্ডকে। শেষ আশ্রয় রিচার্ডকে হারিয়ে উন্মাদ হয়ে গেল র‍্যাচেল। এখন, ডিনগান কি তার প্রশ্নের উত্তর পাবে? র‍্যাচেল কি ফিরে পাবে নিজেকে? আবার কি ফিরবে রিচার্ড? এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে র‍্যাচেলের সাথে আমাদেরও যেতে হবে বামুনভূত জাতির এলাকায়, বিশাল মহীরুহের বনে। চলুন তা হলে রওনা হওয়া যাক অন্ধকার আফ্রিকার গহীনে।

দাম ■ একশ' ছেচল্লিশ টাকা

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

কোমর ব্যথা সমস্যা

আমরা যে ধরনের ব্যথার সাথে সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তা হলো কোমরে ব্যথা বা 'লো ব্যাক পেইন'। শরীর ব্যথায় আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ৩০-৪০ শতাংশ কোমরের ব্যথায় ভুগে থাকেন। এ ক্ষেত্রে রোগীদের অভিযোগ থাকে, অনেকক্ষণ বসে থাকলে ওঠার সময় কোমরে ব্যথা লাগে।

দীর্ঘক্ষণ চেয়ারে বসে থাকলে কোমরে ব্যথা লাগে, নামাজ পড়তে অসুবিধা হয়, অনেকক্ষণ বসে কাজ করলে বসা থেকে উঠতে কোমরে ব্যথা হয়। এক পা বা উভয় পা-ই ঝিন-ঝিন করে বা অবশ-অবশ লাগে, পায়েও ব্যথা হয়। এসবই 'লো ব্যাক পেইন' বা কোমর ব্যথার উপসর্গ।

কোমরে ব্যথার কারণ

- মেরুদণ্ডের কশেরুকার মধ্যবর্তী ডিস্ক বা চাকতি ক্ষয় হয়ে গেলে।
- অস্থিসন্ধির অভ্যন্তরের অস্থি ক্ষয়ে গেলে।
- মহিলাদের গর্ভাবস্থা ও সন্তান প্রসবের কারণে কোমরের অস্থিসন্ধিগুলো ঢিলা হয়ে গেলে।
- ডায়াবেটিস রোগে সংযোজন কলা, অস্থি ও স্নায়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হলে।
- অস্টিওপোরোসিস রোগে কশেরুকাগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙে গেলে।
- পেটের নিম্নাংশে কিংবা সরাসরি মেরুদণ্ডের হাড়ে অন্য জায়গা থেকে ছড়িয়ে পড়া টিউমারে আক্রান্ত হলে।
- মানসিকভাবে বিপর্যস্ত লোকদের, চাকরিতে বীতশ্রদ্ধ, মাদকদ্রব্যসেবী, আর্থিকভাবে অসচ্ছল লোকদের, অপরিমিত ঘুম কিংবা অশান্তির কারণেও কোমর ব্যথা হতে পারে।

পরীক্ষাসমূহ

রোগীর ইতিহাস ও শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে রোগ নির্ধারণ করা যায়। তবে ৫ শতাংশ ক্ষেত্রে এক বা একাধিক পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরই, ইলেকট্রো মায়োগ্রাফি এবং রক্তের কিছু পরীক্ষা ইত্যাদির দরকার পড়ে।

চিকিৎসা

এই রোগের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ নিয়মকানুন মেনে চললে ভাল হয়ে যায়। কিছু ক্ষেত্রে ব্যথানাশক ওষুধ দিয়ে পূর্ণ বিশ্রামে রাখলে কোমর ব্যথা চলে যায় এবং পরে ব্যায়াম বা ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। সেজন্য রোগীকে বাড়িতে

আপনার স্বাস্থ্য

ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল
E-mail: parijat2006@yahoo.com

স্তনে পর্যাপ্ত দুগ্ধনালির উপস্থিতি আছে কি না এবং স্তনে শিশুর জন্য পর্যাপ্ত দুধ উৎপন্ন হচ্ছে কি না তা দেখা।

করার জন্য বিশেষ ব্যায়াম বা ফিজিওথেরাপি শিখিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ব্যথানাশক ওষুধ মুখে, মাংসপেশিতে, শ্বাসপথে প্রয়োগ করা যায়। দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার ক্ষেত্রে ব্যথানাশক ওষুধ এবং স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ অস্থিসন্ধিতে প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া যায়। এ ছাড়া, মানসিক চাপ কমানোর ওষুধও বিশেষ উপকারী।

রোগীদের জন্য উপদেশ

এ উপদেশগুলো মেনে চললে রোগী বেশ উপকার পায়–

- ব্যথা নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে।
- শক্ত বিছানায় ঘুমাতে হবে।
- বিছানা থেকে ওঠার সময় একদিকে কাত হয়ে উঠতে হবে।
- কোনও কিছু নিচু থেকে তুলতে হলে হাঁটু ভাঁজ করে বসে তারপর তুলতে হবে।
- শরীরের ওজন কমাতে হবে।
- মেরুদণ্ড সোজা রেখে হাঁটতে হবে।
- নিচু আসনে বসা যাবে না।
- কোমরে আঘাত লাগতে পারে এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ভারী বস্তু বা কোনও কিছু বহন করা যাবে না।

সব নিয়মকানুন মেনে ওষুধ সেবন ও নিয়মিত ব্যায়াম করে কোমর ব্যথা থেকে নিস্তার না পেলে ক্ষেত্রবিশেষে শল্যচিকিৎসার আশ্রয় নিতে হয়।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিকস ও ট্রমাটোলজি বিভাগ, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। **চেম্বার:** পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার লি., ২ ইংলিশ রোড, ঢাকা। **মোবাইল:** ০১৬৮৬-৭২২৫৭৭।

চিঠিপত্রের জবাব

সমস্যা: আমার বয়স ২৯ বছর। অবিবাহিতা। কিশোরী কাল থেকে আমার একটা সমস্যা, একটা স্তন ছোট আর একটা বড়। ডান পাশের স্তন বাম পাশের স্তনের চেয়ে বড় এবং তা ঝুলে গেছে। ব্রা ছাড়া এমনি কামিজ পরলে অত্যন্ত খারাপ লাগে। অস্বস্তিবোধ করি। আমার বিয়ে ঠিক হচ্ছে। কিন্তু ভীষণ চিন্তায় আছি। বিয়ের পর যদি কোনও সমস্যা হয়? তা ছাড়া, স্তন ছোট-বড় হওয়ার কারণে পরবর্তীতে অন্য কোনও সমস্যা যদি হয়—এজন্য মানসিকভাবে কষ্টে আছি। স্তন স্বাভাবিক করতে এবং আমার এ সমস্যার কী সমাধান আছে তা জানালে খুব উপকৃত হব।

লিজা পারভীন
দিনাজপুর।

সমাধান: বেশির ভাগ মহিলাই তাদের স্তনের আকৃতি নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকেন। যাঁদের স্তন ছোট তাঁরা স্তন বড় করতে চান, আবার যাঁদের স্তন বড়, তাঁরা আরও বড় করতে চান। অনেক মহিলা দেখেন যে তাঁদের একটি স্তন আরেকটির চেয়ে বড়—এতে তাঁরা আরও চিন্তিত হন।

প্রথমেই বলে রাখি, ছোট স্তন নিয়ে শঙ্কিত হবার কিছু নেই। স্তনের ক্ষেত্রে এটি খুব স্বাভাবিক। স্তন স্বাভাবিক কি না সেটি বোঝার সাধারণ উপায় হলো: স্তনে পর্যাপ্ত দুগ্ধনালির উপস্থিতি আছে কি না এবং স্তনে শিশুর জন্য পর্যাপ্ত দুধ উৎপন্ন হচ্ছে কি না তা দেখা।

যে স্তনে চর্বি যত বেশি, সেই স্তন তত বড়। সুতরাং আপনি স্তনে চর্বি জমানোর ইচ্ছাটা বাদ দিন। বিয়ের পর, এবং বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় স্তন যথেষ্ট বড় হয়। আপনি সেটা পর্যবেক্ষণ করুন। শিশু জন্মদানের পর আপনার স্তনে কেমন দুধ তৈরি হয়, সেটা দেখুন—সুতরাং এখনি এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। মনে রাখবেন, ছোট স্তন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

স্তনের আকৃতি একেক মহিলার একেক রকম হয়। এজন্য একেক মহিলা একেক ধরনের ব্রা পরেন। কারও কাপ সাইজ, কারও এ অথবা এএ। কিছু মহিলা জি অথবা এইচ পরে থাকেন। তবে কাপ সাইজের স্তন অবশ্যই স্বাভাবিক ও সুন্দর।

ছোট স্তনের অধিকারী অনেক মহিলা চিন্তা

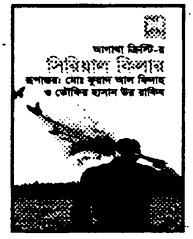

প্রকাশিত হয়েছে
অনুবাদ
আগাথা ক্রিস্টি-র
সিরিয়াল কিলার
রূপান্তর
মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
তৌফির হাসান উর রাকিব

পুলিসের নাকের ডগায় একের পর এক খুন করে চলেছে এক দুর্ধর্ষ খুনি! রহস্যময় এই ঘাতক, শিকার বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে মেনে চলছে অদ্ভুত এক সিরিয়াল–ইংরেজি বর্ণমালা! খুনের স্থান-কাল অগ্রিম জানিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানো হলো দুঁদে গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারোকে, 'পারলে ঠেকাও আমাকে...' স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে সাথে নিয়ে কোমর বেঁধে লড়াইয়ে নামল পোয়ারো; কিন্তু মহা ধুরন্ধর আর বেপরোয়া খুনিটার সঙ্গে এঁটে ওঠা যে বড্ড কঠিন! ধীর লয়ে 'এ' থেকে 'জেড'-এর দিকে এগিয়ে চলেছে লোকটা। কে সে? কী চায়? কিছুই জানা নেই! তবে এটা ঠিকই জানা আছে যে, খুব তাড়াতাড়ি লোকটাকে থামাতে না পারলে, প্রলয় নেমে আসবে গোটা ইংল্যাণ্ডের ওপর! প্রিয় পাঠক, চলুন এই মহাবিপদে পোয়ারোর পাশে থাকি। সবাই মিলে একবার চেষ্টা করে দেখি, ভয়ঙ্কর খুনিটাকে পাকড়াও করা যায় কিনা!

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

করেন বড় স্তন অনেক আকর্ষণীয় এবং পুরুষের নজর কাড়ে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, অনেক বড় স্তনের মহিলা তাদের স্তন ছোট করতে চান। কারণ বড় স্তনের জন্য তাদের পিঠ ব্যথার সমস্যা দেখা দেয়। আরেকটি কথা মনে রাখবেন, পুরুষরা মহিলাদের বড় স্তন নিয়ে ততটা ভাবেন না, মহিলারা যতটা ভাবেন। কিছু পুরুষ অবশ্য মহিলাদের বড় স্তন পছন্দ করেন, কিন্তু সেই হার অতি নগণ্য।

সমস্যা: আমার বয়স ২২ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, শারীরিক গঠন মোটা, ৫ বছর আগে আমি যাকে ভালবাসতাম, তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক হয়। তিন-চার মাসের মত এই সম্পর্ক ছিল। আমি ২-৩ মাসের বাচ্চাও নষ্ট করেছি। সে আমাকে এখন আর ভালবাসে না। আমি নতুন করে আবার সব কিছু শুরু করতে চাই। কিন্তু এ অবস্থায় কাউকে যদি বিয়ে করি, তা হলে সে কি সব কিছু বুঝতে পারবে? আমি শুনেছি একটা ওষুধ আছে, যা খেলে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যায়। যদি সেরকম কোনও ওষুধ থাকে, তা হলে আমাকে দয়া করে জানাবেন। তার নাম ও কত দাম জানালে খুব উপকৃত হতাম। ওষুধ ছাড়া আর কোনও পদ্ধতি আছে কি?

নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

সমাধান: বিয়ের আগে কারও সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে, আমাদের দেশে বেশিরভাগ জুটির মধ্যে সাধারণত পরে বিয়ে হয় না। এক্ষেত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণত ছেলেরা পরে আর বিয়ে করতে রাজি হয় না, যেটা আপনার বেলায় ঘটেছে। তবে যেহেতু জীবনে একবার ভুল করেই ফেলেছেন, এখন আপনাকে নতুন করে জীবন সাজাতে হবে। এক্ষেত্রে ভেঙে পড়লে চলবে না, মনোবল দৃঢ় রাখবেন। আপনি কী ওষুধের কথা বললেন তা বোধগম্য নয়। আপনার কী ঠিক করে দেবে তা-ও বোধগম্য নয়। যা হোক, আপনি বিয়ে করে সংসার শুরু করুন। মুছে ফেলুন অতীত। ■

মুখোশ

ইমরান হোসাইন ইমু

ভালবাসা কিছু-কিছু মানুষকে হিংস্র করে তোলে।

তিন দিন হলো নীলাকে দেখতে যাইনি। ব্যাপারটা আমার কাছে একই সাথে অবাক করার মত এবং দুঃখজনক। তিন দিন আগে তার সাথে ভয়ানক একটা ঘটনা ঘটে গেছে। এই ঘটনা সব মেয়ের জীবনে ঘটে না। যাদের জীবনে ঘটে, তাদের চক্ষুলজ্জার ভয়ে আড়ালে থাকতে হয়। নীলা আড়ালেই আছে। তিন দিন ধরে বিছানায় শোয়া। ভার্সিটিতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শুনেছি, কারও সাথে ঠিকমত কথা পর্যন্ত বলছে না। আমি গেলে তার ভাল লাগবে বলে মনে হয় না। বরং তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। সে আমাকে দেখলেই রেগে যায়। মনীষীরা বলেন, 'মেয়েরা যাকে ভালবাসে, তার উপরই রাগ করে।' মনীষীদের এ বাণীটা আমার বেলায় খাটে না। নীলা আমার উপর শুধু রাগই করে, ভালবাসে না। তার দৃষ্টিতে আমি 'বিরক্তিকর'।

এ অবস্থায় নীলার রাগ বাড়ানো উচিত হবে কি না তা নিয়ে ভাবতে-ভাবতেই তিন দিন কেটে গেছে! এত ভাবনার ফলস্বরূপ কোনও উত্তর খুঁজে পাইনি। তবে নীলাকে নিয়ে ভাবতে আমার যেন কোনও ক্লান্তিই নেই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর–এই একটা মেয়ের কথা চিন্তা করেই জীবন পার করে দিতে পারব। তবে তার আমাকে নিয়ে ভাবার সময় নেই। তার ভাববার মত অনেক কিছুই আছে। ভার্সিটি, বন্ধু-বান্ধব, ইংরেজি সাহিত্য, হেনরিক ইবসেন, জন কিটস,

পরিবারের ছোট ভাইটার পড়াশোনা–এত চিন্তার মাঝে আমার কোনও ঠাঁই নেই। তার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে সে জানালা বন্ধ করে দেয়। ব্যাপারটা আমাকে মোটেও রাগায় না। বরং নীলার রাগী মুখ দেখে আমার হাসি পেয়ে যায়। দিনে কমপক্ষে একবারের জন্য হলেও নীলার দর্শন আমার জন্য বাধ্যতামূলক। তা না হলে আমার অস্বস্তির ভাব হয়। আজ টানা তিন দিন হতে চলল, অথচ একটা মুহূর্তের জন্যও নীলার দর্শন পেলাম না। যতটা ভেবেছিলাম, ততটা অস্বস্তিও লাগেনি। ব্যাপারটা অবাক করার মতই।

দুই

বেশ কিছুদিন আগের কথা। নীলা ভার্সিটিতে যাওয়ার সময় আমি তার সামনে দাঁড়াই। একগুচ্ছ কচুরিপানার ফুল তার হাতে দিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকি। নীলা ভূত দেখার মত চমকে ওঠে। আমি হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে আছি। সে দ্রুতপদে হেঁটে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যায়। সেরাতে নিয়মমাফিক আমি তার জানালার সামনে দাঁড়াই। জানালার একেবারে কাছে নয়। রাস্তার একপাশে জানালা, অন্য পাশে আমি। নীলা জানালার সামনে আসে। এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে কাছে ডাকে। কোনওদিনও সে একাজটা করেনি। আমি হতভম্ব মুখে তার কাছে এসে দাঁড়াই। আমার দেয়া একগুচ্ছ কচুরিপানার ফুল সে আমার মুখে ছুঁড়ে মেরে বলে, 'আর কোনওদিন বিরক্ত করবে না। জানালার পাশেও দাঁড়াবে না।'

নীলা জানালা বন্ধ করে দেয়। আমি অসহায় মুখে বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে থাকি। নিচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কচুরিপানার ফুলগুলো। তারাও যেন আমার দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে। ব্যর্থ ফুল যেভাবে ব্যর্থ প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তবে নিয়ম করে নীলার জানালার পাশে দাঁড়ানো আমার বন্ধ হয়নি। জানি, নীলাকে কোনওদিনও কাছে পাব না। পাব না জেনেও হয়তো অপেক্ষা করে যাওয়ার নামই, 'ভালবাসা'।

এ ঘটনার পর নীলাকে কাছে পাবার ইচ্ছেটা আরও প্রবল হলো। তাকে নিয়ে দেখা এতদিনের স্বপ্নগুলোও যেন ঘটনার আকস্মিকতায় আরও গাঢ় হচ্ছে। ভালবাসা কিছু-কিছু মানুষকে হিংস্র করে তোলে। এই কিছু-কিছু মানুষের মধ্যে কি আমি আছি?

তিন

নীলার বাসায় তাকে দেখতে এসেছি। নীলা বিছানায় শোয়া। চোখে-মুখে উদ্‌ভ্রান্ত অভিব্যক্তি। তবুও এই বিমর্ষতার আড়ালে রয়েছে প্রাণোচ্ছল, হাসিমাখা এক পবিত্র মুখ। আমার দিকে ফিরে নীলা একটা ব্যর্থ হাসি দিল। সেই হাসিতে যে কতটা কষ্ট মিশে আছে, তা বোধহয় কোনও পরিমাপকেই পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আমার পাশে নীলার বাবা-মা বসে আছেন। তাঁরাও অসহায় মুখে নীলার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু সেই দৃষ্টিতে কোনও প্রাণ নেই।

আমি নীলার হাত ধরলাম। সে ভীষণ চমকে উঠল। আমি তার চমকে ওঠা টের পেলাম হাতের স্পর্শে। আমি নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সে হতবিহ্বলের মত বিড়বিড় করছে।

আমি হাসিমুখে নীলার বাবা-মাকে বললাম, 'আমি নীলাকে বিয়ে করব।'

হঠাৎ নিস্তব্ধতা। কারও মুখে কোনও কথা নেই। এই মুহূর্তটা অসাধারণ! পৃথিবী যেন নিথর হয়ে আছে। কান খাড়া করে ঘড়ির টিকটিক শোনার চেষ্টা করছি। কিন্তু কোনও শব্দ পাচ্ছি না। খুব সম্ভব, এই রুমে ঘড়ি নেই। নীলার বাবা হতভম্বের মত বললেন, 'তুমি কী বললে?'

আমি স্বাভাবিক গলায় বললাম, 'আমি নীলাকে বিয়ে করব।'

নীলা বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকাল। প্রথমবার আমার কথাটা খুব সম্ভব তার কানে পৌঁছয়নি। তবে এখন পৌঁছেছে।

প্রকাশিত হয়েছে
হরর কাহিনি
তিনটি বই একত্রে

পিশাচ-চক্র/অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

'...আমার বিস্ফারিত চোখের সামনে দেখতে দেখতে ওদের শরীরের সমস্ত মাংস খসে পড়ল...আমার শরীর অবশ হয়ে আসছে...' তারপর? তারপর কী হলো জানতে হলে পড়ুন রক্ত হিম করা এ বইয়ের টাইটেল গল্পটি। হরর ও পিশাচ কাহিনির এ এক অপূর্ব সম্ভার।

ঈশ্বরী/তৌফির হাসান উর রাকিব

ঈশ্বর আর শয়তানের রাজত্বে কে এই ঈশ্বরী? কেন এতকাল গোটা মানবজাতির কাছে গোপন রাখা হয়েছে তাঁর কথা? সত্যিই কি তিনি দিতে পারেন অমরত্ব? জানতে হলে পড়তে হবে–ঈশ্বরী! দুটি উপন্যাসিকা সহ সর্বমোট দুই ডজন ছোটবড় লেখা নিয়ে আমাদের এবারের নৈবেদ্য। বইটির প্রতিটি পাতায় রোমাঞ্চ, চমক, ভয়, শিহরণ, আর অসহ্য সাসপেন্স।

অপদেবী/তৌফির হাসান উর রাকিব

যদি জানতে পারেন, আপনার প্রতিবেশী ভদ্রলোক রাতারাতি একখানা কালজয়ী উপন্যাস রচনা করে ফেলেছেন এবং এসবের পিছনে রয়েছে এক অপদেবীর হাত, কেমন লাগবে আপনার? জানতে হলে, পড়তে হবে, সময়ের পাঠকপ্রিয় লেখক, তৌফির হাসান উর রাকিব-এর 'অপদেবী'! তিনটি উপন্যাসিকার অনন্য এক সংকলন।

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

নীলার বাবা কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই জান, নীলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'জি। জানি।'

'তবুও তুমি তাকে বিয়ে করবে?'

'জি, করব।'

'কেন?'

'আমি নীলাকে ভালবাসি।'

নীলার চোখে জল চলে আসছে। ওর মা উঠে অন্য রুমে চলে গেছেন। তিনি একাকী কান্না করার মানুষ। নীলার হতবাক পিতা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে জল আসছে না। পুরুষ মানুষের কান্না কম।

আমি নীলার দিকে তাকিয়ে আছি। তার হাত আমার হাতে। আমার চোখে-মুখে বিজয়ের ছাপ। নীলার গাল জলে ভেসে যাচ্ছে। সেই জল মুছে দিতে গিয়েই আমার নিজের ভেতর খানিকটা অপরাধবোধ কাজ করল। এত ফুটফুটে একটা মেয়ের কত ক্ষতিই না আমি করেছি! তার এই অবস্থার কারণ তো আমিই! নীলাকে পাব না জেনে কিছু লোক ঠিক করি। তাদের কাজ, নীলাকে ধর্ষণ করা। কোনও মেয়ে ধর্ষিতা হয়ে গেলে তার জন্য উপযুক্ত তো দূরের কথা, সাধারণ পাত্রই খুঁজে পাওয়া যায় না। ঠিক তখনই মহামানব সেজে আবির্ভূত হব আমি। বিয়ে করে নেব এই ধর্ষিতাকে। ভালবাসা কিছু-কিছু মানুষকে হিংস্র করে দেয়। এই কিছু-কিছু মানুষের মধ্যে আমিও আছি। আমি উঠে দাঁড়ালাম। পেছন থেকে চোখে জল আর মুখে ভালবাসার হাসি নিয়ে নীলা আমাকে বলল, 'তোমার দেয়া কচুরিপানার সবগুলো ফুল কিন্তু আমি ফেলে দিইনি। আমার কেন জানি ফুলগুলোর উপর ভীষণ মায়া হচ্ছিল। মানুষের উপর রাগ করা যায়, কিন্তু ফুলের উপর তো আর রাগ করা যায় না। তাই দুটো ফুল আমি খুব যত্ন করে আমার টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখেছি।'

আমি নিজের গালে হাত দিয়ে কেঁপে উঠলাম। আশ্চর্য তো! আমার চোখে পানি আসছে কেন? ■

BoiLovers.com
Present

Book is free for all

Contact

www.boilovers.com

www.facebook.com/SuperiorSuny

01843-456129

সুস্বাস্থ্যের জন্য হাঁটুন

ডা. ওয়ানাইজা

রোগ প্রতিরোধ বিশেষজ্ঞরা বলেন, যদি কেউ প্রতিদিন আধ ঘণ্টা হাঁটেন তা হলে ৩০-৪০ ভাগ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করার কথা বা উপদেশ আমরা সব সময় শুনে থাকি। কিন্তু কী ব্যায়াম করব? এর জন্য কি জিমনেশিয়ামে যাব, নাকি কোন ক্লাবে? আর ব্যায়াম করবই বা কখন? এরকম নানা প্রশ্ন আমাদের মনে আসে। এর একটাই ভাল উত্তর হয়; তা হচ্ছে: এত কিছু না ভেবে নিয়মিত হাঁটুন। সপ্তাহে পাঁচ-ছয় দিন আধ ঘণ্টা হাঁটার মত ব্যায়াম আর নেই। রোগ প্রতিরোধে হাঁটা অসাধারণ ভূমিকা রাখে। আগে থেকে ব্যায়ামের অভ্যাস না থাকলে হঠাৎ করে তা শুরু করাও কষ্টসাধ্য। কিন্তু ইচ্ছে করলেই আপনি হাঁটতে পারেন। রোগ প্রতিরোধ বিশেষজ্ঞরা বলেন, যদি কেউ প্রতিদিন আধ ঘণ্টা হাঁটেন তা হলে ৩০-৪০ ভাগ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। আপনি যদি খুব কর্মব্যস্ত মানুষ হন এবং আধ ঘণ্টা সময় হাঁটার জন্য দিনে বের করতে না পারেন তা হলে কী করবেন? চিন্তার কোন কারণ নেই। দিনে তিন-চারবার ১০ মিনিট করে হাঁটুন। দিনে আধ ঘণ্টা বা ১০ মিনিট করে–যে কোন একভাবে হাঁটলেই হবে। আসুন, এবার জেনে নেয়া যাক হাঁটলে আপনি কোন্-কোন্ রোগ কীভাবে প্রতিরোধ করতে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন।

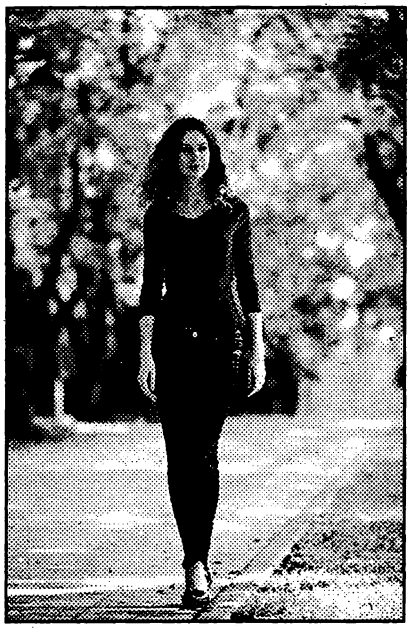

হৃদ্‌রোগ

নিয়মিত হাঁটা হার্টের জন্য খুবই ভাল। হাঁটার ফলে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় ও হার্টের মাংসপেশি ভাল থাকে। তা ছাড়া নিয়মিত হাঁটার ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। হাঁটার ফলে রক্তে এইচডিএল কোলেস্টেরল, যাকে আমরা বলি ভাল কোলেস্টেরল, তার পরিমাণ বেড়ে যায়। এভাবে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি শতকরা ৫০ ভাগ কমে যায়।

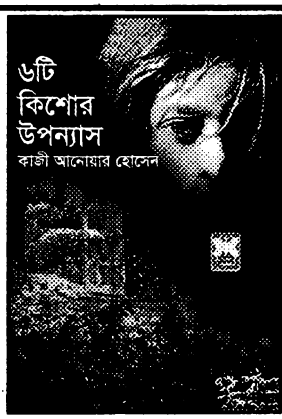

শীঘ্রি পুনঃ প্রকাশিত হচ্ছে
বিদেশি কাহিনির ছায়া নিয়ে
৬টি কিশোর উপন্যাস
কাজী আনোয়ার হোসেন

ইসকুল বাড়ি
ছোটকুমার
ঘরের শত্রু
ফুলবাগান
ক্লাস এইট ও
ইতিকথা

এ-ছয়টি কিশোর উপন্যাসকে এই প্রথম একসঙ্গে এক মলাটে প্রকাশ করা হচ্ছে। আশা করি যাঁরাই কিশোরকাহিনি পছন্দ করেন, বইটি তাঁদের ভাল লাগবে।

দাম ■ একশ' ছিয়াত্তর টাকা

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

স্ট্রোক

নানা রকম গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত হাঁটলে স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। হার্ভার্ড স্কুল অভ পাবলিক হেলথের ১৪ বছরব্যাপী এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যাঁরা সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা বা তারও বেশি হাঁটেন তাঁদের শতকরা ৪০ ভাগ স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে যায়।

ওজন নিয়ন্ত্রণ

ওজন নিয়ন্ত্রণে হাঁটার ভূমিকা অনেক। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। আধ ঘণ্টা হাঁটলে ১০০০ কিলোজুল ক্যালরি ক্ষয় হয়। অনিয়ন্ত্রিত ওজন নানা অসুখের কারণ। নিয়মিত হাঁটার ফলে দেহে অতিরিক্ত চর্বি জমে না। ওজন কমাতে হলে অবশ্য আধ ঘণ্টা নয়, প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা হাঁটতে হবে।

ডায়াবেটিস

গবেষণার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, নিয়মিত হাঁটলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। আর ডায়াবেটিক রোগীরা অবশ্যই নিয়মিত হাঁটবেন। কেননা তাতে রক্তের চিনি নিয়ন্ত্রণে থাকে। আর ডায়াবেটিসের জন্য ওজন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন, সেটাও হাঁটার মাধ্যমে সম্ভব। ■

লেখিকা: সহযোগী অধ্যাপিকা, ফার্মাকোলজি অ্যাণ্ড থেরাপিউটিক্স, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ। **চেম্বার:** স্ট্যাণ্ডার্ড মেডিকেল সার্ভিস লিমিটেড, ২০৯/২ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল: ০১৬৮২-২০১৪২৭।

নাগদহ

আমিনুর রহমান মোঃ তারেক

কালচে সবুজ আঁশ মাখানো শরীরে শফিকের হাতে মজবুত প্যাঁচ কষছে সেটা।

মাশরুর এত ভাল নৌকা বাইতে পারে তা সুমিত কিংবা শফিক কেউই জানত না। সিডনি বোট ক্লাবে ও যে ট্রেইনার তা তো মাশরুর ওদের বলেনি। নৌকা তরতর করে পদ্মবন পাড়ি দিচ্ছিল রাজহাঁসের মত। একটা মাতাল করা গন্ধে চারদিক আচ্ছন্ন। তিন বন্ধুর তিন দিগন্তের পেশা। শফিক জাহাঙ্গীরনগরের বোটানির সহযোগী অধ্যাপক। সুমিত নির্ভেজাল লেখক। অন্য কিছু করে না। নিজের অনেস্ট কনফেশন–'পারি না'।

সেই নটর ডেম থেকেই শুনে আসছে তিনজন এই বিলের কথা। নেত্রকোনার এক কোণে পাহাড় ঘেঁষা এই বিল। অদ্ভুত বিচিত্র এক টকটকে লাল পদ্ম ফোটে এখানে। বাংলাদেশে জন্মানো অন্য কোনও পদ্মের সঙ্গে এর মিল নেই। বলতে গেলে শফিকের অতি আগ্রহের কারণেই তিন বন্ধুর এবারের এই ভ্রমণ।

সূর্য পাটে বসেছে। পশ্চিম আকাশে লালের আগুন। আগুনের লাল আভা, লাল পদ্ম,

পানির ওপর মেঘের ছায়া, হুমড়ি খাওয়া পাহাড়ের ছায়া–সব মিলে এক অবাস্তব বা পরাবাস্তব আবহ চারদিকে।

নৌকা অনেকটাই ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। এখন ফেরার পথ। বিলের পাড় অল্পই দূরে। স্বীকার করতেই হয় এ বিলের কী যেন এক সম্মোহনী শক্তি আছে। শফিকের তো কথাই নেই, বিল আর আকাশের মাঝখানে হাঁ করে চেয়ে আছে সুমিত। মাশরুর পেশি কিলবিল করা হাতের আঙুলে আধজ্বলা সিগারেট রেখে গেয়ে চলেছে, 'মোর পরান বঁধু নাই, পদ্মে তাই মধু নাই, নাই রে–'

শফিকের মুখ পশ্চিম আকাশের দিকেই। হঠাৎই একটা 'আহ্' শব্দে সুমিত আর মাশরুরের মনোযোগ শফিকের দিকে পড়তেই অবাক বিস্ময়ে দেখল, যে পদ্মটা শফিক একটু আগেই তুলেছিল তার ডাঁটা শফিকের হাতে আর নিরীহ ডাঁটাটি নেই। কালচে সবুজ আঁশ মাখানো শরীরে শফিকের হাতে মজবুত প্যাঁচ কষছে সেটা। স্পষ্ট ব্যথায় আর চাপে ওর হাতের রগগুলো ফুলে উঠেছে। এবার শফিকের আরেকটা তীব্র চিৎকারে দু'জনেই হতভম্ব হয়ে দেখল শফিকের কপালের পাশ থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে...শফিক ঢলে পড়ে যাচ্ছে। হাতে ধরা পদ্মটা ততক্ষণে বিশাল এক মেছো আলাদ হয়ে সড়সড় করে নেমে যাচ্ছে পানিতে!

মাশরুরের মনে হলো নৌকার বুড়ো মালিক বলেছিল কানে-কানে, 'বাবু, লৌকো বাইবেন, ভাল। শ্যাষ বিহালে সাবধান হবেন বটেক, বিলের নাম কিন্তু নাগদা। পদ্ম বড্ড সাপ হয় গো, বাবু।'

বিরক্তির স্বগতোক্তি ছিল মাশরুরের– 'যত্তসব কুসংস্কার!' ■

৭/১২/১৬ প্রকাশিত হচ্ছে

অনুবাদ

আগাথা ক্রিস্টি-র

বেনামী চিঠি

রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিং-এর পর আমার জন্য ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছিল: সম্পূর্ণ বিশ্রাম। তাই নিরিবিলি মফস্বল শহর লাইম্‌স্টকে হাজির হয়ে ভেবেছিলাম, ঠিক জায়গাতেই এসেছি। কিন্তু কল্পনাও করিনি, জড়িয়ে যেতে হবে একের পর এক রহস্যময় বেনামী চিঠির সঙ্গে। ভাবিনি, শুনতে হবে কারও আত্মহত্যার খবর, জানতে হবে খুন হয়েছে কেউ। ঘুণাক্ষরেও ধারণা ছিল না, ভালোবেসে ফেলব কাউকে নিজেরই অগোচরে। এবং আটপৌরে চেহারার চিরকুমারী মিস মার্পলকে দেখেও বুঝিনি, মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণের কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁর। খুনিও হয়তো টের পায়নি, মিস মার্পলকে আসলে খবর দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে লাইম্‌স্টকে।...রহস্যরানি'র অমর চরিত্র মিস মার্পল-এর একটি অনবদ্য কাহিনি-সংকলন এটি, একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসসহ আছে ছ'টি বড় গল্প–আপনার জন্য মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণের সুবর্ণ সুযোগ।

দাম ■ একশ' নয় টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

যেখানে বাঘের ভয়

সাফাউদ্দিন মজুমদার

দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে দেখল সে, স্ত্রীর ঘাড় কামড়ে ধরে জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে বিশাল বড় এক বাঘ!

এক

আব্বা চাকরি করতেন টেক্সটাইল মিলে। দুই, তিন অথবা চার বছর পর পরই বদলি হতেন। ওঁর বদলির কারণে ছোটবেলা থেকেই অনেক জেলায় গিয়েছি। হঠাৎ করেই আব্বার কাছে আসত বি.টি.এম.সি. থেকে বদলির নির্দেশ। আমরা ভাই-বোনেরা পড়তাম মহাবিপাকে, কারণ কেউ স্কুলে পড়ে, কেউ কলেজে পড়ে। এমন সময় আসত বদলির নির্দেশ, যখন দেখা যেত কারও পাঁচ মাস, কারও দুই মাস বাকি ফাইনাল পরীক্ষার।

ঠিক তেমনি বিপাকে পড়ি আমি। তখন সাত মাস বাকি বি.এস.সি. পরীক্ষার। পরিবারের সবাই এক মাসের ভেতর ছাড়বেন চট্টগ্রাম।

পরীক্ষা দিয়ে তবেই যেতে হবে আমাকে, অথচ ব্যাচেলরদের জন্যে ভাড়াবাড়ি পাওয়া খুব দুরূহ। পড়লাম বিপদে। বহু চেষ্টার পর একটি ছোট দোতলায় পর পর তিনটি রুমের মাঝে পেলাম একটি ভাড়া রুম।

আতুরার ডিপো নামের বাজার পেরিয়ে অনেকখানি ভেতরে ঠাঁই হলো মাথা গোঁজার।

বাজার থেকে বাড়ি ফিরতে বেশ খানিক পথ, রাস্তার দু'ধারে প্রচুর বাঁশ ঝাড়। দিনেও রাস্তাটি অন্ধকারে ঢাকা। প্র্যাকটিকাল ক্লাস করে ফিরতে প্রায়ই রাত হত। সব সময় বাজারে এসে অপেক্ষা করতাম, কেউ না কেউ এ পথ দিয়ে যাবে। পেয়েও যেতাম, লোকজন সঙ্গে থাকলে ওই জায়গাটা পেরোতে ভয় পেতাম না।

মনে সাহস থাকলেও রাতে ওই পথে একা চলা ছিল অসম্ভব। কেমন ভয়ে ছমছম করত শরীর।

মিলের ভেতর আমার এক বন্ধুর বাসায় টেলিভিশনে ভাল অনুষ্ঠান হলে মাঝে-মাঝে দেখতাম। কুরবানী ঈদের সময় খুব ভাল অনুষ্ঠান হত টেলিভিশনে। বন্ধুটির বাসায় রাত বারোটা পর্যন্ত টেলিভিশন দেখে ফিরছি, রাত বেশি হওয়ায় বাজার পর্যন্ত এগিয়ে দিল বন্ধুটি।

বাজারে ঢুকে চারদিকে চেয়ে ভয়ে শিউরে উঠলাম। একটি দোকানও খোলা নেই, একজন মানুষও দেখা যাচ্ছে না। কেমন নিস্তব্ধ পরিবেশ। গত তিন মাস কখনও দেখিনি এমন মৃত্যুপুরীর মত অবস্থা।

দশ মিনিট দাঁড়িয়েও কারও দেখা পেলাম না।

যা আছে কপালে, খুব জোরে হাঁটা আরম্ভ করলাম।

একা অত রাতে কেমন ভয় লাগছে, বোঝাতে পারব না। আমি পাঁচ ফিট নয় ইঞ্চি লম্বা, বাঁশ ঝাড়ের সামনে এসে আরও বেড়ে গেল হাঁটার গতি। পারি তো দৌড় দিই। কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে সাড়ে তিন ফুট লম্বা সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি মানুষ, সমস্ত দেহ কাদামাটি মাখা, হাতে একটি লাঠি, আমার সামনে এসে থামল!

আতঙ্কে কয়েক গজ পেছনে সরে এলাম, ভয়ে খাড়া হয়ে গেছে ঘাড়ের খাটো চুল। বুকে পেটাচ্ছে হাতুড়ি। এদিকে বাঁশ ঝাড় থেকে পাখি না অন্য কিছু টুক্‌কু শব্দে জোরে ডেকে উঠল। শব্দগুলো অত্যন্ত ভীতিকর।

সেখান থেকে এমন জোরে দৌড় দিলাম, সোজা থামলাম আমার রুমে ঢুকে। দেরি না করে দরজা লাগিয়ে শুয়ে পড়লাম।

এখনও ভাবি, সে রাতে এক ঝলক কী দেখেছি?

মানুষ না অন্য কিছু?

দুই

পৌষের শেষ, যাকে বলে প্রচণ্ড শীত। আমার আব্বা তখন খুলনা টেক্সটাইল মিলের ব্যবস্থাপক। তাঁকে প্রতিমাসে অন্তত দু'বার যেতে হত বি.টি.এম.সি.-তে।

আমার চাচা, ফুফু, মামা সবাই ঢাকায় থাকেন, ওঁদের কখনও সৌভাগ্য হয়নি সুন্দরবন দেখার, তাই আমার আব্বা ও আত্মীয়-স্বজনরা ঠিক করেন, সুন্দরবন হিরন পয়েন্টে যাবেন। তারিখও ঠিক করা হলো। সমস্ত বিষয় আমাদের খুলে বললেন আব্বা।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব মিলে প্রায় নব্বুইজন হবে, যেতে হবে মংলা হয়ে হিরন পয়েন্টে। এক রাত থাকতে হবে ওখানে।

কাজেই খাবারের ব্যবস্থা, দুই দিনের জন্য লঞ্চ ভাড়া, সমস্ত কিছুর দায়িত্ব পড়ল আমার, পরের ভাইটি, এবং বড় চাচার বড় ছেলের ওপর।

মুরুব্বীরা আমাদের হাতে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলেন।

বিরাট বড় একটি লঞ্চও ভাড়া করলাম।

বিশ কেজি রুই মাছ, এক শ'টি মুরগি, চারটি খাসি কেনা হলো। সকালের নাস্তা ও কোমল পানীয় রাখা হলো প্রচুর পরিমাণ। নেয়া হলো তিনজন রান্নার লোক। তখন মামা ছিলেন বাগেরহাট জেলার এ.ডি.সি.। ওঁর মাধ্যমে রাইফেল সহ পাঁচজন পুলিস সর্বক্ষণ থাকবে লঞ্চে।

যে সময়ের কথা লিখছি, তা ১৯৮৬ সাল।

লঞ্চে উঠে চাচাত, মামাত, ফুফাত ভাই-বোন, চাচা, ফুফু, মামাসহ আত্মীয়-স্বজন মিলে কী যে আনন্দ করতে লাগলাম, বলে বোঝাতে পারব না। সাড়ে নয়টায় হিরন পয়েন্টের উদ্দেশে যাত্রা করল লঞ্চ। সকালের নাস্তার পর্ব শেষ করে কেউ তাস খেলছে, কেউ দাবা খেলছে, কেউ মহা আনন্দে গল্প করছে। মনে হচ্ছে আত্মীয়-স্বজনের মিলন মেলা! শীতকাল বলে অত্যন্ত শান্ত নদী, ঢেউয়ের বালাই নেই। অথচ অন্য সময় প্রচণ্ড ঢেউয়ের কারণে এই নদীতে ঢুকতেই পারে না লঞ্চ।

বিশ মিনিট পর সুন্দরবন এলাকা শুরু হতেই দেখলাম এক অভূতপূর্ব দৃশ্য!

যত দূর দেখা যায়, নদীর ধারে কেউ যেন একই মাপের গাছের সারি ছবির মত সাজিয়ে দিয়েছে। লঞ্চটি চলেছে একদম নদীর কিনার ধরে। সবাই সুন্দরবনের দৃশ্য দেখছে মুগ্ধ হয়ে। লঞ্চের শব্দ শুনে হঠাৎ জঙ্গল থেকে কয়েকটি বানর এসে গাছের ডালে ঝুলে আমাদের দিকে চেয়ে এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফ দিতে লাগল। ভেংচি কাটছে ওরা। এভাবে জঙ্গলের বানর দেখার মজাই অন্যরকম।

সবাই ক্যামেরা দিয়ে যে যেভাবে পারছে

জঙ্গলের ছবি তুলছে। আনন্দ-ফুর্তি ছাড়া কারও মনে কিছু নেই। যতই সামনে চলেছে লঞ্চ, যেন প্রশস্ত হচ্ছে নদী।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা চলার পর এমন এক জায়গায় এলাম, যেখানে একসাথে মিলিত হয়েছে কয়েকটি নদী। আধ কিলোমিটার দূরে দেখা গেল সাগর। যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি, কোনও কূল-কিনারা নেই।

এখানে এসে উত্তাল কিছু ঢেউয়ের মুখে পড়ল লঞ্চ। চারদিকে ছোট নৌকা নিয়ে কত জেলে মাছ ধরছে, তার হিসাব নেই। কেউ জাল ফেলে, কেউ বড়শি দিয়ে। নদীতে মাছ ধরা অনেক দেখেছি, কিন্তু এত ছোট নৌকায় করে মাছ ধরা আগে কখনও দেখিনি।

মনে হলো মাছ ধরার বিশাল মিলন মেলা বসেছে।

লঞ্চের নিচে এবং কেবিনে বসে আছে সবাই। আমরা ক'জন লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছি বাইরের দৃশ্য। একসময় আমাদের একজন নিয়ে এল শক্তিশালী একটি টেলিস্কোপ। সেটা দিয়ে দেখা যায় তিন-চার কিলোমিটার দূরের জিনিসও।

হঠাৎ দেখতে-দেখতে সে বলে উঠল, তিন কিলোমিটার দূরে কী যেন খুব বেগ তুলে আসছে। আমরা ওর হাত থেকে টেলিস্কোপ নিয়ে একে একে দেখার চেষ্টা করলাম জিনিসটা কী।

কিছুক্ষণ পর সবাই নিশ্চিত হলাম, আমাদের লঞ্চের দিকে আসছে বিশাল এক জাহাজ। খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলাম সবাই।

দেখতে না দেখতে আমাদের লঞ্চ থেকে ষাট গজ দূর দিয়ে পূর্ণশক্তি নিয়ে বিকট শব্দ তুলে পেরিয়ে গেল কল্পনাতীত বিশাল জাহাজটি। ওটার তুলনায় আমাদের লঞ্চ যেন দিয়াশলাইয়ের খোসা।

জীবনে প্রথম দেখলাম এতবড় হতে পারে জাহাজ!

যে না দেখেছে, তাকে বোঝানো যাবে না ওটার গতি কত দ্রুত!

জাহাজ তো চলে গেল, কিন্তু যে ভয়ানক দৃশ্য দেখলাম, হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম আমরা। পাহাড়ের মত উঁচু সব ঢেউ আসছে আমাদের লঞ্চের দিকে!

শক্ত করে ধরলাম লঞ্চের রেলিং। ঢেউ কাছে এলে মনে হলো পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে লঞ্চ। আমরা তলিয়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই! হতভম্ব হয়ে ভাবছি, ডুবে যাচ্ছে লঞ্চ? মনে হচ্ছে চার-পাঁচ তলা থেকে নিচে পড়ছি! বিশাল্ ঢেউয়ের নিচে তলিয়ে যেতে শুরু করেও আবারও ওপরে উঠতে লাগল লঞ্চ! ভেসে উঠে এমন জোরে হোঁচট খাইয়ে দিল আমাদেরকে! ডেকে রাখা বড় হাঁড়ি, পানি ভর্তি বড় ড্রাম, থালাবাটি সমস্ত ছিটকে গেল নানান দিকে! শরীরে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলাম! এভাবে তিনবার পানির তৈরি খোঁড়লে পড়ল লঞ্চ; তারপর আবারও উঠে এসে ঝাঁকি খেল। মেয়ে ও মহিলারা আতঙ্কে আর্তচিৎকার করছেন। সবার চেহারা রক্তশূন্য। শুধু ভাবলাম, লঞ্চ যদি ঢেউয়ের আঘাতে কাত হয়ে তলিয়ে যায়, তা হলে কী হবে সবার?

একটু পর খানিক স্থির হলো লঞ্চ। ভেতরে গিয়ে দেখি ভয়ে কাঁদছে মেয়েরা, ভয়ে কয়েকজনের গায়ে উঠে গেছে জ্বর।

মনে হলো, সবার দুয়ারে এসে ফিরে গেল নিশ্চিত মৃত্যু।

খানিক সময়ের জন্য মাটি হয়ে গেছে সমস্ত আনন্দ।

যতক্ষণ না হিরন পয়েন্টে এসে পৌঁছুল

সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র

১ম গেট, ঢাকা নিউ মার্কেট।

রহস্যপত্রিকা সহ সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের

নতুন ও রিপ্রিন্ট বই পাওয়া যায়।

মোবাইল: ০১৮১৯-২০১৫৭১

লঞ্চ, আল্লাহর কাছে দোয়া চাইলাম, যাতে ওরকম জাহাজের কবলে আর না পড়ি!

বেলা তিনটায় হিরন পয়েন্টে পৌঁছে দেখলাম কী অভূতপূর্ব দৃশ্য!

শত-শত হরিণ খোলা জায়গায় ঘুরছে, ঘাস খাচ্ছে, এদিক-ওদিক ছুটছে। বুঝলাম, হরিণের পদচারণায় এই জায়গার নাম হয়েছে হরিণ থেকে হিরন পয়েন্ট!

আমরা কয়েকজন ছোট নৌকায় চড়ে দেখলাম প্রাকৃতিক দৃশ্য।

সন্ধ্যায় ফিরছি, স্থানীয় কয়েকজন আমাদের সঙ্গে বেশ আলাপ জমালেন। জানলাম, সুন্দরবনে তাঁদের বিচিত্র জীবন সম্পর্কে। তাঁরা বার-বার বললেন, 'রাতে কিন্তু ভুলেও ঘর থেকে বের হবেন না।'

এ কথা শুনে আমরা জানতে চাইলাম, 'এদিকে বাঘ আসে নাকি?'

তাঁরা বললেন, সুন্দরবনে সবখানেই বিচরণ করে বাঘ।

ক'দিন আগে এখানে ঘটেছে খুবই মর্মান্তিক ঘটনা।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ঢাকা থেকে হিরন পয়েন্টে এসেছিল এক নবদম্পতি। ওঠে এই সরকারি ভবনেই। স্থানীয়রা নিষেধ করেন, কোনওভাবেই যেন রাতে বিল্ডিং থেকে না বের হয় তারা।

সে রাত ছিল পূর্ণিমার।

মহিলার কী মনে হলো, রাত দেড়টায় স্বামীকে কিছু না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

ওদিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন স্বামী।

রুপোলি পূর্ণিমা দেখছে মহিলা।

হঠাৎ তার করুণ আর্তচিৎকারে ঘুম ভাঙল স্বামীর। পাশ ফিরে দেখল, খাটে নেই স্ত্রী!

তখন দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে দেখল সে, স্ত্রীর ঘাড় কামড়ে ধরে জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে বিশাল বড় এক বাঘ!

হতবাক হয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল বেচারা। এত আঘাত পেল, হয়ে গেল বদ্ধ পাগল।

পরদিন সকালে স্থানীয়রা এক হয়ে খুঁজতে বেরোল মহিলাকে।

লাশটা খুঁজে পাওয়া গেল। চেহারা অক্ষত, কিন্তু দেহের বেশির ভাগ অংশ খেয়ে ফেলেছে বাঘ।

এই ঘটনা শুনে সবাই মর্মাহত হলাম। ভয়ও পেয়েছি।

প্রত্যেককে বলে দেয়া হলো, ভুলেও যেন রাতে বাইরে না যায় কেউ।

জঙ্গলের ভেতর এমন খোলা জায়গায় প্রাচীরবিহীন ভবন, রাতে বাঘ আসা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

আমাদের কেউ-কেউ এ ঘটনা শুনে এতই প্রভাবিত হয়েছে, রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করল।

রাত বারোটার পরই ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা। রাত আড়াইটার সময় বাঘ-বাঘ বলে চিৎকার করে উঠল একজন। তার আর্তনাদে জেগে হকচকিয়ে বাঘ-বাঘ বলে সমস্বরে আর্তনাদ ছাড়ল কয়েকজন। ভয়ে থর-থর করে কাঁপছে সবাই।

ঘরের বাতি জ্বেলে দেয়ার কথা ভুলে গেল সবাই।

অন্ধকারে দরজা খুলে বাইরে দৌড় দিল কয়েকজন।

মোট কথা, ঘরে তৈরি হলো এক বিভীষিকাময় পরিবেশ।

সবাই বাঘ না দেখেও বাঘ-বাঘ বলে চিৎকার করছে।

এরই ভেতর একজন অন করল বাতির সুইচ।

তখন দেখলাম, দু'জনের লুঙ্গি কোথায় গেছে খবর নেই তাদের। উলঙ্গ হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চিৎকার করছে: 'বাঘ! বাঘ!'

সবাই একটু স্থির হয়ে দেখল, কোথায় বাঘ, তেমন কিছুই নেই!

সবাই সবাইকে সান্ত্বনা দিলাম। যারা দৌড়ে বাইরে গেছে, তাড়াতাড়ি তাদেরকে ঘরে ঢুকিয়ে আটকে দেয়া হলো দরজা।

কিছুক্ষণ পর জানা গেল, আমাদের একজন স্বপ্ন দেখেছে, তার ওপর হামলে পড়েছে বাঘ!

আর তার চিৎকারেই ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সবার ভেতর! ■

রাতের কল

মূল ▮ জি. এল. রেইজর
রূপান্তর ▮ মাহবুবুর রহমান শিশির

মা'র চোখে পরিষ্কার ভীতি দেখল মেয়ে। 'বাবা কি তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরবে, মা?'

কোনও এক বৃহস্পতিবার রাতে শেরি এন্ডারের কপালে শনি এসে ভর করল। ঘড়িতে তখন আটটা বাজে। ডিনারের ডিশগুলো সব এক জায়গায় জড় করছিল সে, হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। হাতে ধরা ভেজা পানির গ্লাসটা পরীক্ষা করতে করতেই কান আর কাঁধের মাঝে রিসিভারটা চেপে ধরল শেরি।

'হ্যালো!'

ও-প্রান্তে সাড়া নেই কোনও।

'হ্যালো,' আবার বলল সে। এবার খানিকটা অধৈর্য হয়েই।

ভারি গোঙানি শোনা গেল এবার। সেই সাথে ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাসের শব্দ। সময় নিয়ে ছেড়ে-ছেড়ে ফেলছে। যেন কষ্ট হচ্ছে খুব। তীব্র সুরে বলে উঠল মেয়েটা, 'কে বলছেন আপনি?'

আরও বাড়ল গোঙানি। এরপর... হঠাৎ কেটে গেল লাইন।

শেরি নিঃশব্দে নামাল রিসিভার, নিজের অজান্তেই মাথা ঠেকাল দেয়ালের সঙ্গে।

শীতের বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। জানালায় বাড়ি খেয়ে ফিসফিস শব্দ তুলছে। বাসার সামনে জোর শব্দ তুলে দ্রুত বেগে চলে গেল একটা গাড়ি...

ছোট্ট এমি জানতে চাইল, 'রং নাম্বার, মা?'

সচকিত হয়ে মেয়ের দিকে তাকাল শেরি। নিজেকে সামলে নিল। 'হ্যাঁ, সোনা, রং নাম্বার। ...মনে হচ্ছে তোমার বাবাকে একটা ফোন দেয়া দরকার।'

একবার ফোনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ফের মা'র দিকে অবাক হয়ে তাকাল এমি। বয়স মাত্র পাঁচ হলে কী হবে, মুখটাকে সিরিয়াস বানিয়ে বলল, 'কাজের সময় বাবাকে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে? ব্যাপারটা অত জরুরি না নিশ্চয়ই...'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল শেরি। ছায়া ঘনাল ওর দু'চোখে।

মা'র চোখে পরিষ্কার ভীতি দেখল মেয়ে। 'বাবা কি তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরবে, মা?'

'জানি না, মামণি,' শেরির কণ্ঠে সংশয়। 'অনেক বাড়িতেই আজ ফোনের লাইন ডেড হয়ে গেছে, ওগুলোতে সংযোগ দিতে সময় লাগবে।'

'কোনও সমস্যা, মা?'

'না তো, কোনও সমস্যাই নেই, সোনা। ...এই! তুমি জান না বেশি-বেশি উদ্বেগ করলে কুঁচকে যায় গায়ের চামড়া?' ঝুঁকে মেয়েকে কোলে তুলে নিল শেরি। হাসছে, মেয়েকে দু'হাতে শূন্যে ভাসিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে সে। হাসছে মেয়েও। খুশিতে চেঁচাচ্ছে। বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে তার সোনালি চুল।

মা'র গলা জড়িয়ে ধরল মেয়ে। 'মা, বাবার বেশি-বেশি খাটনি আমার ভাল লাগে না।'

'তাই বুঝি? আমাদের দু'জনেরই ভাবনা তা হলে এক।'

'আমার শুতে যাবার আগে বাবা কি সত্যিই আমাকে গল্প বলে শোনাবে?'

'অবশ্যই! কেন নয়? বাবা বলে গেছেন না... নয়টার ভেতরে ফিরবেন... বাবা কি তার প্রিয় মেয়ের জন্মদিনে মিথ্যে বলতে পারেন?'

মেয়েকে বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছিল শেরি, হঠাৎ মনে হলো আবার বেজে উঠল ফোন...

কিন্তু বোধহয় মাত্র একবার বেজেই থেমে গেছে।

বাইরে প্রবল বেগে ঝড় উঠেছে, কাজেই নিশ্চিত হতে পারল না সে। কে জানে, কল্পনা হয়তো...

মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল শেরি।

গভীর রাতে একটা শব্দ কানে লাগতেই ভেঙে গেল ওর ঘুম। অস্পষ্ট শব্দ, অবোধ্য। বিছানায় উঠে বসল ও। পুরোপুরি কেটে গেছে ঘুম। অন্ধকারেই এদিক-ওদিক তাকাল। পরিষ্কার মনে আছে ঘুমোতে যাবার আগে সব বাতি জ্বেলে রেখেছিল। এখন অন্ধকারে ডুবে আছে গোটা বাড়ি। ঝড় বিদায় নিয়েছে, সম্ভবত সঙ্গে বগলদাবা করে নিয়ে গেছে ইলেক্ট্রিসিটিও। ঘুমটা কেন ভাঙল, তা নিয়ে ভাবা শুরু করল সে। এখন আর শোনা যাচ্ছে না, তবে ওটার উৎস যে এই বাড়ির ভেতরে কোথাও ছিল, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ জাগল না মনে। সাইডটেবিল থেকে রেডিয়াম দেয়া ঘড়িটা নিয়ে চোখের সামনে তুলল। এগারোটা তেইশ বেজে বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়ি।

আবার মুহূর্তের জন্য শোনা গেল শব্দটা।

মনে হলো কিছু একটা ঘটছে কিচেনে।

কেঁপে উঠল সে, মাইকেলের খোঁজে তাকাল পাশে।

বিছানার ওপাশটা শূন্য।

রাতে বাসায় ফেরেনি মাইকেল...

সন্তর্পণে বিছানা ছাড়ল শেরি। কোনও শব্দ না তুলে হলওয়ে ধরে চলে এল এমির ঘরে...

এই ঘরও ফাঁকা।

আজ রাতটা যেন কেমন। অস্বাভাবিক শান্ত। বিদ্যুৎ না থাকলে যা হয়, অনেক অযাচিত অথচ অভ্যস্ত শব্দও কানে বাজে। এখন যেমন কানে পীড়া দিচ্ছে নীরবতা।

দেয়ালে হেলান দিল সে। কান পাতল।

হ্যাঁ, ওই তো... শোনা যাচ্ছে আবার... ভারী কী যেন সরানোর আওয়াজ... হ্যাঁ, কিচেন থেকেই তো আসছে...

ভয়ের একটা ঢেউ চুল থেকে নখ পর্যন্ত বয়ে গেল শেরির।

এমি কোথায়?

অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে কিচেনের পথ ধরল শেরি। সর্বাঙ্গ কাঁপছে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে নিজেকে থিতু রাখতে। এমির খোঁজে চারদিকে চোখ বোলাতে-বোলাতে এগোচ্ছে।

মেয়ে চোখে ধরা পড়তেই ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিস্ময়ের ঢেউ বয়ে গেল।

একটা চেয়ারে বসে আছে এমি। যেন এমি নয়, কোনও কাঠের পুতুল। এক হাতে কানে চেপে ধরেছে ফোনের রিসিভার। চোখদুটো বোজা। বেশ শক্তভাবেই বোজা। দুই ঠোঁট একবার নড়ে উঠল তার। খুশি-খুশি গলায় বলল, 'ওহ, বাবা, গল্পটা দারুণ...

মেয়ের গলা কানে ঢুকতেই পরম প্রশান্তিতে অবশ হয়ে এল শেরি। ভয় লাগল, হাঁটু ভেঙে না আবার পড়ে যায় সে!

বাবার সঙ্গে কথা বলবে বলে এমি চেয়ারটাকে ফোনের কাছে টেনে এনেছিল, আর সেই শব্দটাই শুনেছিল। তবু খুঁতখুঁত করছে কেন মনটা? ভাল করে মেয়েকে খেয়াল করতে লাগল।

ঈশ্বর! ও কি ঘুমের মধ্যেই হেঁটে এসেছে এ পর্যন্ত? শেরি আপন মনেই ফিসফিস করে উঠল। লঘু পায়ে গিয়ে মেয়ের হাত থেকে রিসিভারটা একরকম কেড়ে নিল। 'আমাদের এখন ঘুমাতে হবে, সোনামণি।' অভ্যাসবশত রিসিভারটা কানে ঠেকাল শেরি... এবং নিমেষে কাঠ হয়ে গেল।

সেই ভারী গোঙানি, নিঃশ্বাসের চাপা ফোঁসফোঁস শব্দ...

জান্তব... ভয়াবহ... পিলে চমকানো...

শিউরে উঠল শেরি। কাঁপাকাঁপা গলায় কেবল বলতে পারল, 'কে বলছেন?'

নীরব হয়ে গেল ফোন।

সাড়া নেই হাতে, কোনও রকমে রিসিভারটা নামাল শেরি।

শান্ত হও, স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করো...

শেরি প্রবোধ দিচ্ছে নিজেকে। কাজ হচ্ছে না। সে একটা কিছু শুনেছে ফোনে... ভয়াবহ কিছু। অথচ মনেই করতে পারছে না আদৌ রিং বেজেছিল কি না।

টেলিফোনের আওয়াজ শুনতে পায়নি, এ ব্যাপারে নিশ্চিত।

আতঙ্কে কাঁপতে-কাঁপতে মেয়েকে বিছানায় নিয়ে এল শেরি, শুইয়ে দিল তাকে। এরপর সোজা এল কিচেনে। বড় করে শ্বাস নিল একবার।

অকস্মাৎ ফোন বেজে উঠতেই ভীষণভাবে চমকে উঠল। ঝট করে তাকাল সেদিকে। চোখে পলক পড়ছে না। চারবার ফোন বাজার পর সংবিৎ ফিরে রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতে পারল।

'মিসেস এল্ডার?' ও-প্রান্ত থেকে বিষাদমাখা সুরে জিজ্ঞেস করল কেউ।

শেরির মুখ থেকে অস্ফুট শব্দ বেরুল কেবল, একেই সম্মতি হিসাবে ধরে নিল ও-প্রান্তের লোকটা।

'দুঃখিত, একটা দুঃসংবাদ আছে আপনার জন্য...' থেমে গেল কণ্ঠ।

কারা যেন কথা বলে উঠল হঠাৎ...

ঠিক এই মুহূর্তে... কথা বলছে দু'জন মানুষ। দু'জনেই শেরির অতি-পরিচিত।

এমি কথা বলছে মাইকেলের সঙ্গে।

কথা চলছে বাবা আর মেয়েতে।

সেসব কথা, সকালে বাসা থেকে বেরুবার আগে মাইকেল যা বলেছিল মেয়েকে।

এ হতে পারে না। এসবই ভ্রম। উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। অথচ পরিষ্কার শুনছে শেরি। ও-প্রান্তের কণ্ঠের চেয়েও পরিষ্কার।

ও-প্রান্তের লোকটাও কথা বলছে। তার বক্তব্য ভয়াবহ। বিশ্বাস হতে চায় না।

দু'দিকের কথোপকথন মাথার ভেতরে ক্রমাগত দুই দিক থেকে হাতুড়ির বাড়ি মারছে... পাগল হবার দশা!

'...আজ রাতে বাবা তোমাকে দারুণ একটা গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াবে, সোনা।'

'মাইকেল এল্ডার একটা দুর্ঘটনায় পড়েছেন...'

'প্রমিজ, বাবা?'

'পাওয়ার লাইনে আটকে গেছিলেন তিনি...'

'প্রমিজ, সোনা!'

'তাকে দেরি না করে কাউন্টি হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আপনি চাইলে আপনাকে সেখানে নেয়ার জন্য লোক পাঠাতে পারি... পাঠাব?'

'তার দরকার হবে না, গাড়ি আছে আমার,' নিজের কথা কানে ঢুকল শেরির। ও-প্রান্ত নীরব হয়ে গেলে কিচেনের ঠাণ্ডা টেবিলের ওপর এক সেকেণ্ডের জন্য ঝুঁকে মাথা রাখল সে। চাইল মনের সব ভাবনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে।

জানালা গলে চুইয়ে ঢুকছে শেষ রাতের ম্লান আলো। বসে-বসেই নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছে শেরি। এসব কিছুই না। সবই মনের ভুল। কিছুক্ষণের জন্য প্রায় বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল সে।

প্রায়...

এক ঝটকায় সোজা হলো শেরি। হাতে তুলে নিল গাড়ির চাবিটা। এমিকে জাগাতে হবে। ঠিক এসময় ফিরে এল কারেন্ট। আলোর আকস্মিক আগমনে মুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখল ও। একই সঙ্গে গর্জে উঠল টেলিভিশন। ঘুমোতে যাবার আগে ভুলে ওটার সুইচ বন্ধ করা হয়নি।

ওটার গর্জন ছাপিয়ে বেজে উঠল টেলিফোন।

যন্ত্রটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল শেরি। এরপর তুলল রিসিভার। অবিশ্বাসে চোখ জোড়া বড়-বড় হলো ওর।

সেই গোঙানি!

কান খাড়া করল শেরি।

কীসের সঙ্গে মেলে শব্দটা?

কেউ তড়িতাহত হয়েছে? হাই ভোল্টেজ কারেন্ট?

মাইকেল?

ভারী গলায় কিছু একটা বলতে চাইছে কেউ। 'কোনও...'

কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে। এবার আরেকটু জোর দিয়ে বলল, 'এক সময়...'

'মাইকেল, থামো!' অনুনয় জানাল শেরি। গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের পানিতে। 'এখন গল্প বলার সময় না। ...সব ঠিক হয়ে যাবে, সোনা। আমরা আসছি...'

কখন যেন নিজ থেকে স্তব্ধ হয়ে গেছে টেলিভিশন।

'...এক জঙ্গলে তিনটা ভালুক ছিল,' থেমে নেই ও-প্রান্তের কণ্ঠ। থেমে-থেমে অথচ নির্দয় সুরে বেজে চলেছে একটা ভাঙা রেকর্ড... যেন যত কষ্টই হোক, তবু শেষ না করে থামবে না...

রিসিভারটা গায়ের জোরে আছড়ে রাখল শেরি। ঘুরে দাঁড়াতেই এমিকে দেখতে পেল। সরাসরি ভীত চোখে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে ছোট্ট মেয়েটা।

'কে, মা?'

চোখের পানিতে ভেসে যেতে-যেতে বলল শেরি, 'কেউ না, মা। আবার রং নাম্বার।'

মেয়ে ছুটে এল মায়ের কাছে, মা'র কোলে উঠবে, ফোন বেজে উঠল আবার। শেরি ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। অপেক্ষা করছে, কখন থামবে ওটা। নীরবে প্রার্থনা করছে, কখন বন্ধ হবে আওয়াজ।

'ফোনটা ধরবে না, মা?'

'না, একরাতের জন্য অনেক বেশি ফোন ধরা হয়েছে আজ...'

এক ঝটকায় দেয়াল থেকে ফোনের প্লাগটা ছোটাল শেরি। নেমে এল গভীর নীরবতা। অনেকক্ষণ ধরে আটকে রাখা শ্বাসটা ছাড়ল ও। গভীর ভাবে কাছে টানল মেয়েকে।

'চলো, বাছা, তোমার পোশাক পাল্টে দিই। এক্ষুণি বেরোব আমরা। তোমার বাবা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

মেয়েকে নিয়ে বেরুবে শেরি, আবারও কর্কশ শব্দে বেজে উঠল ফোন!

সত্যিই যদি শিল্প পর্যায়ে এভাবে ইথানল পাওয়া যায়, তবে বিশ্ব হয়তো কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।

জ্বালানি দেবে দূষণ!

কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস থেকে ইথানল পাওয়ার একটি সহজ প্রক্রিয়া ঘটনাক্রমে বের হয়েছে। প্রক্রিয়াটি বের করেছেন মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অভ এনার্জির ওক রিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা। অনুঘটকের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে ইথানল তৈরি হয়। এতে অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার হয়েছে কার্বন, তামা এবং নাইট্রোজেনের মত অত্যন্ত আটপৌরে এবং সস্তা উপাদান। এ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত ইথানল সরাসরি গাড়ির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। এ কথাটি জানিয়েছেন গবেষণা দলের নেতা ড. অ্যাডাম রোনডিনোন। গবেষণাগারের এ প্রক্রিয়া শিল্প পর্যায়ে সঠিক ভাবে কাজ করে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখার প্রস্তুতি চলছে। সত্যিই যদি শিল্প পর্যায়ে এভাবে ইথানল পাওয়া যায়, তবে বিশ্ব হয়তো কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। শুধু তাই নয়, মিলবে সস্তায় ইথানলের মত চমৎকার জ্বালানি!

তাপে সংকুচিত!

না-না, ঠিকই পড়েছেন। ছাপাখানার ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা নয়। তাপে সংকুচিত হয়, সত্যিই এমন পদার্থ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেসের সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কিমিং ওয়াং এবং তাঁর সহকর্মীরা তৈরি

করেছেন এ পদার্থ। এজন্য গবেষক দলটি ব্যবহার করেছেন থ্রিডি প্রিন্টার। তাপে ভিন্ন ভিন্ন হারে প্রসারিত হয়, এমন দুটো পদার্থ ব্যবহার করে নতুন এ পদার্থ তৈরি করা হয়। তাপে পদার্থের প্রসারণ বা আকারে বৃদ্ধি পাওয়ার গুণটি অনেক সময়ই নানা উটকো ঝামেলা ডেকে আনে। সেতু থেকে দাঁতের ফিলিং পর্যন্ত নানা ক্ষেত্রে এমন ঝামেলা হতে পারে। নতুন পদার্থ নির্মাণের মধ্য দিয়ে যুগ-যুগের এ সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অণুজীবের শত্রু সভ্যতা!

সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঘ-ভালুক বা হাতির মত বুনো অনেক জীব-জন্তু-পাখি হারিয়ে যেতে বসেছে। একই ভাবে হুমকির মুখে পড়ছে অণুজীবও। বিশেষ করে মানুষের শরীরে বা অন্ত্রের ভেতর যেসব অণুজীব রয়েছে, তাদের অনেকেই এভাবে পুরোপুরি নির্মূল হয়ে গেছে। কিংবা তাদের সংখ্যা মারাত্মক ভাবে কমছে। বোস্টনে অনুষ্ঠিত আমেরিকার সোসাইটি ফর মাইক্রোবায়োলজির বাৎসরিক বৈঠকে এ কথা বলা হয়েছে। কথাটি বলেছেন সিডনির ম্যাককুইয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল

গিলিংস। অন্ত্রের এসব অণুজীব এভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় বা তাদের সংখ্যা কমে যাওয়ার সঙ্গে হাঁপানি, স্থূলত্ব, সোরিয়াসিসসহ নানা মানসিক রোগের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার হয়তো সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের জীবন যাপনের ধারা পরিবর্তন করে এবং বৈচিত্রময় শস্য ফলিয়ে অণুজীবের ধ্বংস ঠেকানো সম্ভব বলে মনে

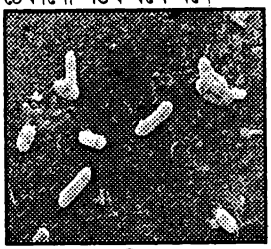

করছেন বিজ্ঞানীরা। তবে কথাগুলো যত সহজে বলা গেল, করা হয়তো তত সহজ হবে না।

আসছে নতুন পোশাক!

মার্কিন সেনাবাহিনীর নতুন এক পোশাক নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে ওটা পরলে অন্ধকারে দেখার ক্ষমতা পাওয়া যায়, গুলি ঠেকানো যায়, শুধু তাই নয়, দৈহিক বলও অকল্পনীয় ভাবে বাড়িয়ে দেবে এ পোশাক। ট্যাকটিকাল লাইট অপারেটর সুট বা সংক্ষেপে ট্যালোস নামের পোশাকটি আগামী দু'বছরের মধ্যে তৈরি হবে। তারপর যুদ্ধ পরিবেশে পোশাকটির কার্যকারিতা যাচাই করা হবে। এ কথা জানিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনী। আয়রন ম্যান ছবি থেকে এমন অজেয়

পোশাকের ধারণা পাওয়া গেছে বলেও জানানো হয়েছে। মার্কিন নেভি সিল এবং স্পেশাল ফোর্স নামে পরিচিত কমাণ্ডো বাহিনীর সদস্যদের প্রথমে দেয়া হবে এমন পোশাক।

ওষুধেই যাবে!

গত ৩০ বছরে কিডনির পাথর ঠেকানোর চিকিৎসায় বিশাল কোনও পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু তামসিউলোসিন বা তামসোলোসিন নামের ওষুধ ব্যবহারে এবার দারুণ পরিবর্তন আসবে। এমনটিই ধারণা করছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। বর্তমানে প্রোস্টেটের চিকিৎসায় ব্যবহার হয় এ ওষুধ। অস্ট্রেলিয়ার

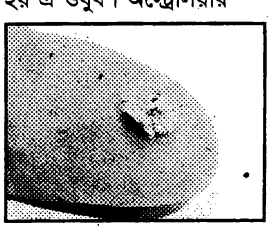

পাঁচ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চার শ' কিডনি রোগীর ওপর ব্যবহার করা হয়েছে এটি। চিকিৎসকরা দেখতে পেয়েছেন, যাদের এ ওষুধ দেয়া হয়েছে, বেশির ভাগ সময়ই তাদের কিডনির পাথর প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয়ে গেছে। সাধারণ ভাবে বড় আকারের পাথর এভাবে বের হতে চায় না। বা হলেও তা কষ্টকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ পরীক্ষার নেতৃত্ব দিয়েছেন ড. জেমি ফারইক। তিনি বলেছেন, কিডনি রোগীর সহজে এবং সস্তায় চিকিৎসার পথ খুঁজে পাওয়া গেছে। এ ছাড়া, ভবিষ্যতে কিডনি পাথর বের করতে জটিল এবং ব্যয়বহুল অপারেশনের দরকারই হয়তো পড়বে না। তবে ডাক্তারের বিনা অনুমতিতে এ ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত হবে না রোগীর। এতে মারাত্মক কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।■

আমিল বতুল

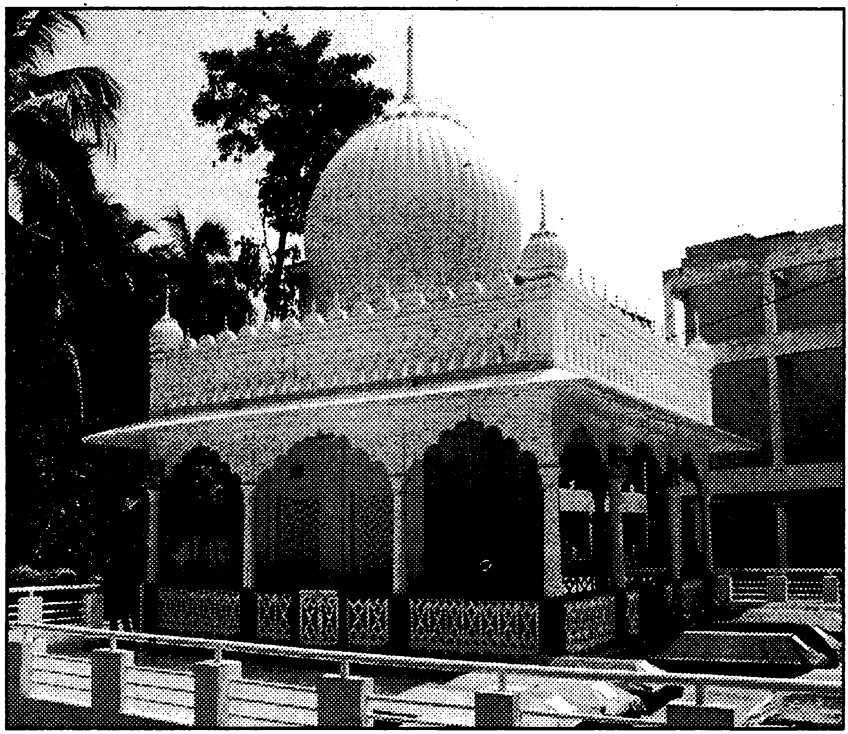

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে

এস. এম. নওশের

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন কয় জাতের কী রূপ দেখলাম না দুই নজরে।
কেউ মালায় কেউ তসবীহ গলায়, তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায় জাতের চিহ্ন রয় কার রে।
যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারীর তবে কী হয় বিধান
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ, বামনী চিনি কীসে রে।

প্রথম মাসে মাংস শোণিতময়
দুই মাসে নর-নারী কড়া অস্থির উদর
তিন মাসে তিন গুণে জীবের মস্তক জন্মায়
চতুর্থতে নেত্র-কর্ণ-ওষ্ঠ-লোম আনে
পঞ্চমেতে হস্ত পদাকার–
পঞ্চ তত্ত্বে এসে তব করলেন সঞ্চার
সেইদিন হলো জীবের আকার ও প্রকার
ছয় মাসেতে ষড়রিপু বসিল স্থানে-স্থানে
সপ্তমেতে সপ্তধাতু যে–
এরা আপন শক্তি লয়ে বসিল এসে
অষ্টমেতে অষ্ট সিদ্ধি এল ভোগের কারণে
নয় মাসে দশ ইন্দ্রিয় না রয়ে গর্ভ ধামে।

কুষ্টিয়া বেড়াতে এসে লালনের আখড়ায় গানটি যখন শুনছিলাম তখন তন্ময় হয়ে ভাবছিলাম আমাদের দেশের মরমী সাধকেরা কত বড় জ্ঞানী ছিলেন। হিউম্যান এমব্রায়োলজির (মানব ভ্রূণতত্ত্ব) মত জটিল বিষয়কে কত সহজে গানের মাধ্যমে তাঁরা প্রকাশ করেছেন। মায়ের গর্ভে শিশুর ক্রমবিকাশ নিয়ে এত সহজে আর কেউ ব্যাখ্যা করেছেন বলে শুনিনি।

সেবার কুষ্টিয়া গেলাম আমার পরিচিত এক লালন ভক্তের সাথে। ঢাকার কল্যাণপুর থেকে বাসে উঠলাম। এস. বি. পরিবহন। শরতের স্নিগ্ধ সকালে আমাদের বাসযাত্রাটা বেশ আনন্দময় হলো। পথে পড়ল যমুনা সেতু, চলন বিল, রূপপুর পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র, পদ্মার ওপর দেশের বৃহত্তম রেল সেতু হার্ডিঞ্জ ব্রিজের সমান্তরাল অধুনা নির্মিত লালন সেতু। দেশের পর-পর দুটি বৃহত্তম নদী আর বৃহত্তম বিলের শোভা মনে হয় কুষ্টিয়া যাবার পথেই দেখতে পাওয়া যায়। এত কিছু দেখতে-দেখতে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম কুষ্টিয়া শহরে। আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে, পথে যেতে যমুনা পাড়ের মাইলের পর মাইল যানজটে নাকাল হতে হয়নি সেদিন।

লালন নিয়ে আমার আগ্রহ খুব বেশি দিনের নয়। দুটো বই আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেছে। একটি হলো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মনের মানুষ, অপরটি মোস্তফা আহমাদের লালন ভেদ সমগ্র। বই দুটো পড়েই আমার মনে আগ্রহ জাগল লালনের আখড়া দর্শনের।

বাস থেকে নেমে স্থানীয় একটি হোটেলে উঠলাম। গোসল-খাওয়া সেরে রিকশা নিয়ে রওনা দিলাম ছেউড়িয়া গ্রামের উদ্দেশে–লালন সাঁইয়ের মাজারে। শহর থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কালিগঙ্গা নদীর ধারে গ্রামের স্নিগ্ধ-শ্যামল পরিবেশে সাঁইজির মাজার কমপ্লেক্সটি খুব সুন্দর। একপাশে তিনতলা সাদা ভবন যা সম্প্রতি নির্মাণ হয়েছে। অন্যপাশে লালন শাহ্ কমপ্লেক্স যেখানে রয়েছে বিশাল খোলা হলঘর। এখানেই সারা দেশ থেকে আসা বাউলেরা গান করেন আর ভক্ত অতিথিবৃন্দ গান শোনেন। দুই ভবনের মাঝখানে ফকির লালন সাঁইয়ের সমাধি ক্ষেত্র। শ্বেত পাথরে তৈরি এই সমাধি ভবনটিও খুব সুন্দর। তিনতলা ভবনটি হলো লালন একাডেমী। এখানেই রয়েছে লালন জাদুঘর, লালন পাঠাগার, ইত্যাদি। বাইরে, কমপ্লেক্স ভবন আর কালিগঙ্গা তীরের মাঝে রয়েছে লালনের একটি দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য যার চত্বরে বসেও অনেক লালন ভক্ত বাউল একের পর এক গান গেয়ে যান। সরাসরি তাঁদের কণ্ঠে গান শোনার অনুভূতিই অন্যরকম। আছে ছোট-ছোট স্টল যেখানে পাওয়া যায় একতারা, দোতারা, ঢোল, খোল, ডুগডুগি, করতাল, ইত্যাদি নানা গ্রামীণ দেশজ বাদ্যযন্ত্র আর মনোহারী হস্ত ও কুটির শিল্প সামগ্রী। আছে লালন সাঁইকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন বই। প্রতি বছর পৌষ মাসে এখানে লালন মেলা বসে। তখন সারা দেশ থেকে হাজার-হাজার লালন ভক্ত বাউল এখানে ছুটে আসেন। তিন দিন থাকেন। নিজেরাই রান্না করে খান আর সারাদিন মরমী গান করেন।

এখানকার অন্যতম একটি আকর্ষণ হচ্ছে লালনের আখড়াবাড়ি। লোকে বলে, প্রথম জীবনে লালনের একবার বসন্ত রোগ হয়েছিল। বাঁচার আশা ছিল না বললেই চলে। সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় তাঁকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। ভাসতে-ভাসতে তাঁর দেহ কালিগঙ্গা নদীর এদিকে চলে এলে তীরে এক বিধবার চোখে পড়ে। তিনি লালনকে উদ্ধার করে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন এ বাড়িতে। পরবর্তীতে যৌবনে এসে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অর্জন ও গানের চর্চা শুরু হয় তাঁর এ বাড়ি থেকেই। তাই এর নাম

হয়েছে আখড়াবাড়ি। এখানে লালনের সম্মানে দিনরাত সবসময় প্রদীপ জ্বেলে রাখা হয়। আমার লালন ভক্ত সঙ্গী নূর ভাই আমাকে নিয়ে গেলেন সেখানে। এখানে এক ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হলো। তিনি তাঁর ভিজিটিং কার্ড আমাকে দিলে দেখলাম নাম আব্দুল কুদ্দুস। আমরা ঢাকা থেকে এসেছি শুনে খুব খুশি হলেন। সেদিন সন্ধ্যায় আখড়াবাড়ি আসার আমন্ত্রণ জানালেন।

আমরা গেলাম সন্ধ্যার পর। গিয়ে দেখি সেখানে বসে আছেন কবি ফরহাদ মজহার। হাতে একটি একতারা। আমাদের আমন্ত্রণকারী সেই ভদ্রলোকও আছেন, তাঁর সামনে রাখা ঢোল। আরও বেশ ক'জন বিভিন্ন বয়সী ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাকে বসা দেখলাম। চাঁদনী রাত। নদী থেকে আসছে ঝিরিঝিরি হাওয়া। খুব চমৎকার পরিবেশ। এবার শুরু হলো গান। সেখানে বসা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পালা করে গান গাইলেন। শেষে কবি ফরহাদ মজহার একতারা বাজিয়ে তিনটি গান আমাদের গেয়ে শোনালেন। সবই লালনের গান। বিকেলে শুনেছি বাউলদের কণ্ঠে। এবার শুনলাম এঁদের কণ্ঠে। সকলেই ভাল গেয়েছেন। যাঁরা তুলনামূলকভাবে একটু ভদ্র পরিবেশে গান শুনতে চান তাঁরাই মূলত এখানে আসেন। গান শেষ হলে নূর ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন কবি ফরহাদ মজহারের সাথে। ভীষণ অমায়িক দিলখোলা মানুষ। তাঁকে সালাম দিয়ে বললাম, 'আপনাকে এত দিন চিনতাম কবি, প্রবন্ধকার এবং ভিন্ন চিন্তার একজন কলামিস্ট হিসেবে। আপনি যে লালন গবেষক এটা জানতাম না।'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিনি হেসে বললেন, 'কে বলল আমি লালন গবেষক? আমি হলাম লালনের ঘরের লোক।' ফরহাদ মজহার সাহেব আমাদের পরদিন সকালেও এখানে আসার আমন্ত্রণ জানালেন।

কবিগুরু রবিঠাকুরও কিন্তু লালনের অনুরাগী ছিলেন। কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে আসেন তখন তিনি প্রথম দেখেন লালনকে। একবার তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালন সাঁইকে তাঁর বজরায় আমন্ত্রণ জানান। সেখানেই তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে তাঁর একটি স্কেচ আঁকেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। লালন ভক্তরা জেনে পুলকিত হবেন, লালনের প্রতিকৃতি হিসেবে যে ছবিটি সর্বত্র পাওয়া যায় তা জ্যোতি ঠাকুরের আঁকা স্কেচটি থেকেই নেয়া।

লালনের প্রাতিষ্ঠানিক কোনও শিক্ষা ছিল না। অথচ সুফী তত্ত্বের গুপ্ত বিষয়গুলো কত সহজে তাঁর গানের ভেতর দিয়ে তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত গান নিয়ে আজ পণ্ডিতরা গবেষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিচ্ছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বহু কবিতায় লালন দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। নিন্দুকেরা বলেন তিনি নাকি লালনের একটি গানের খাতা নিয়ে তা আর ফেরত দেননি। থাক সে কথা, আমি সেই বিতর্কে যেতে চাই না। লেখাটি শেষ করছি লালনের বিখ্যাত একটি গান দিয়ে–

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন কয় জাতের কী রূপ
দেখলাম না দুই নজরে।
কেউ মালায়, কেউ তছবি গলায়
তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার রে
যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কী হয় বিধান
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ
বামনী চিনি কীসে রে। ■

রহস্যপত্রিকা সহ সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের
নতুন ও রিপ্রিন্ট বই পাওয়া যায়।
বুক প্যালেস
পাকা পুলের মোড়, সাতক্ষীরা।
মোবাইল: ০১৯২২-৬২১৬৮৯

অভিশাপ

মিজানুর রহমান কল্লোল

'কোন কবরের মধ্যে আপনি কোন লাশের ছিটেফোঁটাও দেখবেন না, সব আমি খেয়ে সাবাড় করেছি।'

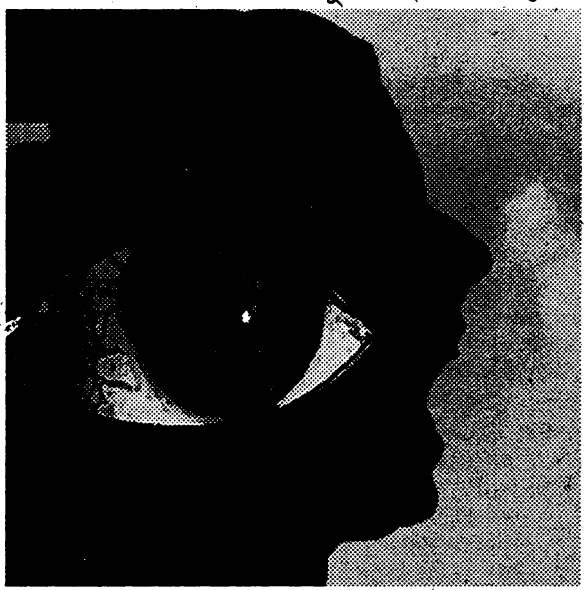

প্রতি বুধবার শ্রীনগর বিক্রমপুর হাসপাতাল থেকে ঢাকা ফেরার পথে সিরাজদিখানের কলেজ গেটের মোড়ে রাস্তার বাম পাশে জামগাছের সাথে টানানো সাইনবোর্ডটা আমার চোখে পড়ে।

'কুচিয়ামোড়া হইতে সৈয়দপুর
দূরত্ব ৫ কিলোমিটার
সৌজন্যে নবাব চেয়ারম্যান।'

প্রতি বুধবার বললাম এই জন্য যে, এই দিনে আমি দুপুরের দিকে ঢাকা থেকে শ্রীনগর চলে যাই। তাঁতিবাজারের মোড় থেকে মাওয়াগামী স্বাধীন এক্সপ্রেস কিংবা আরাম বাসে উঠলে শ্রীনগর ফেরিঘাটে পৌঁছতে লাগে মাত্র চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ওখান থেকে রিকশায় উঠলে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। ঝুমুর সিনেমা হলের সাথে ডা. দীলিপ মণ্ডলের গড়া বিক্রমপুর হাসপাতাল। যদিও হাসপাতালটি ডা. দীলিপ মণ্ডলের গড়া, কিন্তু সেটা সার্বক্ষণিক দেখা-শোনা করে তাঁর দূরসম্পর্কের ভাই সনাতন মণ্ডল। আমি গত ছ'মাস ধরে ডা. দীলিপের অনুরোধে ওখানে গিয়ে রোগী দেখছি।

বুধবার ঠিক বিকাল তিনটা থেকে রোগী দেখা শুরু করি। সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে রোগী দেখা শেষ করে আবার রওনা দিই ঢাকার উদ্দেশে। শ্রীনগর যাবার পথে সাইনবোর্ডটা তেমন নজরে পড়ে না,

কারণ যাবার সময় ওটা থাকে ডান দিকে। কিন্তু ফেরার সময় ওটা ভীষণভাবে চোখে পড়ে। আমি খুব আকর্ষণ বোধ করি। খুব ইচ্ছে জাগে ওই পাঁচ কিলোমিটার রাস্তাটা ঘুরে দেখতে।

'কুচিয়ামোড়া হইতে সৈয়দপুর
দূরত্ব ৫ কিলোমিটার
সৌজন্যে নবাব চেয়ারম্যান।'

খুব সাদামাঠাভাবে লেখা সাইনবোর্ডটি, আর দশটা সাইনবোর্ডের মতই। সোজা ঢাকার দিকে চলে গেছে পিচ ঢালা পথ। আর ঠিক বাঁ দিকে চলে গেছে লাল ইট বিছানো রাস্তা। ওটাই নির্দেশিত সৈয়দপুরের পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা। রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বিস্তৃত খাল। খালটার নাম আমার জানা হয়নি কখনও। রাস্তার ওপর থেকেই বোঝা যায় খালের পানি বেশ স্বচ্ছ। মৃদু বাতাসে ঢেউ খেলে যায় পানিতে। খুব সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু ওসব কিছুই নয়, সাইনবোর্ডের লেখা আমাকে টানে। বুঝতে পারি এই লাল ইট বিছানো রাস্তাটা সৈয়দপুর যাবার রাস্তা, আর কলেজ গেটের মোড়ের এই জায়গাটির নাম কুচিয়ামোড়া। অনেকদিন ভেবেছি, একদিন বেশ সকাল-সকাল ফিরব, তারপর নেমে পড়ব এখানে। ইট বিছানো রাস্তা দিয়ে হাঁটব, দেখব সামনে কী আছে। সামনে কি আসলেই কিছু আছে?

কোন প্রাচীন ভবন?
কোন ধ্বংসস্তূপ?
অথবা দর্শনীয় কিছু?
মনে হয় না।

যদি সেরকম কিছু থাকত, বিজ্ঞাপন দেয়া থাকত বিশাল করে। স্যর জগদীশ চন্দ্র বসুর বাড়িটাকে যে পিকনিক স্পট করা হয়েছে সেটার বিজ্ঞাপন মাইলের পর মাইল জুড়ে দেয়া হয়েছে। একটু পরপর চোখে পড়ে ভুঁইয়া মেডিক্যাল কলেজের বিজ্ঞাপন। প্রতিদিন সেসব পথে প্রচুর মানুষ যাচ্ছে আর আসছে।

কিন্তু 'কুচিয়ামোড়া হইতে সৈয়দপুর/দূরত্ব ৫ কিলোমিটার/সৌজন্যে নবাব চেয়ারম্যান' নিতান্তই একটা সাইনবোর্ড। ওই বাঁয়ে মোড় নেয়া ইট বিছানো রাস্তায় আমি কোন গাড়ি তো দূরের কথা, রিকশা-ভ্যানও যেতে দেখি না। এমনকী কাউকে কখনও হেঁটে যেতেও দেখিনি। হয়তো একটা সাধারণ, খুবই সাধারণ গ্রাম হবে ওটা। হয়তো নবাব নামের কোন এক চেয়ারম্যান, কিংবা তার নামে কেউ একজন কোন একদিন লাগিয়েছিল এই সাইনবোর্ড, জায়গাটা চেনার জন্য, কিন্তু কাউকে আমি ওই সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকতেও দেখিনি, যেমনটি আমি আগ্রহভরে তাকিয়ে থাকি। আমাকে খুব টানে ওটা। নিজের মনে নিজেই হেসে উঠি, আমাকেই শুধু টানে?

কিন্তু কখনওই আমার নামা হয় না ওখানে। কারণ বাস ওখানে থামে না। বাস থামে আরও সামনে গিয়ে, নিমতলী বাজারের কাছে।

প্রথম দু'সপ্তাহ আমি শ্রীনগরে প্রাইভেট কারে করে গিয়েছিলাম। তাই শুনে আমার এক অনুজ ডাক্তার বলল, 'ভাই, এসব রাস্তায় প্রাইভেট কার নিয়ে যাবেন না। কখন কী দুর্ঘটনা ঘটে!'

আমি তার কথা গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু চোখের সামনে একই দিনে তিনটি অ্যাকসিডেন্ট দেখার পর আমি প্রাইভেট কার ছেড়ে দিয়ে বাস ধরি।

এভাবে দেড়টি বছর কেটে যায়।

আমার চেম্বার জমজমাট হয়ে ওঠে।

এখন ফিরতে-ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়।

একদিন সনাতন মণ্ডল আমাকে বলল, 'স্যর, আপনি আরও একটা দিন আমাদের সময় দেন।'

আমি বললাম, 'সেটা সম্ভব নয়, সনাতন বাবু। ঢাকায় আমার চেম্বার আছে।'

সনাতন নাছোড়বান্দা, বলল, 'স্যর, এখানে একদিনে আপনার যে ইনকাম হবে, ঢাকাতে পুরো সপ্তাহেও সেটা হবে না।'

আমি বললাম, 'সনাতন বাবু, আপনি জানেন আমি কখনও টাকার পেছনে ঘুরি না। আমি চেম্বার করি হচ্ছে–'

সনাতন আমার কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'জানি, স্যর, মানুষের সেবার জন্য। তবু বাজিয়ে দেখলাম। মানুষ বাজাতে আমার ভাল লাগে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমাকে বাজাতে আসবেন না। একেবারে সারকামসিশন করে ছেড়ে দেব।'

সনাতন বলল, 'ছিহ্-ছিহ্, স্যর, মাইণ্ড

করলেন! আপনার সাথে একটু মজাও করা যায় না! ঠিক আছে, বসার দরকার নেই। তবে বলেছি এজন্য যে, রোগীদের অনেক উপকার হয়। এদিকটায় কোন অর্থোপেডিক ডাক্তার নেই। ঢাকায় গিয়ে ডাক্তার দেখাবে সে সঙ্গতিও এদের নেই। আপনি যদি আরেকটা দিন বসতে না চান, আমি তো আর জোর করতে পারি না, স্যর।'

আমি তাকালাম লোকটার দিকে। শুকনো, পাতলা শরীর। মাথায় বিশাল টাক। ধূর্ত চোখ।

'দেখি, ভেবে দেখব।' আমি বললাম।

সনাতন বলল, 'শনিবার আসেন। ওই দিন তো শুনেছি আপনি ফ্রি থাকেন। বারোটার আগেই চলে আসবেন। এখানে এসে বিশ্রাম নেবেন। তারপর দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে রোগী দেখা শুরু করবেন। সন্ধ্যার আগেই আশা করি একশ' রোগী দেখা শেষ করতে পারবেন।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আমি আসব। এখন যাই। নেক্সট শনিবার তাহলে দেখা হবে। কাউকে বলুন ফেরিঘাট পর্যন্ত একটা রিকশা ঠিক করে দিতে।'

'রিকশা রেডি আছে, স্যর। আগেই ডেকে রেখেছি। ভাড়া দেয়া লাগবে না। ভাড়া দেয়া আছে। আপনি, স্যর, রিকশায় গিয়ে উঠুন, ফার্মেসির ছেলেটা আপনার ব্যাগ রিকশায় তুলে দিয়ে আসবে।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, চলি তাহলে। বাই।'

আমি রুম থেকে বেরিয়ে দরজার পাশে জুতো পরছি, শুনি পেছনে সনাতন চাপা স্বরে হাসছে, আর বলছে, 'আমি শালা মানুষ বাজাই। মানুষ বাজানোই আমার কাম। আসবে না আবার? একশ' রোগী। চারশ' টাকা কইরা দিলে একদিনেই চল্লিশ হাজার টাকা পকেটে।'

ভেবেছিলাম আমি শনিবার যাব না। কিন্তু গেলাম। না, টাকার লোভে নয়। সত্যিকার অর্থে আমি গরীব রোগীদের সেবাদানের জন্যই গেলাম। আমি কখনও কোন্ রোগী আমাকে কত ভিজিট দিল সেটা খেয়াল করি না। পেশাগত জীবনের শুরু থেকেই মানুষকে সেবা প্রদান আমার কাছে পরম কর্তব্য বলে মনে হয়।

শনিবার কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক বারোটায় আমি বিক্রমপুর হাসপাতালে পৌঁছে গেলাম। সনাতন অভ্যর্থনা জানাল আমাকে।

'আসেন, স্যর। খুব খুশি হয়েছি আপনি এসেছেন। একজন রোগীকেও বসিয়ে রেখেছি আপনার জন্য। সে প্রাইভেট টক করতে চায় আপনার সাথে। ফাজিল রোগী। আমাকে কিছু বলতে চায় না। তবে পীড়াপীড়ি করতে বলল, গোপন রোগ। আমি বললাম, স্যর তো অর্থোপেডিক ডাক্তার। ফাজিলটা চোখ টিপে বলল, "স্যর গোপন রোগেরও চিকিৎসা জানে, পেপারে তার লেখা পড়ি।" আমি, স্যর, ভিজিট আটশ' টাকা কইছি। সে রাজি হইছে। আপনি যেন, স্যর, কম নিয়েন না। স্যর, বোঝেনই তো, কম ভিজিট মানে সস্তা ডাক্তার। আমাদের হাসপাতালের একটা আলাদা দাম আছে।'

'আচ্ছা, আপনি রোগী পাঠান। ভিজিটের বিষয়টা আমি দেখব। কিন্তু আপনি না বলেছিলেন একশ'টা রোগী হবে?'

সনাতন বলল, 'রোগীরা আসবে দুইটার পর থেকে। আপনি এই রোগীটা দেখার পর কাঁচা আমের শরবত খেয়ে একটু বিশ্রাম নেন। ভাগ্যকুল রোড থেকে কাচ্চি বিরিয়ানি আনাচ্ছি। দারুণ স্বাদ। দুই প্লেট একবারেই খাওয়া যায়। আপনি চেম্বারে বসুন, স্যর। আমি আবুলটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আমি বললাম, 'আবুল কে?'

'ওই রোগীটা। মাথায় ছিট আছে, তাই আবুল বললাম। সরি, স্যর। তবে কথা বললেই বুঝবেন। যদিও আমাকে কিছু বলে নাই, তবু এক নজর দেখলেই বুঝতে পারি। স্যরের হয়তো মনে আছে, মানুষ বাজানোই–'

'ওকে পাঠিয়ে দিন,' একটু চড়া গলায় বললাম আমি।

লোকটার চেহারায় বিশেষত্ব কিছু নেই। রুমে ঢুকে আমার সামনের চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়াল। আমি তাকে বসতে বললাম। সে রুমের চারদিকে চোখ বুলিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'ধন্যবাদ, স্যর, তবে আশা করছি আমাদের কথা আর কেউ শুনবে না।'

'না, শুনবে না।' আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম।

'ওই সনাতন হারামজাদাকে উঁকি মারতে নিষেধ করেন, আমি কিন্তু ওর কলজে চিবিয়ে খাব।'

'সনাতন বাবু,' আমি জোর গলায় বললাম, 'আপনি দরজার পাশ থেকে চলে যান।'

বাইরে থেকে দরজায় মৃদু লাথি মারল সনাতন।

আমি লোকটিকে বললাম, 'বসুন এবার। কী নাম আপনার? বয়স কত?'

লোকটি চেয়ার ধরে দাঁড়িয়েই থাকল। বলল, 'আমার নাম? কী হবে আমার নাম দিয়ে? মানুষ তো প্রতিনিয়ত তার নাম বদলাতে পারে, এবং বদলাচ্ছে। আর বয়স? কে বলতে পারে তার আসল বয়স কত?'

সনাতনের কথা আমার মনে পড়ল–'মাথায় ছিট আছে'। আমি একটু বিরক্তি প্রকাশ করে বললাম, 'ডাক্তারের কাছে এসে প্রথমে নাম আর বয়স বলতে হয়।'

লোকটা ঘোঁৎ করে শব্দ করল।

'মাফ করবেন, স্যর। আমি আসলে নাম বলতে চাইনি এ কারণে যে, আমাকে আপনি চেনেন না। আমি যে কোন একটা নাম বলতেই পারি, এবং আপনিও সেটা বিশ্বাস করতে বাধ্য। কিন্তু আপনি যদি আমাকে চিনতেন, কিংবা আমার কাছে জাতীয় পরিচয়পত্র থাকত, তাহলে অবশ্যই আমি আমার আসল নাম বলতাম। কারণ সেখানে লুকোচুরির কোন সুযোগ থাকত না। আর বয়সের কথা বলছেন? সত্যি বলছি, আমি আমার বয়স ভুলে গেছি। স্যর, সনাতন কিন্তু আবার এসে দরজায় কান-পাতছে। আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি ওর কলজেটা ছিঁড়ে এনে খেতে পারি। কলজে চেনেন, স্যর? মেডিকেল পরিভাষায় এর নাম হার্ট। মানে হৃৎপিণ্ড।'

'বাদ দিন,' রসিকতার সুরে বললাম আমি। 'সনাতন হচ্ছে তালপাতার সেপাই। ছোটখাট শুকনো মানুষ। ওর কলিজাও হবে এই এট্টুখানি, মুরগির কলিজার মত। খেয়ে মজা পাবেন না। তারচেয়ে আপনি বসুন। ধীরে-সুস্থে বলুন আপনার সমস্যাটা কী।'

'হুম, খেয়ে মজা পাব না।' মাথা নেড়ে বলল লোকটা। 'নইলে কসম খেয়ে ফেলতাম। ওর মাংস খেয়েও স্বাদ পাব না। সেই সকাল থেকে বসে আছি। খুব খিদে পেয়েছে।'

ওর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে আমি এটাকে আর রসিকতা ভাবতে পারলাম না। 'আপনি এসব কী বলছেন?'

লোকটা হেসে উঠল। এই প্রথম লক্ষ করলাম তার দাঁতগুলো গাছের শেকড়ের মত। আমার শরীর শির-শির করে উঠল।

'ভয় পাবেন না, স্যর, আপনার কোন ক্ষতি আমি করব না। শুধু এই অভিশপ্ত জীবন থেকে আপনি আমাকে মুক্তি দিন।' খুব নরম শোনাল লোকটার কণ্ঠ।

অস্বীকার করব না, আমি খুব অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। কী বলছে সে? আফ্রিকার কিছু উপজাতি রয়েছে তারা নরমাংসভোজী। মাঝে-মাঝে পত্রিকায় দু'একটি ঘটনার কথা পড়ি। কিন্তু সে সব বিদেশে। বাংলাদেশে একবার পড়েছিলাম খলিলুল্লাহ নামের এক লোক মৃত মানুষের কলিজা খেত কবর খুঁড়ে। আর এখন, আমার সামনের এই লোকটা নরমাংসভোজী ভাবতেই মনের অজান্তে কেঁপে উঠলাম।

'এটাই কি আপনার গোপন রোগ? এটি বলার জন্যই সকাল থেকে বসে আছেন? এর চিকিৎসা তো আমি করতে পারব না। এটি আপনার সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। মেন্টাল ডেভিয়েশন। আপনার উচিত ছিল একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো। তার কাছে যাওয়া।' আমি কিছুটা নার্ভাস গলায় বললাম।

'না।' কঠিন গলায় বলল লোকটা।

কুমিল্লায় সেবা ও প্রজাপতি প্রকাশন-এর গল্প, উপন্যাস, ওয়েস্টার্ন, ক্লাসিক, অনুবাদ, তিন গোয়েন্দা, কিশোর হরর, মাসুদ রানা ও যাবতীয় রিপ্রিন্ট বই বিক্রেতা।
হাসান ইমাম রেলওয়ে বুকস্টল, কুমিল্লা।
প্রো: মোঃ রুবেল ইমাম
মোবাইল: ০১৬৭১-৩৪৩৪১৭

'কী–না?'

'এটি আমার গোপন রোগ নয়।' লোকটি চেয়ার সরিয়ে আরেকটু সামনে এল। তার শরীর থেকে মাটির গন্ধ ভেসে এল।

'এটি আমার গোপন রোগ নয়,' পুনরাবৃত্তি করল সে। 'আপনি জীবিকা নির্বাহ করেন আপনার প্রয়োজনীয় খাবার খেয়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কী খান আপনি? ভাত, সবজি, মাছ, মাংস, ডাল? মাংস বলতে আমি গরু, খাসি বা মুরগির মাংস বুঝিয়েছি। সবই তেল, মশলা দিয়ে চমৎকার রান্না করা!'

আমি মৃদু মাথা নাড়লাম। 'গরুর মাংসটা আমি বেশি পছন্দ করি।'

লোকটা আরেক পা এগোল। 'কিন্তু নিয়তি আমার জন্য মানুষের মাংস নির্ধারণ করেছে, স্যর। সেই কোন্ আমল থেকে কোন কবরের মধ্যে আপনি কোন লাশের ছিটেফোঁটাও দেখবেন না, সব আমি খেয়ে সাবাড় করেছি।' একটু থামল সে। হাঁপাল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'কুচিয়ামোড়া থেকে সৈয়দপুর পর্যন্ত!'

আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঘাম ছুটল।

লোকটা বলল, 'নামটা আপনার খুব পরিচিত, জানি, স্যর। তৃষ্ণার্ত চোখে আপনি ওই সাইন বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা। আমি ওখানকার কবরগুলোর কথা বলছি। ওই কবরের মানুষগুলোই আমার খাদ্য। কোন দোষ নেই আমার। এটা নিয়তি নির্ধারিত। কিন্তু এখন আর আমার ভাল লাগে না।'

আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। ফিসফিস করে বললাম, 'কী চান আপনি? এখানে কেন এসেছেন?'

'ভয় পাবেন না, স্যর,' লোকটি বলল। 'আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না। আমি এসেছি আপনাকে নিতে। খুব ভাল লাগবে জায়গাটা। কেউ বিরক্ত করবে না আপনাকে। গত দু'শ' বছরে আমাকে কেউ বিরক্ত করেনি।'

আমি ফ্যালফ্যাল করে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা আরও এক পা এগোল। এবার তার শরীরের তীব্র গন্ধ পাচ্ছি আমি। কচুরিপানা পচে গেলে যেমন গন্ধ হয়, তেমনি গন্ধ।

'বেয়াদবি নেবেন না, স্যর,' বলল সে। 'চেয়ারে বসতে বলেছিলেন, বসিনি। আসলে বসার অবস্থা নেই আমার। শেষ কবে চেয়ারে বসেছি, মনেও নেই। শেষ দু'শ' বছর তো দাঁড়িয়েই আছি। কী বলব, শরীর বলতে আমার আর কিছুই নেই। পুরোটাই এখন গাছ।'

আমার চোখের সামনে সে তার পরনের পোশাক টেনে ছিঁড়ল।

'এদিকে তাকান, স্যর। দেখুন আমাকে।'

আমি অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে রইলাম।

'হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখুন!'

মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি হাত বাড়ালাম। সে বলল, 'এখন, কী নাম আমার? জানি না আমি এই বৃক্ষের কী নাম? শুধু জানি সে মানুষের মাংস খায়। কলজে খায়। এমন কোন কবর নেই যার মাটি খুঁড়ে সে লাশ খায়নি। হুমায়ূন আহমেদ বেঁচে থাকলে এবং আমার কথা জানতে পারলে নাম দিতেন আমার অচিনবৃক্ষ। আমি যাকে অভিশাপমুক্ত করেছিলাম, সেই প্রবীর সরকার, তিনিও আমাকে নাম বলতে পারেননি। সম্ভবত তিনি যাকে মুক্ত করেছিলেন সে তাঁকে নাম বলে যায়নি।'

হাঁপাতে লাগল লোকটা। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'বিদায়, স্যর। আপনার নতুন জীবনের জন্য আমার শুভ কামনা রইল। নবাব চেয়ারম্যান আজ অভিশাপমুক্ত হলো।'

আমি চেয়ারে ঢলে পড়লাম।

যখন জ্ঞান ফিরল, ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

দেখলাম সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

কলিংবেল টিপলাম, একই সাথে গলা চড়িয়ে ডাক দিলাম, 'সনাতন বাবু! সনাতন বাবু!!'

'জী, স্যর,' প্রায় দৌড়ে ভেতরে ঢুকল সনাতন।

'আপনি কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? রোগীরা সব কোথায়?' আমি রাগত স্বরে বললাম।

'আমি দু'বার এসে ফিরে গেছি। আপনি চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। দেখে এত মায়া হলো, তাই জাগাইনি আপনাকে। রোগীদের বলেছি স্যর খুব টায়ার্ড আজ। ওদেরকে কাল আসতে বলেছি। প্লিজ, স্যর, কষ্ট করে কাল সকাল-সকাল এসে রোগীগুলো দেখেন।

সিরিয়াল দিয়ে রেখেছি, একশ' বাইশ জন।'

আমি বললাম, 'ওই লোকটা কোথায়?'

সনাতন বলল, 'কোন্ লোক?'

আমি বললাম, 'ওই যে, যাকে দেখছিলাম। গোপন রোগ নিয়ে এসেছিল। আপনি দেখতে বললেন তাকে।'

সনাতন বলল, 'আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না, স্যর। আপনি কি ঢাকা ফিরবেন? নাকি আজ এখানে থাকবেন? খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে। আমাদের দোতলায়, স্যর, ভাল কেবিন আছে। আপনি রাতে ওখানে ঘুমোতে পারেন।'

'না, ঢাকা ফিরব। আমার ছোট মেয়েটা সফেদা খেতে চেয়েছে। শ্রীনগর বাজারে কি সফেদা পাওয়া যাবে?'

বাসায় ফিরতে-ফিরতে রাত ন'টা বেজে গেল। ফেরার সময় বাবুবাজার ব্রিজের ওপর অনেক জ্যাম ছিল। বাসায় ঢুকতেই আমার ছোট মেয়ে আমার হাত থেকে পলিথিনের ব্যাগটা নিতে-নিতে বলল, 'বাবা, তোমাকে সফেদা আনতে বলেছিলাম, তুমি আপেল নিয়ে এসেছ। জানো না, আপেলে ফর্মালিন দেয়া থাকে? আমি আপেল খাই না।'

আমি বললাম, 'ভুল হয়ে গেছে, মা, আমি কাল এনে দেব।'

আমার স্ত্রী বলল, 'তুমি কি গোসল করবে? খুব ঘেমে গেছ। আমি খাবার রেডি করছি। তুমি গোসল করে নাও।'

আমি বললাম, 'কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। আমি একটু ঘুমাব। খুব টায়ার্ড লাগছে।'

কাপড়-চোপড় না পাল্টেই শুয়ে পড়লাম আমি। আমার পাশে এসে শুল আমার সাড়ে তিন বছরের ছোট মেয়ে।

আমাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাবা, আমি জানি তুমি কোথায় গিয়েছিলে।'

আমি ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বললাম, 'কোথায়?'

সে বলল, 'শ্রীনগর।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, শ্রীনগর।'

সে বলল, 'বাবা, তুমি আজ কটা রোগী দেখেছ?'

আমি আর উত্তর দিতে পারলাম না। তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল।

প্রথমে বুঝতে পারলাম না কোথায় আছি।

ধীরে-ধীরে ঘরের অন্ধকার চোখে সয়ে এল।

বিছানা থেকে নামলাম।

আমার স্ত্রী ও মেয়ে ঘুমাচ্ছে।

আলো জ্বেলে বাথরুমে ঢুকলাম।

চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে আয়নার দিকে তাকালাম।

দেখতে লাগলাম নিজেকে।

আমি কি আজ পুরোটাই দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম?

আমার অবচেতন মন একটি অদ্ভুত গল্প সাজিয়ে নিয়েছিল? কেমন যেন দ্বিধা জাগল মনে।

আয়নায় আমি আমার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কতক্ষণ জানি না, হঠাৎ টের পেলাম আমার মুখের বাঁ পাশটা ফেটে গেল। আমি চিৎকার করতে যাব, মুখ থেকে গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত। দ্রুত বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। রাত কত হবে জানি না। নিচে রাস্তায় নেমে এসে আমি দৌড়তে শুরু করলাম।

দৌড়চ্ছি আমি।

এমন সজোরে জীবনে কোনদিন দৌড়ইনি।

যেন মাটিতে পা পড়ছে না আমার।

শূন্যে উড়ে চলেছি।

আমি এখনও স্বপ্নের ভেতর কি না তা-ও বুঝতে পারছি না। আমার হাতের ত্বক ফেটে যাচ্ছে, মাংস ফেটে যাচ্ছে। রক্ত ঝরছে।

তীব্র যন্ত্রণায় যেন আগুন ধরে গেছে আমার শরীরে। যখন হোঁচট খেয়ে পড়লাম, চাঁদের আলোয় দেখলাম সাইনবোর্ডটা। ঝিকমিক করছে।

জামগাছে ঝোলানো।

নিতান্তই সাধারণ সাইনবোর্ড।

পড়লাম ওটা।

'কুচিয়ামোড়া হইতে সৈয়দপুর
দূরত্ব ৫ কিলোমিটার
সৌজন্যে মিজান ডাক্তার।' ■

সেক্স-সিম্বল হিসাবে চিয়ারলিডিংকে প্রথম উপস্থাপন করে 'ডালাস কাউবয়স চিয়ারলিডারস'। খোলামেলা পোশাক আর উত্তেজক নাচের মুদ্রা দিয়ে আমেরিকান আইকনে পরিণত হয় দলটি।

চিয়ারলিডার: সুড়সুড়ির বিনোদন

অন্বেষা বড়ুয়া

১৮৬০ সালের কথা। একদল ব্রিটিশ ছাত্রের তখন শৃঙ্খলার নামে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কড়া নিয়ম-কানুনের জাঁতাকলে পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত রীতিমত। হাঁসফাঁস সে অবস্থা থেকে দু'দণ্ড স্বস্তির শ্বাস ফেলতে ঠিক করল তারা, কিছুটা সময় সমবেতভাবে নাচ-গান, হই-হুল্লোড়ে কাটাবে। কর্তৃপক্ষ যাতে চোখ রাঙানোর সুযোগ না পায়, সেজন্য ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার সময় প্রিয় দলকে সমর্থন জোগাতে কাজটা করার সিদ্ধান্ত হলো। চিয়ারলিডিং-এর শুরুটা এভাবেই। ধারণাটা এতই জনপ্রিয়তা পায় যে, দ্রুতই তা সাগর পেরিয়ে পৌঁছে যায় আমেরিকায়, আর সেখানেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়।

চিয়ারলিডিং কী? সাধারণভাবে, দলগত শারীরিক কসরত। সেটা খেলোয়াড় ও দর্শকদের আনন্দ দেয়ার উদ্দেশ্যে হতে পারে, আবার নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার খাতিরেও হতে পারে। সাধারণত এক থেকে তিন মিনিট স্থায়ী হয় এক-একটি কসরত। নির্দিষ্ট কিছু শ্লোগান বাড়তি উন্মাদনা যোগ করে এতে।

চিয়ারলিডিং-এর প্রথম কাঠামোগত রূপটি আমরা দেখি ১৮৭৭ সালে আমেরিকার প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব

চিয়ারলিডিং দলের নাম ছিল: প্রিন্সটন চিয়ার। বেসবল, ফুটবল সহ বিভিন্ন খেলায় খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিত তারা। প্রিন্সটন-গ্র্যাজুয়েট টমাস পিবলস-এর মাধ্যমে ১৮৮৪ সালে ইউনিভার্সিটি অভ মিনেসোটায় গিয়ে পৌঁছে চিয়ারলিডিং। অবশ্য 'চিয়ারলিডার' শব্দবন্ধটির প্রচলন আরও পরে, ১৮৯৭ সালে।

১৯২৩ সালে চিয়ারলিডিং-এ মেয়েদের অংশগ্রহণের অনুমোদন দেয় মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়। তার আগপর্যন্ত পুরুষদের একচেটিয়া ছিল এটি। অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও আস্তে-আস্তে মিনেসোটাকে অনুসরণ করতে শুরু করে। তবে সবুজ সঙ্কেত পেলেও চিয়ারলিডিং-এ নারী-উপস্থিতি ছিল একেবারেই নগণ্য। অবস্থার পরিবর্তন ঘটল উনিশশো চল্লিশের দশকে। দলে-দলে পুরুষেরা পাড়ি জমাচ্ছে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক হিসাবে নাম লেখাতে। এ অবস্থায় পুরুষ চিয়ারলিডারদের জায়গা নিয়ে নিল নারীরা। সে-ই শুরু। সর্বশেষ এক পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, বিশ্ব জুড়ে চিয়ারলিডারদের সাতানব্বুই শতাংশই এখন মেয়ে।

পেশাদারিত্বের সূচনা

১৯৪৮ সালে ডালাসের সাউদার্ন মেথডিস্ট ইউনিভার্সিটি প্রথমবারের মত জাতীয় চিয়ারলিডার অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে। শুরুতে এর সদস্য-সংখ্যা ছিল বায়ান্ন। সবাই-ই মেয়ে। চিয়ারলিডারদের নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরার শুরুটা তাদের হাত ধরেই। ষাটের দশক থেকে দেশ জুড়ে কর্মশালা পরিচালনা শুরু করে এ সংগঠন।

১৯৫০ সালে পেশাদার চিয়ারলিডিং-এর সূচনা। চিয়ারলিডার-দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রথম নমুনা পরিলক্ষিত হয় ১৯৬৭ সালে। 'টপ টেন কলেজ চিয়ারলিডিং স্কোয়াডস' এবং 'চিয়ারলিডার অল আমেরিকা' নামে দুটি খেতাব প্রবর্তন করে ইন্টারন্যাশনাল চিয়ারলিডিং ফাউণ্ডেশন। ১৯৭৮ সালে প্রতিযোগিতামূলক চিয়ারলিডিং-এর প্রথম সম্প্রচার করে আমেরিকার সিবিএস টেলিভিশন।

সেক্স-সিম্বল হিসাবে চিয়ারলিডিংকে প্রথম উপস্থাপন করে 'ডালাস কাউবয়স চিয়ারলিডারস'। খোলামেলা পোশাক আর উত্তেজক নাচের মুদ্রা দিয়ে আমেরিকান আইকনে পরিণত হয় দলটি। এখন তো পেশাদার চিয়ারলিডিং-এর পূর্বশর্তই হচ্ছে, যৌনাবেদন থাকতে হবে চেহারায়।

রকমফের

মিডল স্কুল, হাই স্কুল ও কলেজ—এই তিনটি হচ্ছে স্কুল পর্যায়ের মার্কিন চিয়ারলিডিং টিম। এরা পেশাদার নয়, তবে পেশাদারিত্বের হাতেখড়ি এখান থেকেই। চিয়ারলিডারদের সচরাচর যার-যার স্কুলের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কলেজ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিল সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এরা। এ ছাড়া রয়েছে

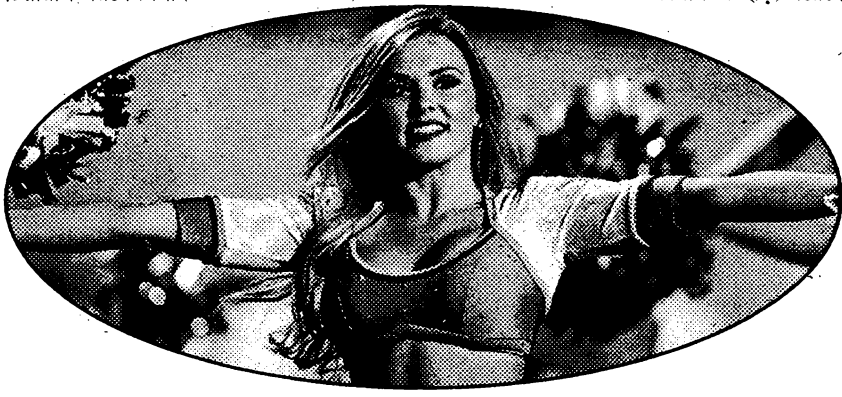

ইউথ লিগ বা অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন এবং স্কুল-স্টার টিম। আর পুরোপুরি পেশাদার চিয়ারলিডাররা তো রয়েছেই।

ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চীন, কলম্বিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, নেদারল্যাণ্ডস ও নিউজিল্যাণ্ডে জনপ্রিয় শারীরিক এই প্রদর্শনী। প্রায় এক লক্ষ চিয়ারলিডার ছড়িয়ে আছে এসব দেশে। আর এক আমেরিকাতেই সংখ্যাটা পনেরো লাখ! ফুটবল-বেসবল ছাড়া আর যেসব খেলায় চিয়ারলিডারদের দেখা যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বাস্কেটবল, ভলিবল, রেসলিং, হকি, ইত্যাদি। ২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত টোয়েন্টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপ আসরের মধ্য দিয়ে ক্রিকেটেও চিয়ারলিডারদের আগমন। বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে ১৯৯৭ সাল থেকে চিয়ারলিডিংকে খেলা হিসাবে সম্প্রচার করে আসছে ইএসপিএন চ্যানেল। মজার ব্যাপার হলো, বিশ্ব-ক্রীড়ার সবচেয়ে বড় আসর অলিম্পিকে চিয়ারলিডার-দল নেই কোনও।

প্রেক্ষাপট: উপমহাদেশ

ভারতীয় উপমহাদেশে খেলাধুলার সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে ক্রিকেট। বাণিজ্যের এই লক্ষ্মীটিকে তুষ্ট করতে আইপিএল, বিপিএল হয়ে বাংলাদেশেও আবির্ভাব ঘটেছে পেশাদার এই মনোরঞ্জনকারীদের। cheerleader.com নামে একটি ওয়েবসাইট রয়েছে। মূলত চিয়ারলিডারদের একই ছাতার নিচে আনার উদ্দেশ্যে সাইটটির যাত্রা। আইপিএল-এর অনেক দলই এখান থেকে চিয়ারলিডার নির্বাচন করছে।

উপমহাদেশের রক্ষণশীলতার সঙ্গে চিয়ারলিডিং যায় কি না, বিতর্ক রয়েছে এ নিয়ে। হাজার-হাজার দর্শকের সামনে অর্ধনগ্ন একদল তরুণীর অবাধ দেহ-প্রদর্শনী, টিভি ক্যামেরার ফোকাস–কিছুটা হলেও তো কামনার আগুনকে উসকে দেয়। তার উপর হালে প্রকাশ পাচ্ছে অন্তরালের অনেক কেচ্ছাকাহিনি। আইপিএল-এ চিয়ারলিডিং করতে আসা এক মেয়ে অভিযোগের আঙুল তুলেছে খোদ খেলোয়াড়দের দিকে। তার ভাষায়: পুরোটা সময় মানুষ 'চলমান পর্নো' হিসাবেই দেখেছে আমাদের। ■

প্রকাশিত হয়েছে
অনুবাদ
মেরাল ওকায়-এর কাহিনি অবলম্বনে
সুলতান সুলেমান
রূপান্তর: ডিউক জন

অটোমান সাম্রাজ্যের দশম ও সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সুলতান ছিলেন সুলেমান খান। বিচিত্র তাঁর জীবন। পূর্বসূরিদের চাইতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক–সব দিক থেকে ষোলো শতকের ইউরোপে হয়ে ওঠেন তিনি অপ্রতিরোধ্য। এ ছাড়া সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয় তাঁর শাসনামলে। হেরেমের দাসী আলেক্সান্দ্রাকে সুলতানার মর্যাদা দেয়ার মাধ্যমে অনন্য নজির সৃষ্টি করেন সুলেমান। এর ফলে ভেঙে যায় দুই শতাব্দীর অটোমান ঐতিহ্য। উপপত্নী থেকে বৈধ স্ত্রীর সম্মান পেয়ে অন্দরমহলের অবগুণ্ঠন ছেড়ে বেরিয়ে আসেন আলেক্সান্দ্রা... পরিণত হন সাম্রাজ্যের অন্যতম চালিকা শক্তিতে...

রক্ত, প্রেম, রাজনীতি আর প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের অসামান্য এ আখ্যান গায়ে কাঁটা দেয়ার মতোই রোমাঞ্চকর!

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন উপন্যাসিকা

জালিয়াত

মোঃ খালেদুল ইসলাম খান

এক

পুবের মত ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট-ছোট গ্রামগুলো এখানে অনুপস্থিত, এরই নাম বুনো পশ্চিম। এখানে রয়েছে ছায়াহীন বিস্তীর্ণ ঊষর প্রান্তর। মাথার উপর ক্লান্তিহীন তাপ ঢালছে সূর্য। বিরান এই অঞ্চলে মানুষের দেখা সহজে না মিললেও বিপদের দেখা মেলে পদে-পদে। কখন যে বিপদ ঘাড়ে এসে পড়বে, তা কেবল ঈশ্বরই বলতে পারে। ফলে অযাচিত বিপদ এড়াতে প্রতিটি মুহূর্ত সাবধানে থাকতে হয় ট্রেইলে চলা রাইডারদের।

কিন্তু এত সাবধান থেকেও লাভ হয়নি রাইডারের। ওর ঘোড়াটা খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছে। নিচু ঘাসজমি পেরিয়ে পাথুরে টিলার মাঝ দিয়ে চলছিল, তখনই খুলে গেল ঘোড়াটার নাল। রাইডারের কপাল ভাল, উঁচু টিলা থেকে নজরে এসেছে আধমাইল দূরের শহরটা।

টিলা থেকে পুরো শহরের টপোগ্রাফি দেখছে রাইডার। খুব একটা বড় নয় শহরটা। লম্বায় বড়জোর মাইল খানেক। একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রধান রাস্তাটাকে আড়াআড়ি ছেদ করেছে ছোট কয়েকটা রাস্তা, গলি ও উপগলি।

তবে ওসব দেখার মুডে নেই রাইডার, ওর চাই কামারশালা। শহরের দিকে হাঁটিয়ে নিচ্ছে ঘোড়াটাকে। দাঁড়কাকের পালকের মত চকচকে কালো ঘোড়াটার নামও তেমন— র‍্যাভেন।

যখন শহরে ঢুকল রাইডার, ততক্ষণে গড়িয়ে গেছে দুপুর। এবারও কপাল ভাল আরোহীর, শহরে ঢোকার মুখেই চোখে পড়ল দোকানটা— গ্র্যাঞ্জি কামার-ঘর। সম্ভবত দেশপ্রেম প্রবল কামারের। নিজ নাম জাহির না করে শহরের নামেই নাম দিয়েছে দোকানের।

খোঁড়া র‍্যাভেনকে নিয়ে দেশপ্রেমিকের সামনে থামল আরোহী।

'তোমার ঘোড়ার জুতো তৈরির জন্য কাল সকাল ছাড়া সময় হবে না,' সমস্যা শুনে বলল কামার।

মনে-মনে খুশি রাইডার। র‍্যাভেনের নাল লাগাতে এখানে বসে থাকতে হবে না। এমনিতেই প্রচণ্ড ক্লান্ত সে। চলার পথে শুকনো জার্কি খেয়েছে, কিন্তু প্রাণটা এখন আনচান করছে ড্রিংকের জন্য।

'তুমি কি কাজ শেষে ঘোড়াটাকে রাতের জন্য স্টেবলে রাখতে পারবে? সকালে এসে তোমার পাওনা বুঝিয়ে দিতাম,' বলল রাইডার।

চোখ সরু হলো কামারের। 'কীভাবে নিশ্চিত হব, কাল সকালে তোমার দেখা পাব, স্ট্রেঞ্জার?'

কথা শুনে অবাক দৃষ্টিতে কামারকে দেখল যুবক। ভাবখানা এমন, এই স্বর্গ ছেড়ে মানুষ কীভাবে ভেগে যেতে পারে?

'তুমি কি এরকম ঘোড়া ফেলে হাওয়া হয়ে যেতে?' কামারকে পাল্টা প্রশ্ন করল আগন্তুক।

'বুঝতে পেরেছি কী বলেছ,' চওড়া হাসি দিল কামার। 'ঘোড়াটা আসলেই দেখার মত। তা কত চাও ওটার জন্য?'

'তোমার সবকিছুর বিনিময়েও না,' বলল আগন্তুক, 'নিশ্চয় এখানে থাকার হোটেল আছে?' ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল ব্যাগ, রাইফেল, ব্ল্যাঙ্কেট নিল যুবক।

নড করল কামার। 'সামনের চৌরাস্তার ডানে প্রথম বিল্ডিংটাই হোটেল। চোখে না পড়ার কারণ নেই। অবশ্য ইচ্ছা করে না দেখলে, ভিন্ন কথা।'

এ ধরনের গর্তে আগেও থেকেছি, মনে-মনে বলল আগন্তুক। 'কাছাকাছি খাওয়ার জায়গা?'

'গ্র্যাঞ্জিতে ভাল খাওয়ার জায়গা,' দাড়ির জঙ্গলে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল কামার, 'তুমি কি ধর্ম-প্রাণ, স্ট্রেঞ্জার?'

শ্রাগ করল আগন্তুক। 'কেন?'

'ধার্মিক হলে উপবাস করতে বলতাম,'

'রেক্স হার্বার্টের নাম শুনে তো প্যান্ট ভেজাবার অবস্থা হয়েছিল,' বলল রায়না, 'আবার ফিরলে কেন, ডেভিলকে নিতে ভুলে গিয়েছিলে? কাপুরুষ, জালিয়াত কোথাকার!'

বলল কামার, 'হোটেল থেকে বেরোলে দুটো ঘর পরেই ডোনার কিচেন। ওখানে খেলে খুন হয়ে যেতে পারো, তাই কাজের মজুরিটা আগেই চেয়ে নেব কি না ভাবছি।'

'তেমন কিছু ঘটলে তোমার হয়ে যাবে র‍্যাভেন,' হাসিমুখে কামারকে আশ্বস্ত করল আগন্তুক।

'ভাল, স্ট্রেঞ্জার,' বিটকেল হাসি দিল কামার। 'তোমার ঘোড়াটা চার্লির লিভারিতে রাখব। স্যাডলটাও ওখানে যত্নে থাকবে।'

মাল-সামান নামানো হয়েছে, কথা শেষ করে হোটেলের উদ্দেশে হাঁটা দিল আগন্তুক।

হোটেলের কেরানি অত্যন্ত তৎপর। দেরি না করে রুমের ব্যবস্থা করল। মালামাল ঘরে রেখে বেরিয়ে এল আগন্তুক। খিদে নেই, সুতরাং কামারের কথা মত আপাতত ডোনার কিচেনে গিয়ে খুন হতে হবে না। কিন্তু ট্রেইলের ধুলোয় গলা খরখর করছে। এক বোতল সারসাপ্যারিলা না হলে চলছে না।

কেবল একটা জায়গাতেই ওটা মিলবে।

স্যালুন।

মা বেঁচে থাকলে নিষেধ করত স্যালুনে ঢুকতে। তার ধারণা ছিল, স্যালুন মানেই ঝামেলা। ওই ধারণাটাকে একেবারে অমূলক বলা যাবে না, তবে বেলা একটায় স্যালুনে কোনও ঝামেলার আশঙ্কা করছে না আগন্তুক।

মাঝ দুপুরে বিরান প্রান্তর হয়ে আছে স্যালুনটা। হাতে কোনও কাজ না থাকায় তোয়ালে দিয়ে ঘষে-ঘষে কাঁচের গ্লাসের চামড়া তুলতে চাইছে বারটেণ্ডার। ব্যাটউইং ঠেলে স্যালুনে ঢুকে কাউন্টারের সামনে থামল আগন্তুক।

বেচারা গ্লাসকে রেহাই দিয়ে খদ্দেরের দিকে মনোযোগ দিল বারটেণ্ডার। 'কী দেব, স্ট্রেঞ্জার?'

'সারসাপ্যারিলা।' কাউন্টারের ওপর একটা কয়েন রাখল আগন্তুক।

তাকে দেখে শক্তপাল্লা ভেবেছিল বারটেণ্ডার, সবচেয়ে কড়া হুইস্কি চাইবে, নিদেন পক্ষে বিয়ার, কিন্তু সারসাপ্যারিলার মত কোমল পানীয় চাওয়ায় মনে মনে আছাড় খেল সে। অবশ্য হুকুম তামিল করতে দেরি করল না। কাউন্টারের নিচের তাক থেকে বোতল বের করে এগিয়ে দিল আগন্তুকের দিকে। সারসাপ্যারিলার বোতলটা হাতে নিয়ে ঘুরল আগন্তুক। একটা মাত্র টেবিলে পোকার খেলছে চারজন। হঠাৎ এক খেলোয়াড় চেয়ার ছাড়ল। 'আমার পকেট খালি হয়ে গেছে, বয়েজ। পয়সা জোগাড় না করে আর খেলতে পারব না।' নিজে তো নিঃস্ব হয়েছেই, বাকি তিন খেলোয়াড়কেও অকূলে ভাসিয়ে বেরিয়ে গেল দুস্থ খেলোয়াড়।

'হেই, স্ট্রেঞ্জার, চলবে নাকি এক রাউণ্ড,' ওকে দেখে চিৎকার করে বলল অকূলে পড়া এক খেলোয়াড়।

ভর দুপুরে এমনিতেও কোনও কাজ নেই আগন্তুকের। বোতলটা হাতে নিয়ে এগোল পোকার টেবিলের দিকে। তবে দ্বন্দ্ব চলছে মনে। একাংশ নিষেধ করছে, অন্য অংশে ইবলিস উৎসাহ দিচ্ছে খেলার জন্য। শেষ পর্যন্ত একটা আপোষ রফায় পৌঁছল আগন্তুক। 'খেলতে পারি, তবে এক শর্তে।'

কথা শুনে ওর দিকে তাকাল তিনজনই।

তাদের দু'জনকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সাধারণ কাউবয়। আগন্তুকের নজর কাড়ল তৃতীয়জন। পরিপাটি পোশাক হলেও ঠাণ্ডা নীল চোখ জানাচ্ছে, সে একজন পেশাদার জোচ্চোর।

'কী শর্ত?' জিজ্ঞেস করল এক কাউবয়।

'হারি বা জিতি, ঠিক পাঁচটায় উঠে পড়ব।' পকেট থেকে ঘড়িটা বের করল আগন্তুক। 'আমি জিতলেও কেউ বলতে পারবে না যে আরও দু-এক দান খেলে যাও।'

'ভাবছ কেন যে জিতবে?' জিজ্ঞেস করল জুয়াড়ি।

'জিতব তা বলছি না।' শ্রাগ করল আগন্তুক। 'তবে দোকান খোলার আগেই ব্যবসার নিয়ম ঠিক করে নেয়া ভাল, তাই না?'

পরস্পরের দিকে তাকাল তিন খেলোয়াড়। কারও মধ্যেই আপত্তির লক্ষণ দেখা গেল না। 'ঠিক আছে, তা-ই হবে।' একযোগে মন্তব্য করল

তারা।

চেয়ার টেনে বসল আগন্তুক। ঘড়িটা রাখল টেবিলের উপর।

'আমার নাম টম, আর ও জেরি,' নিজেদের পরিচয় দিল কাউবয়দের একজন। 'আর ও হচ্ছে ট্রাম্প,' নীল চোখের জুয়াড়িকে দেখিয়ে বলল টম।

'আমি জেসন,' মুখে চলে আসায় এ নামেই নিজেকে চালিয়ে দিল আগন্তুক।

'আমরা পোকার খেলছিলাম। আপত্তি নেই তো?' বলল ট্রাম্প।

আপত্তি নেই জেসনের। পাঁচ কার্ডের এই খেলাটা ওর খুবই প্রিয়। ছোটবেলায় বাবার কাছে শিখেছে। বিয়ের আগে নামকরা পোকার খেলোয়াড় ছিল ওর বাবা। বিয়ের পর মায়ের দাবড়ানিতে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিল খেলাটা। কিন্তু যত্ন করে শিখিয়েছে ছেলেকে। শীতের রাতে যখন করার কিছুই থাকত না, ম্যাচের কাঠি দিয়ে বাপ-বেটা পোকার খেলত। মা তখনও একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি করতে চেয়েছিল, কিন্তু বাধা দিয়ে বাবা বলেছিল, কোনও শিক্ষাই ফেলনা নয়। কোনও একদিন হয়তো কাজে লাগতে পারে।

যেমন আজ কাজে লেগে গেল শিক্ষাটা।

অনেকক্ষণ পর 'পাঁচটা বেজে গেছে বয়েজ,' ঘড়িটা পকেটে ঢুকিয়ে বলল জেসন। তিনজনের পকেটের দেড়শ' ডলার এখন ওর পকেটে। 'ভদ্রলোকের এক কথা, জানো নিশ্চয়?'

গুঙিয়ে উঠল দুই কাউবয়। গোঙানো ছাড়া আর কিছু করারও নেই ওদের। তবে ট্রাম্পের কথা আলাদা। নরকের জল্লাদের মত শীতল চোখে দেখছে জেসনকে। একই দৃষ্টি ওকে ফিরিয়ে দিল জেসন।

ফুরফুরে মেজাজে স্যালুন থেকে বেরোল ও। দেড়শ' ডলার মানে একজন সাধারণ কাউবয়ের প্রায় ছয় মাসের বেতন। অথচ টাকাটা আয় করেছে মাত্র চারঘণ্টায়। জার্কি পেটের ভেতর শেষ, সুতরাং চাগিয়ে উঠেছে খিদে। ডোনার কিচেনের দিকে রওনা হলো জেসন, খুন হওয়ার জন্য।

সকাল হলো কোনও ঝামেলা ছাড়াই। ঘুম থেকে উঠে স্বর্গে পৌঁছে যায়নি, বেঁচে আছে বুঝতে পেরে, কামারের উদ্দেশে মাঝারি মানের একটা গালি ঝাড়ল জেসন। ডোনার রান্না ভাল, এ কথা বলবে না চরম মিথ্যুকও, তবে এরচেয়েও অখাদ্য খাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে ওর।

গোছগাছ সেরে বেরোল হোটেল থেকে। নির্ঝঞ্ঝাটে লেনদেন চুকাল হসলার ও কামারের সঙ্গে। প্রয়োজনীয় সাপ্লাই নিয়ে বেরিয়ে এল জেনারেল স্টোর থেকে। এবার র‍্যাভেনের পিঠে ওগুলো বেঁধে বেরিয়ে পড়বে গ্র্যাণ্ডি-ছেড়ে, এমন সময় বাধল ঝঞ্ঝাটটা।

বাঁধাছাঁদা শেষ করে এনেছে, তখনই কর্কশ এক কণ্ঠ শুনে ঘুরল জেসন। 'গতকাল জেতা টাকাটা আমাকে জেতার সুযোগ না দিয়ে নিশ্চয় শহর ছাড়ার প্ল্যান করছ না, মিস্টার?' শীতল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল জুয়াড়ি ট্রাম্প।

'আমি তো জানতাম পোকার পুরুষমানুষের খেলা,' জবাব দিল জেসন, 'হেরে গিয়ে এখন নাকিকান্না জুড়বে, তা ধারণা করিনি।'

ট্রাম্পের ধারণা ছিল ওর কথায় ভড়কে যাবে জেসন। উল্টো ওর পুরুষত্ব ধরে টান দেয়ায় মনে-মনে নাখোশ হলো। 'হারার জন্য দুঃখ নেই, মিস্টার,' কিছুটা সামলে নিয়ে বলল ট্রাম্প, 'তবে কেউ জালিয়াতি করে জিতে যাবে, এটা কিছুতেই হতে দেব না।'

আশপাশে জমে গেছে ছোটখাট ভিড়। সেদিকে চেয়ে র‍্যাভেনের পিঠে হেলান দিল জেসন। 'দেখ, মিস্টার,' বলল, 'পোকারে কীভাবে জালিয়াতি করা যায় তা আমার জানা নেই। আর সেটাকে সমর্থনও করি না। সহজ খেলায় জিতেছি। টাকার জন্য যদি শোক উথলে ওঠে, অন্য কারও কাঁধে মাথা রেখে কাঁদো, আমাকে বিরক্ত করতে এসো না।'

ফিসফিসানির মাত্রা বাড়ল জনতার ভিড়ে। ট্রাম্পের চোখ জ্বলে উঠেছে আক্রোশে। এর

আগে বরফকে এত তাড়াতাড়ি আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হতে দেখেনি জেসন। 'ভবঘুরে ভিক্ষুক!' হিসহিসিয়ে বলল ট্রাম্প, 'যা বলেছ, সেজন্য তোমাকে মাফ করে দেব, যদি গতকাল জালিয়াতি করে যা জিতেছ, তা সুদসহ ফেরত দাও।'

এতক্ষণে ক্ষুব্ধ হলো জেসন। ভবঘুরে, ভিক্ষুক বলায় তেমন কিছু মনে করেনি, এরচেয়েও খারাপ কথা শুনেছে জীবনে। কিন্তু জালিয়াত কথাটায় ওর ঘোর আপত্তি। 'অ্যাই, ঘোড়ার নাদি!' কড়া স্বরে বলল ও, 'যে গর্ত থেকে বেরিয়েছ, হামাগুড়ি দিয়ে ওখানে ঢুকছ না কেন? সেক্ষেত্রে শান্তি নষ্ট না করে শহর ছাড়ব।'

জনতার মাঝে শোরগোল উঠল। কেউ একজন গলা একটু চড়িয়ে জেসনকে সতর্ক করল: 'মিস্টার, জানো কার সঙ্গে কথা বলছ? ও হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প।'

হুম্‌ম্! এই তা হলে ব্যাপার, মনে-মনে ভাবল জেসন। সাদা লেবাসের নিচে লাল জাঙ্গিয়া। মিসিসিপির এই পাড়ে তো বটেই, ওই পাড়েও কুখ্যাত এই মড়াখেকো। কেউ নাকি পাত্তা পায় না এই ফাস্টগানের কাছে। গুজব আছে হার্ডিন, থম্পসন, মাস্টারসন ভাইয়েরা, এমন কী ওয়াইল্ড বিলও নাকি ওকে সমঝে চলে। তবে গুজবের তো আর আগা-পাছা নেই। ঘাসকেও বটগাছ বানিয়ে ফেলে।

তবে ট্রাম্প সম্পর্কে জানে জেসন। একেবারে বাতিলের খাতায় ফেলা যাবে না ওকে। ফেয়ার আর আনফেয়ার ফাইট মিলে ডজন দুয়েক দাগ কাটা আছে ওর সিক্সগানে। তবে সে চিন্তা করে মগজকে প্যারালাইস করার মানে নেই। সময়মত প্রতিরোধ না করার কারণেই এই হারামজাদারা মাথায় চড়ার সাহস পায়। 'ট্রাম্প হোক আর র‍্যাটলস্নেক হোক, সাপ তো সাপই,' বক্তাকে শুনিয়ে বল্‌ল জেসন।

রঙ বদলানো গিরগিটির মত চেহারা লাল রঙ ধরল ট্রাম্পের। 'মিস্টার, এই মাত্র বুট হিলের টিকেট নিশ্চিত করলে,' বরফশীতল কণ্ঠে বলল জুয়াড়ি। এক ঝটকায় দু'হাত কোমরের কাছে চলে গেল। ডানহাত বাঁকা হয়ে হোলস্টারের কাছে ঘোরাফেরা করছে। 'ড্র করার জন্য তৈরি হও, দেখি ড্রতেও তুমি পোকারের মত কি না।'

'যদি ড্র না করি?' জানতে চাইল জেসন, 'গোটা শহরের সবার সামনে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবে?'

'করলেই বা কী, তুমিই প্রথম না,' কর্কশ স্বরে বলল ট্রাম্প। 'তোমার ধারণা, শেরিফ আমাকে আটকে রাখার সাহস পাবে?'

কথাটা সম্ভবত ঠিক, এই শহরে ওকে বাধা দেয়ার মুরোদ নেই কারও। যা খুশি করে পার পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এবার ভুল লোকের সঙ্গে টক্কর দিতে এসেছে। ট্রাম্পের কাহিনিকে উপন্যাস তৈরির ইচ্ছা নেই জেসনের। একই সঙ্গে নিজের জীবনকে ছোট গল্প বানাতেও নারাজ ও। বুলেটের ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালানো ওর ধাতে নেই। তবে চায় না বুলেটবৃষ্টির মাঝে পড়ুক ওর ঘোড়াটা। প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাম্প। ধীরে-ধীরে এগোল ও। র‍্যাভেনকে সরিয়ে দিল গুলির আওতা থেকে।

'ঠিক আছে, ট্রাম্প। সাহস থাকলে কাছে এসো। পাওনা নিয়ে নাও।' জেসনের হাত এখনও হোলস্টার থেকে অনেক দূরে। আচরণে ড্র করার কোনও লক্ষণ নেই।

'জাহান্নামে যাও!' ত্যক্ত কণ্ঠে বলল ট্রাম্প, 'তোমার লাশ থেকে ওটা বুঝে নেব। তিন পর্যন্ত গুনব। এরমধ্যে হোলস্টারে হাত দাও বা না দাও। এক... দুই...' তিন বলার আগেই হোলস্টারে ছোবল দিল জুয়াড়ি।

জীবনের শেষ ড্রতেও ব্যর্থ চেষ্টা করেছে জালিয়াতির।

দুই

পাইন ভ্যালি শহরের পরিস্থিতি নাকি খুব খারাপ, আর এসবের কেন্দ্রে রয়েছে ওর পরিবার—শোনা খবরটায় মন খারাপ রায়না হেণ্ডারসনের বিশেষ করে ওর বাবার কথা শুনে। কারণ এই পুরো ঘটনার পিছনে ওর বাবার বিশাল ভূমিকা রয়েছে।

নর্দার্ন ভ্যালির এক চমৎকার শহর পাইন ভ্যালি। পাইনে ছাওয়া চূড়াগুলোর কোনও কোনওটা সারাবছর ঢাকা থাকে বরফে। ওর জীবনের পুরো বাইশটা বছর কেটেছে এখানে। বন্ধু, স্বজনদের সবাই এখানে। স্বজন বলতে বাবা ও এক চাচা। ওদের ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না ও।

অথচ প্রতিনিয়ত বাড়ছে বিপদের মাত্রা। আর এর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে ওর বাবা। যে-কোনও মুহূর্তে শুরু হবে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। উদ্বেগ বাড়ছে রায়নার। রেঞ্জ ওঅর শুরু হলে কেউই নিরাপদ থাকবে না। যদি ওর বাবা অ্যাডাম হেণ্ডারসনের কিছু হয়ে যায়, কে নেবে রকিং এ টি'র দায়িত্ব? গর্ডন রাইকার্ড যেহেতু পুরো ভ্যালির দখল চাইছে, কারও জীবন নিরাপদ থাকবে না। নিশ্চয় এ ভাবনা খেলছে ওর বাবার মাথায়ও।

দু-একটা ছোটখাট আউটফিট বাদ দিলে পুরো ভ্যালিই দখল করে রেখেছে বিশাল দুই ক্যাটল স্প্রেড। প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে হেণ্ডারসনের রকিং এ টি, বাকিটার বেশিরভাগ গর্ডন রাইকার্ডের বার জি আর রানশ। যদিও কারোরই আইনগত কোনও বৈধতা নেই। আগে আসার কারণে দখলে নিয়েছে জায়গার। পঁচিশ বছর আগে রানশ দুটোর যাত্রা শুরু হয়েছিল। এক ইঞ্চি জমির জন্যও কেউ ক্লেইম ফাইল করেনি। আঠারো শতকের বুনো পশ্চিমে এটা অবশ্য সহজ ব্যাপার।

ভাগ্যান্বেষী হেণ্ডারসন আর রাইকার্ড দুই শকেরও আগে এখানে এসেছে শ'খানেক বাছুর সঙ্গে নিয়ে। একসময় পুরো জায়গাটাই হয়ে গেছে তাদের। ভাগ করে নিয়েছিল এই এলাকা। ধীরে-ধীরে পরিণত হয়েছে ধনী রানশারে। তখনও অবশ্য ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব।

বছর তিনেক আগে থেকে তিক্ত হতে থাকল ওদের সম্পর্ক। রায়নার অবশ্য জানা নেই সঠিক কারণটা কী। তবে ওর অনুমান লোভ আর ক্ষমতার দ্বন্দ্বের জন্যই এর সূত্রপাত। দু'জনেই চায় দখল করতে পুরো উপত্যকাটা। আর এখন ব্যাপারটা ঠেকেছে গানম্যান আমদানির পর্যায়ে।

এ বিষয়টাই উদ্বিগ্ন করে তুলেছে ওকে। শুনেছে রুফাস হেক্টরকে নিয়োগ দিয়েছে গর্ডন রাইকার্ড। সিক্সগানে চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্রতা থাকলেও বিবেকের বালাই নেই হেক্টরের। নিয়োগকর্তার ইচ্ছা মাফিক ভাড়া খাটায় অস্ত্র। অন্তর বর্জিত এক গানম্যান। যদি ওর উস্কানিতে গোলাগুলিতে নামে অ্যাডাম হেণ্ডারসন, বন্দুক বের করার কোনও সুযোগই পাবে না। সরাসরি যাবে সপ্ত আসমানে।

কথাটা হেণ্ডারসন নিজেও জানে। সুতরাং সে-ও দিয়েছে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। এবং সে অনুযায়ী একজন গানম্যান রওয়ানা হয়েছে পাইন ভ্যালির উদ্দেশে। এর অর্থ, এখন সর্বাত্মক রেঞ্জ ওঅর শুরু হবে পাইন ভ্যালিতে। ওদের রানশে কাজ করে পঁচিশজন কাউবয়। বার জি আর রানশের জনবলও ওদেরই মত। রেঞ্জ ওঅর শুরু হলে একপক্ষ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত একটার পর একটা লাশ পড়বে, থামবে না রক্তের হোলি খেলা।

টুকিটাকি কিছু জিনিস কিনতে শহরে এসেছিল রায়না। ওকে থামিয়ে নতুন গানম্যান আসার গরম খবরটা জানাল বেটি ফার্গুসন।

'কার কাছে শুনলে খবরটা?' জিজ্ঞেস করল রায়না।

যশোরে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের যে-কোনও বইয়ের জন্য এখানে আসুন।
মেসার্স আনোয়ার আলম ব্রাদার্স
প্রো: এস এম খুরশীদ আনোয়ার
৭ নং মুজিব সড়ক, যশোর।
ফোন নং: ০৪২১-৬৩৬৩৯ মোবাইল: ০১৭১৫-০৬৭০১৬

'ও, মা, কী বল, তুমি জান না?' পরম তৃপ্তির সঙ্গে বলল বেটি। 'এটা তো সারাশহরের লোক জানে।'

মাথা নাড়ল রায়না। সারাশহরের লোক জানলেও ওর জানা নেই। কারণ রানশের বিষয়ে মেয়ের সঙ্গে কখনও আলাপ করে না অ্যাডাম হেণ্ডারসন। প্রয়োজন ছাড়া শহরেও আসা হয় না ওর। ফলে অনেক খবরই রয়ে যায় ওর অজানা।

'এখন তো জানলে,' বলল বেটি। ভবিষ্যদ্বাণী করল, 'পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাকর হয়ে উঠবে সামনে।'

বেটিকে বিদায় দিয়ে ড্রেসশপের দিকে এগোল রায়না। রাস্তাটা পার হলেই হোটেল, তার দু'দোকান পরেই টেইলারিং শপ। আশঙ্কা আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলাচলে বেশ দ্রুতই হাঁটছিল ও, তখনই দেখল লোকটাকে। চকলেট টাইপ হ্যাণ্ডসাম না হলেও সুদর্শনই বলা যায়। পাইন ভ্যালিতে সম্ভবত নতুন। কারণ স্থানীয় সবাইকেই চেনে ও। তা ছাড়া, লোকটা বেরিয়েও আসছে হোটেল থেকে।

পরনে ধূলি-ধূসরিত পোশাক। ঘামের দাগ লাগা হ্যাটের নিচ থেকে ঘাড়ের চারপাশে ছড়িয়ে আছে ঘন বাদামি চুল। একজন আদর্শ ভবঘুরের পোর্ট্রেট। ব্যতিক্রম শুধু আগন্তুকের চোখজোড়া। গাঢ় নীল, বুদ্ধিদীপ্ত, গভীর। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। চোখ এড়ায় না কোনও কিছুই।

ভবঘুরে হোক আর যা-ই হোক, লোকটা বিপজ্জনক, সিদ্ধান্তে এল রায়না। ধক্ করে উঠল ওর হৃৎপিণ্ডটা। বাবা একেই ভাড়া করেনি তো গানহ্যাণ্ড হিসেবে? চকিতে তার কোমরে দৃষ্টি দিল। কিন্তু কোনও হোলস্টার দেখতে না পেয়ে ভাবনার রাজ্যে ডুবে গেল।

ভাবতে ব্যস্ত অন্যমনস্ক রায়না হনহন করে হাঁটছিল, ফলে তাড়াহুড়ো করে রাস্তা পেরোতে গিয়ে বোর্ডওঅকে হোঁচট খেল। কোনওভাবেই সামলাতে পারল না নিজেকে। বোর্ডওঅকে পড়তে শুরু করে চোখ বুজে ফেলল আতঙ্কে।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর ভয়ে-ভয়ে চোখ মেলল ও। আতঙ্কিত দৃষ্টি পড়ল অন্তর্ভেদী নীল চোখের ওপর। যেন ওর অন্তরের গভীরতম অংশও দেখে নিচ্ছে ধূলি-ধূসরিত ড্রিফটার। বলিষ্ঠ দু'হাতে ওকে ধরে রেখেছে সে।

বিস্ময় ফুটল রায়নার চোখে। এত দ্রুত কীভাবে সক্রিয় হলো ভবঘুরে? নিজের পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার মত হুঁশ ফিরতেই ওর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল ড্রিফটার। 'ঠিক আছ তো, ম্যাম?'

'ধন্যবাদ... হ্যাঁ... মানে...' ইতস্তত করল রায়না, 'আমি... মানে... একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ভাগ্য ভাল তুমি ছিলে। তোমাকে আবারও ধন্যবাদ।' অনেকটা সামলে নিয়েছে তরুণী। আত্মবিশ্বাসের হাসি ফুটল পান্না সবুজ চোখে।

এমনই মায়াভরা চোখ, দেবতার দেবত্বও হুমকির মুখে পড়বে, আর আগন্তুক তো কোনও অবতার নয়, স্রেফ এক ড্রিফটার।

'ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই, ম্যাম,' বলল আগন্তুক, 'বরং আমারই উচিত ধন্যবাদ দেয়া। স্বর্গের পরী তো আর প্রতিদিন আছাড় খেতে চায় না, তাই সাহায্যের হাতও বাড়াতে পারি না।'

'ও, বুঝলাম, স্ট্রেঞ্জার,' বলল অপ্রস্তুত রায়না। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আমার ধারণা শহরে তুমি নতুন। চলার ওপরে আছ?'

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ভেবে তারপর বলল আগন্তুক, 'আসলে থিতু হওয়ার জায়গা খুঁজছি। নিউ মেক্সিকোতে একটা রানশ ছিল, বিক্রি করে দিয়েছি।' সুন্দর হাসি উপহার দিল স্ট্রেঞ্জার। 'সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি মনের মত জায়গার খোঁজে। এই এলাকাটা খুব পছন্দ হয়েছে। তুমি নিশ্চয় এখানকার ল্যাণ্ড এজেন্ট নও যে বলতে পারবে, কোনও জায়গা বিক্রি হবে কি না।'

অদ্ভুত ভাব খেলে গেল তরুণীর চোখে। প্রথমে বিস্ময় তারপর নিখাদ আতঙ্ক। ইতস্তত ভাবটা আবার ফিরেছে আচরণে। 'আমি... মানে...' কথাটা শেষ করতে পারল না ও। তার আগেই বাধা পড়ল।

'রায়না!'

এতক্ষণ বেনামী বন্দরের সঙ্গে বাতচিত হচ্ছিল। ডাক শুনে তরুণীর নামটা জানল ড্রিফটার। রায়নার সঙ্গে-সঙ্গে ওর চোখও ঘুরল শব্দের উৎসের দিকে।

'ওহ, বিলি! আর সময় পেলে না,' গুঙিয়ে উঠল রায়না।

বিশালদেহী গণ্ডার বিলিকে দেখে চোখ বিস্ফারিত হলো আগন্তুকের। মাটি কাঁপিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে দানব। রায়নার সঙ্গে ওকে দেখে আগ্নেয়গিরির মত বিস্ফোরিত হলো পর্বত-মানব। 'কে তুমি?' ছয় ফিট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতার ছোটখাট আগন্তুককে দেখে হুঙ্কার ছাড়ল গরিলা, 'এই লেডিকে বিরক্ত করছ? এখনই তোমাকে ছাতু করে দেব!'

কিছু বলতে মুখ খুলতে যাচ্ছিল আগন্তুক, তার আগেই হস্তক্ষেপ করল রায়না: 'বিলি, ও একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক। ও না ধরলে এতক্ষণে আছাড় খেয়ে হাত-পা ভাঙত।'

ওর পরিস্থিতি শান্ত করার প্রয়াসে উল্টো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে এক মগ পানি ঢালার মত আরও জোরে হিসহিস করে উঠল দানব, 'আমি দেখেছি ও তোমার গায়ে হাত দিয়েছে!' সবরি কলার মত আঙুলগুলো আগন্তুকের বুকে ঠেকিয়ে হুমকি দিল সে, 'শোনো, ভ্যাগাবণ্ড, আবারও যদি ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখি, তো তোমার হাত-পা'র নলি খুলে নেব। ও যে পথ দিয়ে যাবে, তুমি তার উল্টো পথ দিয়ে যাবে। বোঝা গেছে?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি,' বলল আগন্তুক, 'আমি আসলে কোনও ঝামেলা চাই না। এরপর ও রাস্তায় আছাড় খেয়ে গড়াগড়ি করলেও ধরতে যাব না। তুমি ওকে ঠিক সময়ে ধরবে, সেজন্যে তোমাকে খুঁজতে বেরোব।'

ওর কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেলল রায়না।

এতে হাসির কী আছে বুঝতে না পেরে চোখ কটমট করে তাকাল মাথামোটা গরিলা। 'হ্যাঁ, তা-ই করবে। কারণ ও আমার মেয়েমানুষ। চলে এসো, রায়না, তোমাকে চমৎকার কিছু জিনিস দেখাব।' মেয়েটার হাত ধরে টেনে নিয়ে রওনা হয়ে গেল পাহাড়।

হায়, খোদা, সশব্দে আঁৎকে উঠল ড্রিফটার। রায়না মেয়েটার রুচিবোধের উপর বাজ পড়েছে নাকি ঈশ্বরের?

রায়নার উপর সুবিচার করেনি আগন্তুক। নিজেকে পুরুষদের কাছে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা না থাকলেও এই সুন্দরীকে জ্বালাবার লোকের অভাব নেই। বিলির কারণে ওকে বিরক্ত করার সাহস পায় না কেউ। ফলে বিলির সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলে ও। কিন্তু বিলি ওকে নিজের মেয়েমানুষ বলায় খুব ক্ষুব্ধ হয়েছে রায়না। বিশেষ করে ওই আগন্তুকের সামনে বলায়। পেছনে ঘুরে তাকাল ও। কিন্তু ততক্ষণে উল্টো পথে হাঁটা দিয়েছে আগন্তুক। ইস্, আরেকবার যদি দেখা হত, ভাবল রায়না। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারত যুবককে।

কিন্তু রায়নার বক্তব্য বোঝার চেয়েও অনেক জরুরি কাজ আছে আগন্তুকের। দুপুর পেরিয়ে গেছে, এখনও পেটে কিছু পড়েনি। ব্যগ্র চোখে রেস্তোরাঁর সন্ধান করছে ও। আগে ফুড তারপর ফ্যান্টাসি।

উইগলির হোটেল সামনে পড়তেই ঢুকে পড়ল যুবক। ভিড় দেখে বুঝল, সুনাম আছে রেস্তোরাঁর। কোনও টেবিল খালি না পেয়ে বসল একটা টুলের উপর। পাশেই বসে মেনু নিয়ে যেন পিএইচডি করছে এক মুরুব্বি।

'এখানকার ভাল আইটেম কোন্‌টা?' গবেষককে জিজ্ঞেস করল যুবক।

'এখানকার চিকেনটাই সেরা,' বলল ওল্ড টাইমার, 'স্টেকটাও ভাল বানায় উইগলি, যদি স্টেক পছন্দ করো আর কী।'

ওয়েটারের দেখা পেতে দেরি হবে। মেনু বাদ দিয়ে ওর উপর গবেষণায় লিপ্ত হলো মুরুব্বি। 'তোমাকে আগে কখনও দেখিনি। চলার উপর আছ?'

'ঠিক তা নয়। দক্ষিণে একটা রানশ ছিল, বিক্রি করেছি। জায়গা খুঁজছি রানশ করতে। পছন্দ হয়েছে এই উপত্যকা। আছে নাকি এখানে বাড়তি জায়গা?'

আগন্তুক জানে, জায়গা-জমির খোঁজ বেশি রাখে মুরুব্বিরা।

'বাছা, লাঞ্চ সেরে ঘোড়ায় চেপে ওটার পাছায় জোরে চাপড় দিয়ে ভেগে যাও। এখানে যে-কোনও দিন শুরু হবে রেঞ্জ ওঅর,' উপদেশ খয়রাত করল ওল্ড টাইমার।

যেন পশ্চিমে এই প্রথম রেঞ্জ ওঅর হবে, এমন সুরে বলল আগন্তুক, 'তাই?'

'হ্যাঁ। এলাকার অর্ধেকের মালিক রকিং এ টি'র অ্যাডাম হেণ্ডারসন, বাকিটার মালিক বার জি আর রানশের গর্ডন রাইকার্ড। দু'জনেই এখন পুরো উপত্যকা দখলের পাঁয়তারা করছে। গানম্যান ভাড়া চলছে।'

টেবিল খালি হতে আরও সময় লাগবে, তাই মুরুব্বির সঙ্গে আলাপের সিদ্ধান্ত নিল যুবক। 'কাকে ভাড়া করেছে?' জিজ্ঞেস করল।

'রাইকার্ড হায়ার করেছে রুফাস হেক্টরকে। সত্যিকারের এক সাইডওয়াইণ্ডার। পিস্তলে হাত নরকের পিশাচের মত চালু।'

মাথা দোলাল আগন্তুক। একবার ওর মুখোমুখি হয়েছিল রুফাস হেক্টর। না দেখেই হেক্টর সম্পর্কে প্রায় নির্ভুল বর্ণনা দিয়েছে ওল্ড টাইমার। ওয়েটার অর্ডার নিয়ে চলে যাওয়ার পর জানতে চাইল যুবক, 'আর অ্যাডাম হেণ্ডারসন?'

'আজ সকালেই শুনলাম খবরটা,' গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য চেহারায় বিচিত্র ভাব ফুটিয়ে তুলল মুরুব্বি, 'অ্যাডাম হেণ্ডারসন যাকে হায়ার করেছে, সে নাকি আট-নয়জন বাদে নিউ মেক্সিকোর সব লোক মেরে সাফ করে দিয়েছিল।'

নিউ মেক্সিকোর নাম শুনে নড়েচড়ে বসল আগন্তুক। হাজার হোক জন্মভূমি বলে কথা।

'কী নাম সে এলেমদার গানম্যানের?'

আর কেউ যাতে শুনতে না পায়, এমনভাবে বলল মুরুব্বি, 'রেক্স হার্বার্ট ওরফে ফ্যান্টম।'

টুলের নিচে কেউ ডিনামাইট ফাটিয়ে দিয়েছে মনে হলো যুবকের। টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেছে।

'কী ব্যাপার, বাছা, ভুল কিছু বললাম নাকি?'

'তা নয়,' নিজেকে সামলে নিল স্ট্রেঞ্জার। 'জায়গাটা তা হলে খুব গরম মনে হচ্ছে। রেঞ্জ ওঅর থেকে দূরে থাকাই স্বাস্থ্যকর হবে।'

'ঠিকই বলেছ, দৌড়ের ওপর থাকাই ভাল,' একমত পোষণ করল মুরুব্বি। 'উত্তরে আরও মাইল ত্রিশেক রাইড করলে বিটার ক্রিক। ওখানে পেয়ে যাবে রানশের জন্যে জমি।'

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বলল যুবক। ওয়েটার খাবার নিয়ে আসায় আলোচনায় ছেদ পড়ল।

আসলে বাবা-মা'র দেয়া নাম হচ্ছে যুবকের রেক্স হার্বার্ট।

নীরবে খেতে লাগল সে। মাথায় বইছে টর্নেডো। গ্র্যাণ্ডির হোটেলে নাম লিখেছে রক হাডসন, আবার ঘণ্টাখানেক আগে সিগনেচার করেছে জেসন হোল্ডার নামে।

এটা ঠিক, নিউ মেক্সিকোতে সঙ্গত কারণেই কয়েকটা লাশ ফেলতে হয়েছিল, কিন্তু তাতে মুরুব্বির কথামত উজাড় হয়নি নিউ মেক্সিকো। লাশ ফেলাটা মোটেও ভাল কাজ নয়। গানম্যান খ্যাতি এড়াতে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচয় দেয় নিজেকে। অথচ দেড় হাজার মাইল দূরেও ঠিকই পৌঁছে গেছে ওর নাম-ডাক। এটা মোটেও খুশি হওয়ার মত কিছু নয়। তার চেয়েও মারাত্মক খারাপ খবর হচ্ছে, না অ্যাডাম হেণ্ডারসন, না গর্ডন রাইকার্ড, এমন কী খোদ ইবলিসও ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। তা হলে কোন্ হারামজাদা রেক্স হার্বার্ট নাম নিয়ে পিস্তল ভাড়া খাটাতে আসছে পাইন ভ্যালিতে?

তিন

কিছু গরু, ঘোড়া, শুয়োর ও মুরগি নিয়ে হার্বার্টদের এক সেকশনের রানশ। প্রাচুর্য না থাকলেও না-খেয়ে থাকার মত নয় অবস্থা। ওদের রানশে সৌখিন একটা বিষয় ছিল, হলদেমুখো এক জাপানি কুক— কিকো। ফলে মায়ের কাজের চাপ কিছুটা কমে গিয়েছিল। জুডোতেও দারুণ দক্ষতা ছিল কিকোর। মুফতে

সেটা আয়ত্ত করেছিল রেক্স।

ভালমানুষ হিসেবে লিণ্ডা হার্বার্ট ও জোনাথন হার্বার্ট এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। যদিও কেউ গায়ে পড়ে লাগতে এলে মুখ বুজে সহ্য করত না ওরা। হার্বার্টদের একমাত্র সন্তান রেক্স হার্বার্ট। মা-বাবার সব গুণই পেয়েছে, সঙ্গে যোগ হয়েছে চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্রতা। বাবা বলত, র‍্যাটলস্নেক আর ওর মধ্যে ডুয়েল হলে ছেলের পক্ষেই বাজি ধরবে সে।

পশ্চিমের আর দশজন ছেলের মত সংসারের কাজে সাহায্য করতে হত ওকেও। তখনও কাঁটাতারের বাঁধনে আটকা পড়েনি পশ্চিম। ফলে ক্যাটলগুলো উড়নচণ্ডী হওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। তাই পড়াশুনার পাশাপাশি গরু খেদানোর বিরক্তিকর কাজটাও করত, যাতে ওগুলো বৈরাগী হয়ে না যায়।

বিরক্তিকর কাজ। একঘেয়েমি কাটাতে পুরনো এক পিস্তল দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ড্র প্র্যাকটিস করত সাত বছরের রেক্স। ওটা হঠাৎই একদিন চোখে পড়ল জোনাথন হার্বার্টের। নষ্ট পিস্তলের জায়গায় নিজের কোল্টটা দিল ছেলের হাতে। 'দেখ তো, বাছা,' পঞ্চাশ ফুট দূরে ছয়টা খালি বোতল সাজিয়ে বলল সিনিয়র হার্বার্ট, 'কত কাছাকাছি লাগাতে পার।'

চটজলদি বাবার পিস্তল খালি করল রেক্স। ফলাফল চারটা বোতল উধাও।

'ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই বাধলে তোমাকে সবার সামনে রাখব, সান,' হতবিহ্বল ভাব কাটতেই বলল জোনাথন। বাবার কথার অর্থ বুঝতে পারেনি রেক্স। ভেবেছিল দুটো বোতল মিস করায় মন খারাপ করেছে বাবা। তবে একটু পরে ভুল ভেঙেছিল, যখন নিজের পিস্তলটাই উপহার হিসেবে ওকে দিয়ে দিল বাবা। তবে বয়সের কারণে খালি পিস্তল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল রেক্সকে।

খালি পিস্তল দিয়েই সমানে গুলি চালিয়ে গেল ও। লতা-পাতা-পশু-পাখি থেকে শুরু করে লাল পিঁপড়েও ওর পিস্তলের নিশানা থেকে রক্ষা পেল না। এরপর পেরিয়ে গেল বেশ ক'টা বছর। পনেরো বছরের রেক্সের অস্ত্রভাণ্ডারে যোগ হলো শার্পস রাইফেল। অ্যামুনিশন বাঁচাতে এখনও প্র্যাকটিসের সময় নিশানা করেই ক্ষান্ত দেয়, সত্যিকারের গুলি করে না।

সেদিনও তাই করছিল।

'তোমার নিশানা আগের চেয়ে ভাল হয়েছে, বয়?' ওর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল জোনাথন।

'বাবা, ওই চড়ুইটা!' বলেই গুলি করল রেক্স। নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল পাখিটা, মাথায় গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ল।

ছেলের ক্ষিপ্রতায় হতবাক জোনাথন নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'দেখ, বাছা, আমার মনে হয় না, জীবিত কেউ তোমার চেয়ে দ্রুত পিস্তল ড্র করতে পারবে। আমি এমন কী তোমাকে ঠিকমত নড়তেও দেখিনি।' এরপর শার্পসটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওটায় তোমার হাত কেমন?'

'ছয়শ' গজ দূরের পিঁপড়ার শুঁড় ওড়াতে পারব,' গর্বের সঙ্গে বলল রেক্স। কথার ফাঁকে শার্ট খুলে হাতে নিয়েছে শার্পস অস্ত্রটা। বাবার কাছে নিজের সামর্থ্য প্রমাণে উদ্‌গ্রীব।

ছেলের কথায় হাসি ফুটল বাবার ঠোঁটে, প্রশ্রয়ের হাসি। 'ওই যে বড় বোল্ডারটার ওপর শুয়ে আছে একটা র‍্যাটলস্নেক,' প্রায় পাঁচশ' গজ দূরের টার্গেট দেখিয়ে বলল বাবা। 'ওটার আশপাশে লাগাতে পারবে?'

'এ তো বাচ্চারাও পারবে।' নিতান্ত অবহেলায় রাইফেল তাক করেই গুলি করল রেক্স। চূর্ণবিচূর্ণ হলো র‍্যাটলস্নেকের মাথাটা।

ছেলেকে জড়িয়ে ধরল গর্বিত বাবা। 'একটা কথা মনে রেখ, বাছা, বিনা কারণে মানুষ খুন কোরো না। বিশেষ করে কেউ আগে বন্দুকে হাত না দিলে কখনও গুলি করবে না।'

বাবাকে কথা দিয়েছিল, তাই কথাটা সবসময় মেনে চলে রেক্স হার্বার্ট।

যদিও পরের বছর ওর সত্যিকারের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল।

একটা গাছের ছায়ায় বসে থ্রোয়িং নাইফটা শান দিচ্ছিল রেক্স। এমন সময় আসতে দেখল

তিনজনের দলটাকে। ছোরা ধার দেয়া বন্ধ রেখে উঠে দাঁড়াল ও। ততক্ষণে অনেক কাছে চলে এসেছে নোংরা ও রুক্ষ মেক্সিকান দলটা। ওর কাছ থেকে ত্রিশ ফুট দূরে থাকতেই রাশ টানল ঘোড়ার।

একজন হাসল রেক্সের দিকে চেয়ে, যদিও তাতে বন্ধুত্বের ছিটেফোঁটাও অনুপস্থিত।

'আরে, এ যে দেখি এক মুচেচো (বালক), ক্যাটল পাহারা দিচ্ছে,' বলল দাঁত ভ্যাঙচানো মেক্সিকান। 'মানুষের বুক থেকে দয়া-মায়া উঠে গেছে দেখছি। বড়দের কাজ করাচ্ছে একটা বাচ্চাকে দিয়ে।'

'নিজেদের কাজ আমরা নিজেরাই করি,' বলল রেক্স, চোখ সরু করে দেখছে মেক্সিকানদেরকে। সশস্ত্র তিনজনকেই বিপজ্জনক মনে হচ্ছে ওর কাছে।

'অবশ্যই করবে, মুচেচো।' সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বলল লোকটা, 'পেদরো, ফেলিক্স, দেখ, এই লি'ল মুচেচো আবার কোমরে ঝুলিয়েছে বিশাল এক গান।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল তিন দুর্বৃত্ত। 'সাবধানে থেকো, মুচেচো,' রেক্সকে বলল একজন, 'নিজের পায়ে আবার গুলি করে বোসো না।'

'ব্যাপারটা মাথায় রাখব,' নিজের জায়গা থেকে না নড়ে জবাব দিল রেক্স।

ওদের দেখে ভয় পায়নি ছেলেটা, ব্যাপারটা দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে তস্কর নেতাকে। রেক্সকে আপাদমস্তক জরিপ করে বলল আউট-ল, 'আমরা তোমার গরুগুলো ধার নিতে চাই।'

'ক'টা ধার নেবে?' স্রেফ আলাপ চালানোর জন্য বলল রেক্স। বুঝে গেছে এরা রাসলার। ওদের সবগুলো গরুই "ধার" নেয়ার মতলব।

'সবগুলো,' উচ্চস্বরে হেসে উঠল তস্কর নেতা।

'যদি না দিই?'

'সেক্ষেত্রে তোমাকে খুন করব,' আবার হাসির হল্লা উঠল।

'তবে তা-ই করো,' স্থির কণ্ঠে বলল রেক্স।

'খুবই দুঃখজনক...' কথার সঙ্গে-সঙ্গে হোলস্টারে হাত দিল তস্কর নেতা। হোলস্টার থেকে পিস্তলটা প্রায় বের করে এনেছে, এমন সময় সক্রিয় হলো রেক্স। ওর সিক্সগানের গুলিতে ভূপাতিত হলো তিনজন আউট-ল।

লাশ তিনটে ওদেরই ঘোড়ার পিঠে বেঁধে রানশে ফিরল রেক্স। ছেলের কাণ্ড দেখে চোখ কপালে উঠল বাবার।

'রাসলার,' মন্তব্য করল বাবা। 'জ্যান্ত অবস্থায় যেহেতু ওদেরকে সামাল দিয়েছ, লাশ নিয়ে আর টেনশন নেই। তুমিই ওদেরকে শেরিফের ওখানে নিয়ে যাও, বাছা।'

বিনা বাক্যব্যয়ে শহরে গিয়ে হাজির হলো রেক্স।

শেরিফের অফিসে আউট-ল লোকগুলোর খুন হওয়ার খবর দেয়ায় ওর সঙ্গে বেরিয়ে এসে চমকে গেল শেরিফ, বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'আরে! এরা তো ভাস্কোয়েয বয়েজ! দীর্ঘদিন ধরে নিউ মেক্সিকোতে রাসলিং করছিল। তোমার বাবা মেরেছে?'

'না, আমি মেরেছি।'

'তার মানে তুমি সঙ্গে ছিলে?'

'না, আমি একাই মেরেছি,' বলল রেক্স।

লাশ তিনটা খুঁটিয়ে দেখল শেরিফ। 'তুমি একাই তিনজনের কপালে একটা করে বুলেট ঢুকিয়ে দিয়েছ, এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ?'

'কী করবে না করবে তোমার ইচ্ছা। এখন লাশগুলো নিতে না চাইলে ফেরার পথে ফেলে যাব। শেয়াল-শকুনে খেয়ে দোয়া করবে।' বিরক্তি প্রকাশ পেল রেক্সের কণ্ঠে।

'শেয়াল-শকুনের দোয়ার দরকার নেই, বাছা, লাশের ব্যবস্থা আমিই করছি। এদের প্রত্যেকের নামে পাঁচশ' ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা আছে। টাকাটা নিয়ে যাও।' অফিসের সিন্দুক থেকে টাকাগুলো নিয়ে রেক্সকে দিয়ে দিল শেরিফ।

এত টাকা হাতে পেয়ে বিরক্তি উধাও হলো রেক্স হার্বার্টের। অনেক টাকা যেহেতু, একটা

সারসাপ্যারিলা কিনে খেলে রাগ করবে না মা, সেই সঙ্গে ওর চাই একজোড়া নতুন বুট।

চার

পেরিয়ে গেছে বেশ ক'টা বছর, পরিস্থিতি বদলে গেছে রিওপ্লাটার। পরিবর্তন হয়েছে এলাকার সবচেয়ে বড় রানশের মালিক টম মুডির মুডেরও। বিত্ত-বৈভবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে লোভ। আশপাশের ছোট রানশ অবিশ্বাস্য কম মূল্যে কেনার প্রস্তাব দিচ্ছে সে। যারা রাজি হচ্ছে না, তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে তার পোষা গুণ্ডাবাহিনী।

একই অফার দিতে এলে টম মুডির মুখের উপর বলল জোনাথন হার্বার্ট, 'আমার মুডটা খারাপ কোরো না, মুডি। তোমার অনেক আছে। সীমানা বাড়াতে অন্যের বসত ভিটা জোর করে দখল না করে যা আছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো। এ জায়গাটা পছন্দ করে আমার পরিবার, কাজেই আমরা এখান থেকে যাব না। মানুষের সম্পত্তির ওপর চোখ না দিয়ে চেষ্টা করো, যাতে সবাই মিলে আমরা রিওপ্লাটাকে চমৎকার ক্যাটল কান্ট্রিতে পরিণত করতে পারি।'

কিন্তু চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনি, ওদের পেছনেও পোষা দুর্বৃত্তদের লেলিয়ে দিল মুডি। রাতের আঁধারে হারাতে লাগল ওদের গরু। বাধ্য হয়ে বাপ-বেটা পালা করে পাহারা বসাল।

সুবিধা করতে না পেরে তখন অন্য পথ ধরল মুডি।

গরু দেখাশোনা করতে বাইরে গিয়েছিল জোনাথন হার্বার্ট। করালের বেড়া মেরামতে ব্যস্ত রেক্স। রুফাস হেক্টরের নেতৃত্বে এক হালি ভাড়াটে গুণ্ডা এসে হাজির হলো উঠোনে।

মুখোমুখি হলো রেক্স হার্বার্ট। হাতদুটো দূরে রেখেছে হোলস্টার থেকে, যাতে কোনও উস্কানির অজুহাত না পায় ওরা।

'হার্বার্ট, তোমাদের একঘণ্টা সময় দেয়া হলো রানশ ছাড়ার জন্য,' বলল ছুঁচোমুখো এক দুর্বৃত্ত। 'নইলে রানশের সঙ্গে-সঙ্গে তোমাদেরও কয়লা বানিয়ে দেব।' কথা শেষ করে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসতে লাগল ছুঁচোমুখো।

কোনও প্রতিক্রিয়া ছাড়াই স্থির চোখে রুফাস হেক্টরের দিকে চেয়ে রইল রেক্স হার্বার্ট।

'বুঝেছি পায়ের কাছে গুলি করে তুর্কি নাচ না নাচালে কানে পানি ঢুকবে না ওর,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ছুঁচোমুখো। কথা শেষ করে হাত বাড়াল হোলস্টারের দিকে। এবং জীবনের শেষ ভুলটা করল।

সক্রিয় হলো রেক্স হার্বার্ট, দু'হাতে উঠে এসেছে সিক্সগান। টপাটপ স্যাডলচ্যুত হলো তিন বদমাশ। রেক্স হার্বার্টকে নড়তে দেখে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল হেক্টর। ওর সিক্সগান সবে হোলস্টারমুক্ত হয়েছে, ওখানেই স্থির হয়ে গেল হাত। উদ্যত দুই সিক্সগানের নল চেয়ে আছে ওর বুক বরাবর।

মরহুম মহাবীর হওয়ার চেয়ে বেঁচে থাকা বেশি লাভজনক মনে হলো হেক্টরের। কিছু বলার আগেই ফেলে দিল হাতের পিস্তল। মাথার ওপরে উঠে গেছে হাত। রেক্সের নির্দেশে নেমে এল ঘোড়ার পিঠ থেকে।

'হেক্টর, তোমাকে কেন বাঁচিয়ে রেখেছি, জানো?' অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল রেক্স, 'মুডিকে একটা মেসেজ দেয়ার জন্য। এদের লাশ ওকে দিয়ে বলবে, আবারও আমাদের রানশের দিকে

মেসার্স আমীর অ্যাণ্ড সন্স

এখানে মাসিক রহস্যপত্রিকা বিক্রি করা হয়

৫৯/৩/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

মোবাইল: ০১৭১১-১৩৭৮৫১, ০১৬১১-১৩৭৮৫১

ফোন: ৯৫৫৬৪৮৪, ৭১১১৩৭২

চোখ তুলে তাকালে, ওর কপালে সীসা দিয়ে তৃতীয় চোখ তৈরি করে দেব। তোমার জন্যও একই কথা, হেক্টর। আমার সামনে আর কখনও পড়বে না।'

ভিতরে কাঁপ উঠে গেছে হেক্টরের। কোনও কথা না বলে লাশগুলো ঘোড়ার পিঠে তুলে বার জি আর রানশের পথ ধরল।

টম মুডি যে মেসেজই পেয়ে থাক, রুফাস হেক্টরের টিকিরও আর দেখা মিলল না রিওপ্লাটায়। থাবা গুটিয়ে নিয়েছিল মুডিও। কিন্তু ওটা যে শিকারের উপর হামলে পড়ার পূর্ব প্রস্তুতি, বুঝতে পারেনি হার্বার্টরা।

আঘাতটা এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে। ব্যবসায়িক কাজে ওকে পাশের শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিল বাবা। কাজ সেরে ফিরতে-ফিরতে গড়িয়ে গেল পরদিন সকাল। দূর থেকে রানশে ধোঁয়া দেখেই মনে কু গাইল রেক্সের। স্পার দাবাল র‍্যাভেনের পেটে। রানশে যখন পৌঁছুল, ততক্ষণে সব শেষ।

বাবা-মা'র গুলিবিদ্ধ আধপোড়া লাশ কবর দিয়ে শহরে এল রেক্স। দেখা করল শেরিফের সঙ্গে।

'দেখ, বাছা, প্রমাণ নেই যে এ কাজ করেছে টম মুডি,' সাফাই গাইল মুডির উচ্ছিষ্টভোগী শেরিফ, 'প্রমাণ ছাড়া একজন সম্মানিত লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায় না।' রেক্স হার্বার্টের শীতল চোখের দিকে চেয়ে কথাগুলো বলতে গিয়ে তোতলাতে হলো মার্শালকে।

'তোমাকে কষ্ট করে প্রমাণ খুঁজতে হবে না, শেরিফ,' নিরাবেগ কণ্ঠে বলল জুনিয়র হার্বার্ট, 'ওটা আমিই জোগাড় করে নেব'খন।'

সাত-আটজন অনুচর নিয়ে রানশের পোর্চে মজমা বসিয়েছে টম মুডি। সমান তালে চলছে হাসির হুল্লোড় ও মদের ফোয়ারা। রেক্স হার্বার্টকে উঠোনে ঢুকতে দেখে হল্লা থামিয়ে ওর দিকে তাকাল সবাই।

'মুডি!' হিমশীতল কণ্ঠে বলল রেক্স। 'আমাদের রানশের দিকে চোখ তুলে তাকাতে নিষেধ করেছি। হেক্টর সম্ভবত তোমাকে খবরটা দিতে ভুলে গিয়েছিল।'

'দেখ, কিড, আমাকে হুমকি না দিয়ে বাড়ি ফেরো,' পরামর্শ দিল মুডি, 'পরে বলতে পারবে না, তোমাকে সাবধান করিনি। এখানে আছে আমার আটজন গানহ্যাণ্ড। কোনও সুযোগই পাবে না তুমি।'

'আমি কোনও সুযোগ খুঁজতে আসিনি, মুডি,' ঘোড়া থেকে নেমে অবিচলিত কণ্ঠে বলল হার্বার্ট, 'এসেছি তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে। আমার মৃত বাবা-মা'র কাছে শপথ করেছি, তোমার লাশ না ফেলে এখান থেকে বেরোব না।'

বিপদের ভয়াবহতা বুঝতে পেরে সক্রিয় হলো মুডির গানম্যানরা, হাত বাড়াল অস্ত্রের দিকে। কিন্তু জীবনের কাছে যার কিছুই পাওয়ার নেই, মৃত্যুকে তার কীসের ভয়? রেক্সের দু'হাতের দুই সিক্সগান আগুন উগরাল। ফলাফল সাতটা লাশ আর মারাত্মক আহত দুই গানহ্যাণ্ড।

'হায়, ঈশ্বর! এ তো ফ্যান্টম! অশরীরী!' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল আলবার্তো নামের এক গানম্যান। আতঙ্কের কারণে ভুলে গেছে বুলেটের ক্ষতের ব্যথা। গুলির শব্দে চলে এসেছে আরও লোকজন। সবাই নিরীহ কাউবয়।

'টম মুডির সঙ্গে লেনদেন চুকিয়ে নিলাম,' বলল রেক্স, 'কেউ লড়তে চাও মুডির পক্ষে?'

মালিক মুডিই যেখানে নেই, ওর পক্ষে লড়ার মুডও উধাও সবার। অস্ত্র রিলোড করে হোলস্টারে পুরল রেক্স। বেরিয়ে এল রানশ ছেড়ে।

মুডির অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল সবাই, তাই আক্ষরিক অর্থেই সবার কাছে হিরো হয়ে গেল ও। মুখে-মুখে ফিরতে লাগল ওর নাম ফ্যান্টম রেক্স হার্বার্ট।

কিন্তু গানম্যান খ্যাতি চায়নি রেক্স। এক প্রতিবেশীর কাছে রানশটা বিক্রি করে চিরদিনের জন্য ছাড়ল রিওপ্লাটা। উদ্দেশ্য, দূরে কোথাও

গিয়ে চমৎকার কোনও রানশ গড়ে থিতু হবে, যেখানে গানম্যান হিসেবে কেউ চিনবে না ওকে।

পাঁচ

রিওপ্লাটা ছাড়ার পর মাত্র একবারই অস্ত্র ধরতে হয়েছিল ওকে। জুয়াড়ি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে, গ্র্যাঞ্জিতে। অথচ পাইন ভ্যালির মানুষের বদ্ধমূল ধারণা, নিউ মেক্সিকো উজাড় হয়েছে ফ্যান্টমের কারণে। ফ্যান্টমের নামে কোন্ হারামজাদা জালিয়াতি করতে আসছে, তা না দেখে এখান থেকে যাবে না, উইগলির রেস্তোরাঁয় খেতে-খেতে ভাবল রেক্স। সবচেয়ে ভাল হত ওই জালিয়াতকে রুফাস হেক্টর খুন করলে, সেক্ষেত্রে চিরদিনের জন্য খতম হত ফ্যান্টমের কিংবদন্তী। এই ক'বছরে ওর চেহারায় যে পরিবর্তন এসেছে, হেক্টরও সম্ভবত চিনবে না ওকে। আর লুকাতে হবে না। জর্জ ওয়াশিংটন কিংবা আব্রাহাম লিংকন টাইপের কোনও নাম নিয়ে থিতু হবে নতুন কোনও এলাকায়।

সুস্বাদু স্টেক সাবাড় করার ফাঁকে অতীত-বর্তমানের আলোকে বিশাল এক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দাঁড় করিয়ে ফেলল রেক্স। খাওয়া শেষে যখন বেরিয়ে এল, মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চিন্তা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা লোক দু'জনকে খেয়াল করেনি রেক্স। ফলে ধাক্কা খেল ওদের সঙ্গে।

'ওহ! এক্সকিউয মি,' নিজেকে সামলে বলল। অনিচ্ছাকৃত ভুল, সুতরাং আবার নিজ পথে রওনা দেবে, কিন্তু যাদের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে, তারা একেকজন হাড়ে হারামজাদা। ঝামেলা বাধিয়ে ফায়দা লোটাই তাদের কাজ। সুতরাং এই মওকা তারা ছাড়বে কেন?

'অ্যাই, স্ট্রেঞ্জার! দেখতে পাও না?' কথা শেষ হতে না হতেই লালচুলো ঝামেলাবাজ রেক্সকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলল ব্লণ্ডচুলো সঙ্গীর দিকে। বদখত ব্লণ্ডির সামনের দুটো দাঁত নিখোঁজ, হয়তো ঝেড়ে দিয়েছে আরেক ঝামেলাবাজ।

অন্য কেউ হলে এতক্ষণে হুমড়ি খেয়ে পড়ত বোর্ডওঅকে। কিকোর শেখানো বিদ্যায় পতনটা সামলে নিল রেক্স। সামলে নিয়েও লাভ হলো না। আবারও ধাক্কা খেতে হলো। এবার 'দাঁতভাঙা'র। শুধু ধাক্কা দিয়েই ক্ষান্ত হলো না, সঙ্গে যোগ হলো উদ্দেশ্যমূলক হুমকি।

'এটাকে কোনওভাবেই দুর্ঘটনা বলা যাবে না,' বলল দাঁতভাঙা। 'ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়ে আমাদের সঙ্গে লড়াই বাধাতে চাইছ!'

'দেখ, এটা নিছক দুর্ঘটনা,' ঝামেলা এড়াতে চাইল রেক্স। চায় না সামান্য ঝামেলায় ফাঁস হোক ওর পরিচয়, ভেস্তে যাক ওর পাঁচসালা পরিকল্পনা। 'চলতি পথে হঠাৎই ধাক্কা লেগেছে, ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই ভাল।'

'ভুলতে পারি এক শর্তে,' ওকে বলল লালচুলো। 'যদি আমাদের বিশ ডলার করে ক্ষতিপূরণ দাও।'

লালচুলোকে সমর্থন দিল দাঁতভাঙা। ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াত, কিন্তু বাধা পড়ায় সম্ভাব্য ঝামেলা এড়ানো গেল। 'অ্যাই, কী হচ্ছে এখানে?' ছোটখাট জটলাটা লক্ষ করে বলল শেরিফ।

'দেখ, শেরিফ,' ঝামেলাবাজ দু'জন কিছু বলার আগেই বলল জেসন, 'অসাবধানতায় ধাক্কা লেগেছে ওদের সঙ্গে। সেজন্য দুঃখ প্রকাশও করেছি। তারপরও ঝামেলা করছে। তুমি ওদের বুঝিয়ে দিলে চলে যেতে পারি নিজের পথে।'

'ও ঠিক বলেনি, শেরিফ,' বলল লালচুল, 'স্ট্রেঞ্জার ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা দিয়েছে। এজন্য ওকে কাফফারা দিতে হবে।'

'ওয়েল, বানি,' দ্বিধান্বিত কণ্ঠে লালচুলোকে বলল শেরিফ, 'ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, তার জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। তুমি আর সানি এখন বিদায় হও।'

'প্রশ্নই ওঠে না, শেরিফ,' বলে উঠল দাঁতভাঙা সানি, 'ও আমাদের প্রত্যেককে বিশ ডলার করে দেবে।'

'বাড়াবাড়ি না করে এক্ষুণি এখান থেকে দূর হও, নইলে জেলে ঢোকাব,' হুমকি দিল পাইন

ভ্যালির আইন। এবং তাতে কাজও হলো। গজগজ করতে-করতে এলাকা ছাড়ল সানি-বানি।

'ধন্যবাদ, শেরিফ, ঝামেলা থেকে বাঁচানোর জন্য,' বলল রেক্স।

'তোমাকে নতুন দেখছি,' ওকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে শেরিফ।

'ঠিকই ধরেছ, শেরিফ। চলার ওপর আছি। আপাতত হোটেলে থাকছি। নাম জেসন হোল্ডার। চেক করলেই জানতে পারবে।'

'অবশ্যই চেক করব,' আরেকবার ওকে স্ক্যান করে উপদেশ খয়রাত করল শেরিফ, 'সানি-বানি টাইপের পচা আপেল সবখানেই আছে। দেখে-শুনে পথ চলবে।'

নড করল জেসন। তখনই চোখ পড়ল রায়না হেণ্ডারসনের উপর।

বিলিকে বিদায় করে ফিরছে সে। পুরো ঘটনা ঘটেছে চোখের সামনে। ভেবেছিল পুরুষমানুষের মত লড়বে ওই সাহায্যকারী। কল্পনায় ওকে হার্ডিন কিংবা ডক হলিডের আসনে বসিয়ে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ দেখবে ভেবেছে। কল্পনার হিরোর পিছুটান দেখে গরম তাওয়ায় পানি পড়ার মত ছ্যাঁৎ করে উঠেছে রায়নার হৃদয়টা। 'শালা... মাকাল ফল,' কাউবয়দের কাছ থেকে শেখা গাল মনে-মনে ঝাড়ল জেসন হোল্ডারের উদ্দেশে। তারপরও মনের ঝাল না মেটায় দুদ্দাড় করে পেরিয়ে গেল বোর্ডওঅকটা। পেছন ফিরে যখন তাকাল, আরও বাড়ল ওর রাগ। কোনও দিকে না চেয়ে হেলেদুলে হোটেলে ঢুকছে কাপুরুষটা। 'মন চাইছে ব্র্যাণ্ড আয়রন গরম করে ওর পাছায় আর এইচ ব্র্যাণ্ড বসিয়ে দিই,' দাঁত কিড়মিড় করল রায়না।

উইগলির রেস্তোরাঁয় সকালের নাস্তা করতে-করতে প্রায় একই কথা ভাবছিল রেক্স নিজেও। ওর পাঁচসালা পরিকল্পনাতেও আছে পাছায় আর এইচ ব্র্যাণ্ডের ছাপ দেয়ার। তবে সেটা নিজের পাছায় না, ওর প্রস্তাবিত আর এইচ রানশের গরু-ঘোড়ার পাছায়।

এই সাত সকালেও খদ্দেরের অভাব নেই। নিজের রানশের পরিকল্পনায় এতই মনোযোগী ছিল, রেস্তোরাঁর হৈ-হল্লা থেমে যাওয়াটা খেয়াল করেনি। রেক্স হার্বার্ট নামটা কানে যেতেই ধ্যান ভাঙল ওর।

'রেক্স হার্বার্টকে শহরে ঢুকতে দেখেছ কেউ?' জনতার উদ্দেশে বলল বক্তা।

কেউ সাড়া দিল না।

এ-ই তা হলে অ্যাডাম হেণ্ডারসন, রকিং এ টি'র মালিক, মনে-মনে বলল রেক্স। ভাড়া করেছে এক জালিয়াতকে। যার জন্য ওর পরিকল্পনা পিছিয়ে যাচ্ছে কিছুদিনের জন্য।

'ঠিক আছে, এলেই জানা যাবে,' কারও কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে নিজেই বলল হেণ্ডারসন। উপস্থিত জনতার ওপর বুলিয়ে নিল চোখ। 'ডেভিলকে সামাল দেয়ার মুরোদ তা হলে পাইন ভ্যালিতে কারও নেই?' একই সঙ্গে বিদ্রূপ ও হতাশা ফুটল রানশারের কণ্ঠে।

জনতা এবারও নীরব।

'এই ডেভিলটা কে?' পাশের টেবিলের একজনকে জিজ্ঞেস করল রেক্স। 'নামকরা কোনও গানম্যান নাকি?'

'না, ওটা হেণ্ডারসনের বেয়াড়া এক ঘোড়া,' বলল লোকটা, 'ঘোড়া বটে একটা! দেখলেই চড়ার লোভ হয়। আর ওই লোভ করতে গিয়ে ডজন খানেক লোক ল্যাংড়া হয়েছে।'

আল আমিন বুক সাপ্লাই

প্রো: মোঃ আলী আকবর

সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের নতুন-পুরানো সব বই এবং রহস্যপত্রিকা সরবরাহ করা হয়।

মোবাইল: ০১৭২৯-১১৪৪৬০, ০১৯২৭-১১২৪৮০

কথাটা শুনে পুরনো নেশাটা চাগিয়ে উঠল রেক্সের। রানশে থাকতে পোষ মানিয়েছে বহু বেয়াড়া ঘোড়া। এমন কী র‍্যাভেনও প্রচণ্ড বেয়াড়া ও হিংস্র ছিল।

'আমি আছি,' স্কুলের বাচ্চাদের মত হাত তুলে বলল রেক্স।

'তোমাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না, মি...'

'জেসন, জেসন হোল্ডার। চলার ওপর আছি। ঘোড়া পোষ মানানো আমার একটা নেশা বলতে পার।'

নড করল রানশার। 'ঠিক আছে, কাজটা করলে দশ ডলার পাবে, নগদ।'

'এত কমে হবে না,' চাঁছাছোলা স্বরে বলল রেক্স।

'কত চাও?' বিস্মিত কণ্ঠ রানশারের।

অন্যদের অবস্থাও একই। সবাই তাকিয়ে আছে রেক্সের দিকে।

'ঘোড়াটা...' রানশার চোখ সরু করে কিছু বলতে মুখ খুলবে, তার আগেই খেই ধরল জেসন, 'পাইন ভ্যালির কেউ পোষ মানাতে পারেনি। তোমার খেয়ে লোকজনের হাত-পা ভাঙছে ও। আমি ওকে পোষ মানাব, সুতরাং ঘোড়াটা আমার হলে তোমারই উপকার হবে।'

'তোমার চেহারা-সুরত দেখে তো মনে হয় না পারবে,' বলল রানশার।

'বাজি ধরতে চাও?'

'হেরে গেলে আমি কী পাব, মি. হোল্ডার?'

'একটা বুলেট, ওকে শুট করার জন্য।'

মৃদু হাসল রানশার। পশ্চিমের কোনও রানশারই সুস্থ-সবল ঘোড়াকে গুলি করে মারার কথা কল্পনাও করবে না। 'ঠিক আছে, কাল সকাল ন'টায় রানশে চলে এসো। দেখব, কীভাবে তোমাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে ডেভিল।'

'নিশ্চয়ই দেখবে,' বলল রেক্স, 'আর, হ্যাঁ, একটা স্যাডলও দেবে, ফ্রি।'

শ্রাগ করল রানশার।

'ওর পেছনে অযথা সময় নষ্ট করছ, অ্যাডাম,' বলে উঠল একজন, 'ও প্রথম শ্রেণীর একটা কাপুরুষ।'

'তুমি কীভাবে জানলে?' জিজ্ঞেস করল হেণ্ডারসন।

রসিয়ে-রসিয়ে সানি-বানির ঘটনাটা বর্ণনা করল বক্তা। 'এমনই কাপুরুষ যে সঙ্গে পিস্তলও রাখে না,' সমাপ্তি টানল বক্তা।

'তুমি প্রতিবাদ করলে না কেন, হোল্ডার?' জিজ্ঞেস করল রানশার।

'এড়ানোর উপায় থাকলে ঝামেলায় জড়াই না,' জবাব দিল রেক্স।

'কাপুরুষদের একদম পছন্দ করি না,' সরাসরি নিজ মনোভাব ব্যক্ত করল রানশার। 'তারপরও কাল ন'টায় তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

রানশের উঠানে বাবা ও চাচার সঙ্গে গানম্যান হায়ার নিয়ে তর্ক করছিল রায়না, এমন সময় ফটকের সামনে হাজির হলো রেক্স। বিনা কারণেই রাগটা আরও বাড়ল মেয়েটার। এই মাকাল ফল আবার সাত সকালে এখানে এসেছে কী করতে!

'চলে এসেছ তা হলে?' বলল রানশার।

ঘোড়া থেকে নামার আগেই হ্যাট খুলে রায়নাকে সম্মান জানাল রেক্স।

'বাবা, ওকেও কি গানম্যান হিসেবে হায়ার করেছ?'

'না, মা। ওর সঙ্গে বাজি ধরেছি। ডেভিলকে পোষ মানাবে ও।'

নিরীহ লোকটা ডেভিলকে পোষ মানাতে এসেছে শুনে আতঙ্কের স্রোত বয়ে গেল রায়নার মনে। সব রাগ গিয়ে পড়ল রেক্সের ওপর। 'আর লোক পেলে না?' মুখ বাঁকিয়ে বলল বাবাকে, 'আরেক অকর্মাকে ধরে এনেছ ল্যাংড়া বানানোর জন্য!'

'আমার জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না, ম্যাম,' গা জ্বালিয়ে দেয়া হাসি উপহার দিল রেক্স। 'ল্যাংড়া হলেও তোমার কাঁধে ভর দিতে আসব না।'

'তোমাকে কাঁধে নিতে আমার বয়েই

গেছে,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল রায়না।

কথাবার্তা আর বেশি দূর এগোল না। করালে জড় হওয়া কাউবয়রা হৈ-হৈ করে উঠল রেক্সকে দেখে। নিজেদের মধ্যে বাজি ধরাধরি চলছে। র‍্যাভেনকে গ্রাউণ্ড হিচ করে এগোল রেক্স করালের দিকে।

গভীর মনোযোগ দিয়ে ঘোড়াটাকে দেখছে ও। তুমুল ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম ও ঝর্নার মত চঞ্চল এই বে গেল্ডিং। চকচকে গায়ে কিলবিল করছে থোকা-থোকা পেশি। হালকা বাদামী রঙা। শুধু হাঁটুর নিচটুকু সাদা। যেন সাদা মোজা পরেছে।

বহু কষ্টে ওটাকে স্যাডল পরাল হেণ্ডারসনের চার কাউবয় মিলে। জেসন বুঝে গেল, ডেভিল সত্যিকারের শয়তানি তুলে রেখেছে সত্যিকারের নির্ভীক রাইডারের জন্য।

করালের বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। রায়নার উপর চোখ পড়ল রেক্সের। মেয়েটার আতঙ্কিত দৃষ্টি দেখে কেন যেন ভাল লাগায় ছেয়ে গেল ওর মনটা।

করালের ভেতর লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে ডেভিল। করালের গেট বন্ধ করে দিয়েছে এক কাউবয়। জেসন ধীর পায়ে চলল ডেভিলের দিকে। সরাসরি তাকিয়ে আছে ওটার চোখের দিকে।

সবচেয়ে জটিল মুহূর্ত পার করছে। ঘোড়াটার এক হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইণ্ডিয়ানদের মত বিড়বিড় করে একটানা কথা বলছে ঘোড়াটার সঙ্গে। এরপর সাবধানে হাত রাখল কেশরে। আড়ষ্ট হয়ে গেল ডেভিল। উত্তেজনার একটা পুলক ছড়িয়ে পড়ল রেক্সের মনে। ও নিশ্চিত, ডেভিল জমিয়ে রেখেছে ওর পুরো শক্তি। আরোহী স্যাডলে উঠলে শুরু করবে মূল শয়তানি।

কথা বলা শেষ করে লাগামটা হাতে নিয়ে একলাফে স্যাডলে উঠে বসল জেসন।

অমনি আরম্ভ হলো ডেভিলের তাণ্ডব। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, শরীর বাঁকিয়ে আরোহীকে ঝেড়ে ফেলতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে ওটা। মাটিতে খুরের ভয়াবহ আঘাত ও কলজে হিম করা হেষায় প্রকম্পিত হতে লাগল রানশের বাতাস।

কোনওরকম আগ্রাসী ভূমিকা নেয়নি রেক্স। আপ্রাণ চেষ্টা করছে ডেভিলের পিঠে ঝুলে থাকতে। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো ওর, নিক্ষিপ্ত হলো ডেভিলের পিঠ থেকে। মাটিতে পড়ল ঠিক ঘোড়াটার দু'পায়ের সামনে। খুর দুটো নেমে আসছে ওর মাথা লক্ষ্য করে।

দম আটকে ফেলেছে সবাই। ভবিষ্যৎ দৃশ্যটা কল্পনায় দেখে চোখ বুজে ফেলেছে রায়না। তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরোল ওর গলা চিরে। বেশ কিছুক্ষণ পরেও খুলি ফাটার আওয়াজ শুনতে না পেয়ে ভয়ে-ভয়ে খুলল চোখ। বিস্মিত হলো দুরন্ত গতিতে করালে চক্কর কাটা ডেভিলের পিঠে রেক্সকে বসে থাকতে দেখে।

মাটিতে পড়ে ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল রেক্সের মগজ, রায়নার চিল-চিৎকারে চালু হয়েছে সেটা। মাথার দিকে নেমে আসা মৃত্যুদূতের খুর দেখে অবচেতন মনে সক্রিয় হলো লুকিয়ে থাকা কিকোর ট্রেইনিং। দিনের পর দিন হলদেমুখো জাপানির কাছে তালিম নিয়েছে জুডোর। সেটাই এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দিয়েছে ওকে।

দক্ষ অ্যাক্রোব্যাটের মত উল্টো ডিগবাজি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রেক্স। এক মুহূর্ত পরেই মাটিতে জোড়া খুর নামিয়ে দিয়েছে ডেভিল। কালক্ষেপণ না করেই ডেভিলের লাগাম ধরে এক ঝটকায় ওটার পিঠে চেপে বসেছে রেক্স।

তাতে কৌশল পাল্টে নিয়েছে ডেভিল। দুরন্ত বেগে এখন পাক খাচ্ছে করালের ভেতর। কিছুক্ষণ পর ছুট দিল করালের গেট লক্ষ্য করে।

'গেট খুলে দাও,' চিৎকার করল হেণ্ডারসন, 'নইলে মরবে দু'জনই!'

একেবারে শেষ মুহূর্তে গেট খুলল এক কাউবয়। জ্যা মুক্ত তীরের মত ছিটকে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল ডেভিল। পিঠে লটকে আছে নাছোড়বান্দা জেসন। খোলা ট্রেইলে ভয়ঙ্কর বেগে ছুটছে ডেভিল। ছুটতেও পারে, যেন খোদ 'ডেভিল' তাড়া করেছে ওটাকে। র‍্যাভেনও ওর গতির কাছে কিছুই নয়। মরার আগে আদৌ ডেভিল থামত কি না, সে ব্যাপারেও সন্দেহ

আছে রেক্সের। তবে সামনে নদী পড়তেই থামতে বাধ্য হলো দুরন্ত ঘোড়া। প্রচণ্ড পরিশ্রমের কারণে ফুলে-ফুলে উঠছে নাকের পাটা। নদীর কিনারে গিয়ে পানিতে ডোবাল মুখ। ওটার ঘর্মাক্ত গা থেকে স্যাডল খুলে ভালভাবে দলাই-মলাই করল রেক্স, তারপর ওটার দিকে ছিঁড়ে এগিয়ে দিল একমুঠো ঘাস। শান্তভাবে রেক্সের হাত থেকে ঘাস খেল কৃতজ্ঞ প্রাণীটা। তাতে স্বস্তির শ্বাস ফেলল রেক্স। জিতে গেছে ও। ঘোড়াটা এখন ওর সারাজীবনের বন্ধু।

রানশ হাউসের উঠানে জমায়েত হয়েছে সবাই, রেক্সকে আসতে দেখে হৈ-হৈ করে উঠল। উঠানে এসে ডেভিলের পিঠ থেকে নামল রেক্স।

পুরো সুবোধ না হলেও বন্য হিংস্রতা অনেকটা বিদায় নিয়েছে ঘোড়াটার।

'দেখ, হোন্ডার, তুমি ডেভিলকে জিতে নেয়ায় খুশি হয়েছি, এরকম ঘোড়াকে গুলি করতে খারাপ লাগত,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল রানশার।

'শুধু ডেভিল না,' বলে উঠল রেক্স। 'স্যাডলটাও জিতেছি। আরও একটা জিনিস চাইব তোমার কাছে।'

'তুমি তো, বাছা, সুবিধার লোক নও,' মৃদু হেসে বলল রানশার। 'আবার কী চাও?'

'ওর কথা শুনো না, বাবা,' বলে উঠল রায়না। রেক্সকে নিরাপদে ফিরতে দেখে ওর চেয়ে খুশি আর কেউ হয়নি। সেই সঙ্গে অকারণ রাগটাও চাগিয়ে উঠেছে ওর। 'দেখতে সহজ মনে হলেও, সেয়ানা মাল এই লোক। শেষ পর্যন্ত তোমার সহায়-সম্পত্তি নিয়ে টান দেবে।'

'ডেভিলকে পুরো ট্রেইণ্ড করতে আরও কয়েকটা দিন লাগবে, তোমার করালটা যদি...'

'ঠিক আছে, ফোরম্যানকে বলে দেব, যাতে করালটা তুমি ব্যবহার করতে পার,' কথা শেষ করে বিদায় নিল রানশার। অন্যরাও অনুসরণ করল তাকে।

'দেখ, ম্যাম,' রায়নাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল রেক্স, 'তোমার বাবার সম্পত্তিতে আগ্রহ নেই আমার। তবে সহায়টার কথা আলাদা।' গা জ্বালা ধরিয়ে দেয়া হাসি নিয়ে করালের দিকে চলল ও।

'শালা জালিয়াত!' বিড়বিড় করে গাল বকল রায়না।

ছয়

নাস্তা সেরেই রকিং এ টি'র উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল জেসন। গত ছয় দিন টানা কয়েক ঘণ্টা করে ট্রেইনিং দিয়েছে ডেভিলকে। ওটা এখন পুরোপুরি ট্রেইণ্ড। সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আজই হবে রকিং এ টি'তে ওর শেষ দিন। মেয়েটাকে খুব মিস করবে, ভাবল ও। এই ক'দিন রায়না সারাক্ষণ আঠার মত লেগে ছিল ওর সঙ্গে। করালের বাইরে বসে রেক্সের কাজ দেখেছে, আর সুযোগ পেলেই অকারণ চোটপাট দেখিয়েছে। ব্যাপারটা উপভোগই করেছে ও। দানব বিলির মেয়েমানুষ না হলে চেষ্টা করত আরও কাছে যাওয়ার।

করালের গেটে যথারীতি দেখা হলো রায়নার সঙ্গে।

'গুড মর্নিং, ম্যাম,' হ্যাট খুলে অভিবাদন জানাল ও।

'প্রতিদিন একই ঢং না করলে হয় না?' ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল রায়না।

'হত, যদি প্রতিটা দিন নতুন দিন না হত,' ডেভিলকে স্যাডল পরাতে-পরাতে বলল রেক্স।

ওর দার্শনিক মন্তব্য শুনে ভেতরের রাগটা চাগাড় দিয়ে উঠল রায়নার। নিজেও জানে না, কেন এমন হয়। দক্ষ কাউবয় হিসেবে যত দেখছে, ততই মুগ্ধ হচ্ছে। এর আগে কোনও পুরুষের প্রতি এমন আকর্ষণ বোধ করেনি। কিন্তু যখনই মনে পড়ছে, এ এক কাপুরুষ, তখনই হোঁচট খাচ্ছে। একটা ডরপুককে নিজের মনের মানুষ হিসেবে কিছুতেই মানতে পারছে না। এ কারণেই রাগ বাড়ছে রেক্সের উপর।

'ডেভিলের পিঠে চড়ার সাহস আছে, ম্যাম?' সেই গা জ্বালিয়ে দেয়া হাসি নিয়ে বলল জেসন।

'অবশ্যই, তোমার চেয়ে ঢের ভালভাবে

ওকে হ্যাণ্ডল করতে পারব।' গটগট করে ডেভিলের দিকে হেঁটে গেল রায়না। রেক্সের সাহায্য উপেক্ষা করে নিজেই উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে। নরম হাতের গরম চাপড় মারল ডেভিলের পাছায়। তাতে ঝড়ো গতিতে খোলা ট্রেইলে বেরিয়ে গেল ঘোড়াটা।

'বাহ্! মেয়ে তো নয়, সাক্ষাৎ দস্যুরানি, চমৎকার মানিয়ে গেছে ডেভিলের পিঠে,' বিড়বিড় করে বলল জেসন।

আধঘণ্টা পরেই স্বস্তি উধাও হলো ওর। ভূতের তাড়া খাওয়া গতিতে ফিরে এসে ওর সামনে লাগাম টানল মেয়েটা। চেহারায় ফুটে উঠেছে নির্ভেজাল আতঙ্ক। ঘোড়া থেকে ওকে নামতে সাহায্য করে জানতে চাইল রেক্স, 'কী হয়েছে, ম্যাম?'

নিজেদের আঙিনায় ঢুকে সাহস ফিরে পেয়েছে রায়না। 'ও... ও... চলে এসেছে,' সামলে নিল নিজেকে।

'কোথায়, কে চলে এসেছে?' আবারও জিজ্ঞেস করল রেক্স।

'রেক্স হার্বার্ট, কয়েক মাইল দূরে,' বলল রায়না।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রেক্সের শরীরে। কোনও কথা না বলে এক ছুটে চড়ে বসল র‍্যাভেনের পিঠে। তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাল ট্রেইলে। 'শালা... কাপুরুষ, জালিয়াত,' অক্ষম রাগে কাউবয়দের কাছ থেকে শেখা গালি ঝাড়ল রায়না। ওঁর ধারণা, রেক্স হার্বার্টের নাম শুনে ভেগে যাচ্ছে হোল্ডার।

মাইল পাঁচেক যাওয়ার পর গদাইলস্করী চালে আসা এক রাইডারের দেখা মিলল। কোনও তাড়া নেই তার। ঠোঁটে সিগার ঝুলিয়ে চারদিক দেখতে-দেখতে আসছে। যাতে সহজে চেনা না যায় সেজন্যে নিজের হ্যাটটা আরেকটু সামনে টেনে দিল রেক্স। ওকে দেখে নিজের ঘোড়ার গতি আরও কমাল আগন্তুক।

'অনেক দূরে চলে এসেছ, আলবার্তো,' বলল রেক্স।

'কে তুমি?' খেঁকিয়ে উঠল আলবার্তো ওরফে নকল রেক্স হার্বার্ট।

হ্যাটটা পেছনে ঠেলে দিল জেসন।

ঠোঁট থেকে সিগার খসে পড়ল আলবার্তোর। চোখদুটো পিরিচের মত গোল হয়েছে আতঙ্কে। 'হায়, যিশুর বাপ! এ যে সত্যিকারের রেক্স হার্বার্ট,' কথা শেষ করেই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল আলবার্তো। পাছায় ব্র্যাণ্ডিং আয়রনের ছ্যাঁকা খাওয়া বাছুরের মত ছুট লাগাল।

করালে যখন ফিরল রেক্স, তখন চরমে উঠেছে রায়নার রাগ।

'রেক্স হার্বার্টের নাম শুনে তো প্যাণ্ট ভেজাবার অবস্থা হয়েছিল,' বলল রায়না, 'আবার ফিরলে কেন, ডেভিলকে নিতে ভুলে গিয়েছিলে? কাপুরুষ, জালিয়াত কোথাকার!'

একটা ঝামেলা বিদায় করে এখন অনেকটাই নির্ভার রেক্স হার্বার্ট। রায়নার কথায় না রেগে মৃদু হাসল। 'ঝামেলা এড়ানোর জন্যে কত কিছুই না করতে হয়। সামান্য সুযোগ থাকলেও চেষ্টা করি ঝামেলা এড়াতে।'

'তা-ও ভাল। জীবনে অন্তত একজন সাধুর দেখা পেলাম,' তীব্র শ্লেষের সুরে বলল রায়না। 'এজন্যই বুঝি প্রথমবারের মত কোমরে দুটো হোলস্টার ঝুলিয়ে নিয়েছ?'

'ঠিকই বলেছ, ম্যাম। চলার পথে ঝোলানো হোলস্টার অনেক ঝামেলা এড়াতে সাহায্য করে।'

'তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ, হোল্ডার?' রাগ উধাও হয়েছে রায়নার। তার বদলে ফুটে উঠল সব হারানোর হাহাকার।

'হ্যাঁ, ম্যাম। আমি জানি, ডেভিলকে খুবই পছন্দ কর। তাই ফিরে এলাম বলতে, তোমার মত অ্যাঞ্জেলের কাছেই ভাল থাকবে ডেভিল।' র‍্যাভেনের মুখ ঘুরিয়ে নিল রেক্স। ডেভিলের লাগাম ধরে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল রায়না।

পোর্চের সামনে জটলা দেখে থামল রেক্স। যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়েছে হেণ্ডারসনের লোকজন। প্রতিপক্ষ রুফাস হেক্টরের নেতৃত্বে ছয় গানহ্যাণ্ড।

ম সমীকরণ। গোলাগুলি হলে হেণ্ডারসনের কেরা কোনও সুযোগই পাবে না। হ্যাটটা নে টেনে দিয়ে জটলার দিকে চলল জেসন।

'তোমাকে তো বলেছি, হেক্টর, রেক্স হার্বার্ট সেনি এখানে,' বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল ডাম হেণ্ডারসন।

'আমার লোক নিজ চোখে দেখেছে এখানে সতে,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল হেক্টর।

'তোমার লোক ঠিকই দেখেছে একজনকে সতে, হেক্টর,' কথা শুনে সবক'টা চোখ ঘুরল রেক্সের দিকে। 'তবে সে এখানে পৌঁছায়নি।'

'তুমি কে হে, চাঁদ?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল র।

'বস, ওর নাম জেসন হোল্ডার,' বলল রের এক স্যাঙাৎ।

'ওহ! সেই কাপুরুষটা?' তাচ্ছিল্য ফুটল রের কণ্ঠে, 'তা হলে কোথায় গেল সেই দুর্ধর্ষ ম্যান রেক্স হার্বার্ট ওরফে ফ্যান্টম?'

'পালিয়ে গেছে,' হেক্টরের কথা পাত্তা না য়ে বলল রেক্স। 'ওকে বললাম, এখানে সব লোকের ছড়াছড়ি। বাঁচতে চাইলে সময় তেই কেটে পড়া উচিত।'

খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠল হেক্টর। 'রেক্স র্ট তোমার কথায় লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছে, আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ?'

শ্রাগ করল রেক্স। 'ও রেক্স হার্বার্ট ছিল না। নাম আলবার্তো পেরেইরা।'

'মেক্সিকান দস্যু আলবার্তো!' বিস্মিত কণ্ঠে ল হেক্টর, 'ধরে নিচ্ছি, তুমি মিথ্যে কথা ছ!'

'ধরাধরির কিছু নেই, হেক্টর,' নিরুত্তাপ বলল রেক্স, 'আমাকে মিথ্যুক বললে পিস্তল দিয়ে সেটা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। যতদূর জানি, রেক্স হার্বার্ট তোমাকে ওর পথ থেকে দূরে থাকতে বলেছিল।'

রুফাস হেক্টরের সঙ্গে ওর বাতচিত শুনে অবাক হয়েছে দু'পক্ষই। ডেভিলকে নিয়ে কখন বাবার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে রায়না, কেউই খেয়াল করেনি। ডরপুক হোল্ডারের কথা শুনে মাথা ঘুরছে ওর। বাবাকে ধরে তাল সামলে নিল।

তবে বেতাল হয়নি রুফাস হেক্টর। নিজ দক্ষতার উপর পুরো আস্থা আছে তার। 'তবে তাই হোক,' ঘোড়া থেকে নেমে বলল সে। তার ইঙ্গিতে স্যাঙাৎরা সরে গেছে লাইন অভ ফায়ার থেকে। সরে গেছে রকিং এ টি'র লোকজনও।

'তোমাকে তিন পর্যন্ত গোনার সময় দেব, তারপর পিস্তলে হাত দেব,' ব্যঙ্গ করে বলল হেক্টর।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে রেক্স। স্থির, অবিচল। 'গোনাগুনির দরকার নেই, যখন খুশি পিস্তলে হাত দিতে পারো,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল ও, সেই সঙ্গে হ্যাটটা ঠেলে দিল মাথার পেছনে।

চোখ কপালে উঠল হেক্টরের। 'হায়, যিশুর মা মেরি!' আঁতকে উঠেছে, 'রেক্স... হার্বার্ট... ফ্যান্টম... তুমি... তুমি... এখানে?'

স্থির চোখে হেক্টরকে দেখছে রেক্স। স্নায়ু যুদ্ধে টিকতে না পেরে চোখ নামিয়ে নিল হেক্টর। নেতার কাপুরুষতায় বিরক্ত হয়ে ফিরতি পথ ধরল সঙ্গের গানম্যানরা। পশ্চিমে কাপুরুষের কোনও স্থান নেই।

ফিসফিসানি চলছে হেণ্ডারসনের লোকজনের মধ্যে। সবাই তাকিয়ে আছে হেক্টরের দিকে। ঘোড়ার দিকে এগোচ্ছে সে।

বনায় সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের যে-কোনও বই এবং রহস্যপত্রিকার জন্য আসুন–

বিকিকিনি মার্ট

২৯ নিউ মার্কেট, পাবনা।

মোবাইল: ০১৫৫৮-৬৯৬৯৩২

৭/১২/১৬ প্রকাশিত হচ্ছে

ওয়েস্টার্ন

ডুয়েল

তৌফির হাসান উর রাকিব

প্রিয় পাঠক, নাগরিক জীবনের ব্যস্ততাকে পাশ কাটিয়ে, চলুন খানিকক্ষণের জন্য ঘুরে আসি রোমাঞ্চকর বুনো পশ্চিম থেকে। সেখানে আপনার প্রতীক্ষায় আছে, গোটা পশ্চিমের অন্যতম সমৃদ্ধশালী র‍্যাঞ্চ, 'সার্কেল আর'-এর একমাত্র উত্তরাধিকারী, সুদর্শন কিন রাইনার। অস্থায়ী টেক্সাস রেঞ্জার থেকে শুরু করে টাউন মার্শাল, সব ক্ষেত্রেই নিজের দক্ষতা জানান দিয়ে চলেছে এই দুর্ধর্ষ যুবক। আছে অফিশিয়াল লায়ন হান্টার, রায়ান। সিংহ শিকারের পাশাপাশি মানুষ শিকারেও যার জুড়ি মেলা ভার। আছে লাস্যময়ী ভিক্টোরিয়া এবং অনিন্দ্যসুন্দরী ট্রিসা মিলিগান।

সেই সঙ্গে ভিন্নধর্মী এক অতিপ্রাকৃত পশ্চিমের গল্প শোনানোর অপেক্ষায় থাকা লুইস হারনারকে সাহস জোগাচ্ছে কিংবদন্তীর নায়ক, ওয়াইল্ড বিল হিকক! আমাদের প্রত্যাশা, ওদের সবার সঙ্গে সময়টা বেশ ভালই কাটবে আপনার।

দাম ■ ছিয়াশি টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

এখনও দাঁড়িয়ে আছে রেক্স হার্বার্ট। নিজে দেখছে হেক্টরকে।

হঠাৎ করেই হঠকারি সিদ্ধান্ত নিল হেক্টর। ঘুরল রেক্সের দিকে। ছোবল মারল হোলস্টারে। ওই পর্যন্তই।

শুধু হোলস্টারের স্পর্শ অনুভব করল হেক্টর, তারপর কপালে রেক্স হার্বার্টের দুটো গুলি নিয়ে চিরকালের জন্যে ঘুমিয়ে গেল। আত্মা হারিয়ে গেছে বিদেহী।

'শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করি ঝামেলা এড়াতে, তুমিই বাধ্য করলে, হেক্টর,' নিচু স্বরে বলল রেক্স। কোনও দিকে না চেয়ে এক লাফে উঠে বসল র‍্যাভেনের পিঠে। সেই মুরুব্বির কথা এতক্ষণে মনে পড়ল। সজোরে চাপড় মারল র‍্যাভেনের পাছায়। উল্কাবেগে বেরিয়ে গেল রানশের ফটক দিয়ে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব সবাই।

সবার আগে সামলে নিল রায়নাই, বাবার বুকে মাথা রেখে ভেঙে পড়ল অদম্য কান্নায়।

'কী হয়েছে, মা, কাঁদছিস কেন?' মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল অ্যাল হেণ্ডারসন। 'ওকে ফেরাতে চাস?'

মাথা ওপর-নিচ করল রায়না।

'তো ধরে নিয়ে আয়,' বুদ্ধি বাতলে দিল পোড় খাওয়া রানশার।

কান্না-হাসির অপূর্ব ক্যানভাসে পরিণত হলো অপরূপার মুখ। চড়ে বসল ডেভিলের পিঠে। ডেভিলকে দৌড়ে হারাবার ক্ষমতা র‍্যাভেনের। জালিয়াতটাকে ঠিকই পাকড়াও করবে রায়না।

খোলা ট্রেইলে ধূলির ঝড় বইয়ে দিচ্ছে র‍্যাভেন। নতুন কোনও শহরে হয়তো আব্রাহাম লিংকন নাম নিয়ে হোটেলে উঠতে হবে, বিরক্ত হয়ে ভাবল রেক্স হার্বার্ট। ট্রেইলের খানিকটা পেছনে উঠেছে ধূলিঝড়।

সামনের নির্ভীক রাইডারকে চিরকালের জন্যে পাকড়াও করতে ছুটে আসছে অপ্সরা এক দেবী। এবার আর কোথাও পালাবার উপায় নেই নির্ভীক রাইডারের!

[বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

বিপর্যয়

আনোয়ার

সে গরম যে কী ছিল, নানা টের পেলেন কাজ শেষ হবার পর।

আমরা কাজ করতাম কাঁসা-পিতলের, তো এই সব মালামাল আমাদের পোড়াতে হত, গলাতে হত এবং পানিতে ঠাণ্ডাও করতে হত। পানিতে ঠাণ্ডা করার পর সেই পানি যে কী পরিমাণে গরম হত, তা যে জানে না, তার পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।

শীতে আমরা গরম পানি একটা বড় গামলায় রাখতাম, তারপর পানির ময়লাগুলো থিতিয়ে গেলে, ওপরের পরিষ্কার পানি ঠাণ্ডা পানির সঙ্গে মিশিয়ে গোসল করতাম। বেশ আরামদায়ক ব্যবস্থা।

তো সেদিন পানি পাহারা দেয়ার দায়িত্ব আমার বড় ভাই ঈদুর উপর। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, যেন কেউ এই পানিতে পড়ে না যায় বা ভুল করে হাত না দেয়। প্রচণ্ড শীত। এই সময় নানা এলেন পিতলের বদনা হাতে, বদনাও বরফের মত ঠাণ্ডা। নানা নলটা ধরে বদনা ডুবিয়ে অল্প একটু পানি নিলেন প্রস্রাব করার জন্য।

ঈদু ভাই যথারীতি সাবধান করলেন, 'নানা, পানি কিন্তু খুব গরম।'

নানা বলেন, 'হোক একটু গরম, ঠাণ্ডার দিন।'

কিন্তু সে গরম যে কী ছিল, নানা টের পেলেন কাজ শেষ হবার পর।

পানি ঢালার সঙ্গে-সঙ্গে বদনা একদিকে আর নানা আরেক দিকে ছিটকে পড়লেন। আর সারা বাড়ি জুড়ে শুরু হলো তাণ্ডব।

সবার মাথায় বাজ।

পরবর্তী ঘটনা আপনারা কল্পনা করে নিন।

নানা আজ নেই। আমাদের খুব ভালবাসতেন তিনি। আল্লাহ যেন তাঁর বেহেস্ত নসীব করেন। ■

জানা-অজানা

করমর্দন বা হ্যাণ্ডশেক প্রথা কীভাবে শুরু হয়

প্রাচীন মানুষ হাতকে শক্তি ও ক্ষমতার প্রতীক বলে ভাবত। হাত দিয়েই মানুষ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করত। মানুষের ভাষা তখনও সমৃদ্ধি লাভ করেনি। তাই যখনই কেউ তার হাত অন্য কারও দিকে বাড়িয়ে দিত, অন্য ব্যক্তিটিও তখন তার হাত ধরে নিত। তখনই তা বন্ধুত্ব বা শুভেচ্ছার প্রতীক বলে মনে করা হত। করমর্দন করবার রীতির সূত্রপাত হয় গ্রীসে। গ্রীসের আদি অধিবাসীরা কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের ডান হাতটি বাড়িয়ে আগন্তুকের ডান হাতটি ধরত। ধীরে-ধীরে রীতিটি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে, এটি একটি সাধারণ প্রথা হয়ে দাঁড়াল। আজ যখনই আমরা আমাদের পরিচিত মানুষদের সঙ্গে মিলিত হই, তখন আমরা আমাদের হাতটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়িয়ে তাদের সঙ্গে করমর্দন করি।

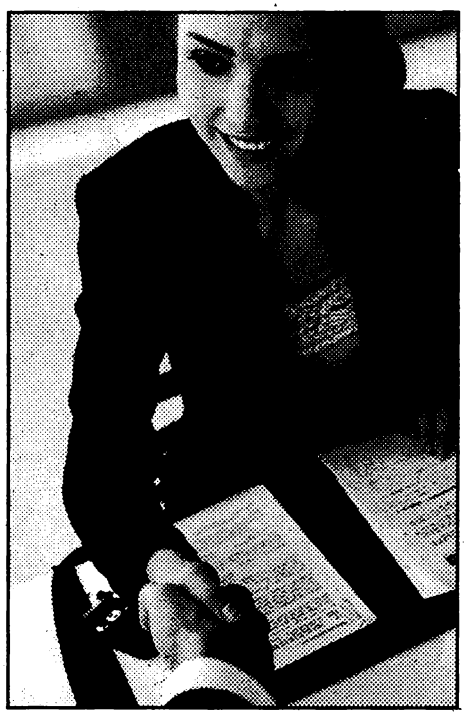

বিভক্ত রাজধানী

কোনও-কোনও রাষ্ট্রের রাজধানীকেন্দ্রিক কাজ-কর্ম একটি মাত্র শহরে বিদ্যমান নয়, বিভিন্ন শহরে বণ্টিত হয়ে থাকে। যেমন: নেদারল্যাণ্ডসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আইন পরিষদ হেগ-এ অবস্থিত, কিন্তু রাজকীয় প্রাসাদসহ অন্যান্য সরকারি দফতর আমস্টারডামে। এ ধরনের রাজধানীকে বিভক্ত রাজধানী বলে।

মুস্টেরীয় শিল্প

আধুনিক মানবজাতির পূর্বপুরুষ নিয়ানডারথাল মানবের সংস্কৃতিকে মুস্টেরীয় সংস্কৃতি বা শিল্প নামে অভিহিত করা হয়। এই সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কিছু আদিম স্তরের প্রস্তর হাতিয়ার। দুটো প্রস্তর খণ্ড পরস্পর আঘাতে ভেঙে যাওয়ায় পাথরের ফলকসমূহ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হত। ফ্রান্সের লেমুস্টিয়ার নামক স্থানে সর্বপ্রথম এধরনের হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া যায় বলে এই হাতিয়ার শিল্পকে মুস্টেরীয় শিল্প হিসেবে নামকরণ করা হয়। ■

সংগ্রহে: **শাহরীন সোনিয়া**

অতিপ্রাকৃত উপন্যাসিকা

ইনফার্নো

তৌফির হাসান উর রাকিব

এক

নিতান্ত সাদাসিধে ধরনের মানুষ বিমল কর; সাত চড়েও রা করে না। জগৎ-সংসার সম্পর্কে এতটা নির্লিপ্ত মানুষ কদাচিৎই চোখে পড়ে।

ভিতরে অনুভূতি যেমনই হোক না কেন, বাইরে তার চেহারা সারাক্ষণই ভাবলেশহীন। জাগতিক কোন ব্যাপারে চোখে পড়ার মতন কোন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে বিমল, এমনটা কেউ কখনও দাবি করতে পারবে না।

তীব্র আনন্দ কিংবা তীব্র বেদনায়, একই রকম নির্বিকার লোকটা। মানুষ হয়েও আদতে একটা রোবট-জীবন যাপন করে চলেছে সে।

সকালে ঘুম ভাঙার পর বাড়িতে কোন নাস্তা জোটে না বিমলের। স্ত্রী মালতি দু'চোখে দেখতে পারে না তাকে। সাতসকালে বিমলের জন্য নাস্তা বানানোর কথা কল্পনাও করতে পারে না মহিলা।

এর নেপথ্যের কারণ হিসেবে অবশ্য বছর কয়েক আগে ঘটে যাওয়া একটা দুর্ঘটনাকে দায়ী করে লোকে। তবে কেবল মালতিই জানে, এই সীমাহীন বিতৃষ্ণার পিছনে ওই ঘটনাটার চাইতেও বড় আরেকটা কারণ রয়েছে।

এক সকালে একমাত্র ছেলে অমলকে নিয়ে তড়িঘড়ি করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বিমল। ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে তবেই অফিসে যায় সে। মোটর সাইকেল থাকায়, পথের যানজট খুব একটা বড় বাধা ছিল না ওদের জন্য।

তবে আদতেই সেদিন বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল, কেবল মিনিট পাঁচেকই বাকি ছিল অমলের অ্যাসেম্বলি শুরু হওয়ার। নিতান্ত বাধ্য হয়েই অন্যান্য দিনের তুলনায় খানিকটা জোরে বাইক ছুটিয়েছিল সেদিন বিমল। তবে তার জানা ছিল না, বিধাতা ঠিক কী লিখে রেখেছিল তার ভাগ্য লিপিতে!

বড় রাস্তার মোড়ে পৌঁছতেই সিগন্যাল ভাঙা একটা ট্রাক বেপরোয়া গতিতে ছুটে এল ওদের দিকে। চোখের পলকে ওটার তলায় চাপা পড়ে গেল ছোট্ট বাইকটা।

ট্রাকের দানবীয় চাকায় পিষে গেল অমলের ছোট্ট দেহটা, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মারা গেল সে।

তবে উপস্থিত সবার চক্ষু চড়কগাছ করে দিয়ে, প্রায় বহাল তবিয়তে ট্রাকের তলা থেকে বেরিয়ে এল বিমল! এখানে-ওখানে খানিকটা কেটে-ছড়ে গেছে বটে, তবে বলার মত বড় ধরনের কোন চোট পায়নি সে।

একমাত্র সন্তানের রক্তাক্ত মৃতদেহ সহ্য করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোন মায়েরই নেই; মালতিও তার ব্যতিক্রম নয়। গগনবিদারী আর্তনাদ করে সেদিন ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল সে।

তীব্র যাতনার মধ্যেও হতবাক হয়ে লক্ষ করেছিল, চোখে এক ফোঁটা জল নেই বিমলের; নিস্পৃহ চেহারা নিয়ে ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা!

লোকটা কি সত্যিই মানুষ? নাকি আস্ত একটা পিশাচ?

সন্তান হারানোর ক্ষতে সময়ের প্রলেপ পড়ল ঠিকই, তবে সেদিনের সেই নির্লিপ্ততার জন্য বিমলকে কোনদিনও আর ক্ষমা করতে পারল না মালতি। তবে কেবল অমলের জন্যই এখনও লোকটার ঘর করছে সে। নাহয় বহু আগেই বিমলের কপালে লাথি মেরে যেদিকে দু'চোখ যায়, সেদিকে চলে যেত মালতি।

মহল্লার এক কোণে একটা কানাগলির মুখে আবুল মিয়ার চায়ের দোকান। চা-বিড়ির পাশাপাশি সেদ্ধ ডিম আর গুলগুলাও বিক্রি করে আবুল।

রোজ সকালে অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে ওই দোকানে গিয়ে হাজির হয় বিমল। দোকানের লাগোয়া একটা বাঁশের বেঞ্চিতে জুত করে বসে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আবুলের দিকে।

তোমাকে শেখাব, কী করে এই মহা ধুরন্ধর প্রাণীকুলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। কীভাবে ওদেরকে তোমার আজ্ঞাবহ করতে হয় এবং কেমন করে ওদের সাহায্যে খুঁজে পেতে হয় নরকের দরজা! আপাতত, বিদায়!

তার দিকে এক পলকের জন্য তাকায় বটে আবুল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার মুখ ফিরিয়ে নেয় সে। ব্যস্ত হয়ে পড়ে অন্যান্য খদ্দেরদের সঙ্গে বেচাকিনি নিয়ে। দোকান একেবারে খালি হওয়ার আগ পর্যন্ত আর একটিবারের জন্যও বিমলের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না সে।

নিয়মিত কাস্টোমার হওয়া সত্ত্বেও বিমলকে ভীষণ অপছন্দ করে আবুল। সে চায় না যে লোকটা রোজ-রোজ তার দোকানে আসুক। একারণেই এতটা অবহেলা করে সে। চায়, লোকটা বিরক্ত হোক; মানে-মানে কেটে পড়ুক এখান থেকে।

অন্য কিছু নয়, মানুষটার মূক পশুর মত আচরণটাই অসহ্য লাগে আবুলের। সকাল-সকাল এমন একটা পাথুরে মুখ দেখতে কারই বা মন চায়?

কিন্তু কখনওই আবুলের এই মনোবাসনাটা পূরণ করেন না বিধাতা; শত লাঞ্ছনার পরও ঠিকই রোজ সকালে এসে উপস্থিত হয় বিমল!

বিরস বদনে তাকে দু'খানা টোস্ট বিস্কিট আর এক কাপ চা এগিয়ে দিতে হয় আবুলকে। ওই দিয়েই নাস্তা সারে বিমল। তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে দাম মিটিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় বড় রাস্তার উদ্দেশে; অফিসগামী বাস ধরার জন্য।

পিছন থেকে অস্ফুটে খিস্তি আওড়ায় আবুল। অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিমলের অপসৃয়মাণ অবয়বটার দিকে। কেবল দৃষ্টি দিয়ে কাউকে ভস্ম করে দেয়া সম্ভব হলে, অনেক আগেই অঙ্গার বনে যেত বিমল কর!

দুই

রোজ অফিসে ঢুকতেই নিজের টেবিলে রাখা বিশাল একখানা ফাইলের স্তূপের সাথে মোলাকাত হয় বিমলের। তার মাঝারি আকারের দেহটা রীতিমত হারিয়ে যায় ওগুলোর আড়ালে; চট করে বোঝা যায় না, আদৌ ওখানটায় কেউ আছে নাকি নেই!

দর্শনার্থীদেরকে কথা বলতে হয় জিরাফের মত গলা বাড়িয়ে, নইলে বিমলের চেহারা দেখার সৌভাগ্য হয় না ওদের।

এতখানি কাজ করার কথা নয় বিমলের; তবুও তাকে করতে হয়। বলা ভাল, নিতান্ত বাধ্য হয়েই করতে হয়। কখনওবা বসের নির্দেশ, কখনওবা সহকর্মীদের অনুরোধ!

'আজকের মধ্যে ফাইলগুলো দেখে দিন, বিমল বাবু...'

'আজ একটু দেরি করে বাসায় ফিরলে কোন সমস্যা হবে আপনার?'

'অডিট আসছে। বাড়তি কাজ করতে হবে। উপায় নেই।'

'দাদা, আজ আমার শালীর জন্মদিন। না গেলেই নয়। আমার কাজগুলো একটু করে দেবেন, প্লিজ?'

'ছোট ছেলেটাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাব। চারটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন, তাহলে তিনটায় অফিস থেকে বেরিয়ে পড়তে পারি, দাদা। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা।'

'ভাইয়ের জন্য মেয়ে দেখতে যাব। আজ একটু জলদি ফিরতেই হবে, দাদা। আমার এই দুটো ফাইল কিন্তু আপনাকে দেখে দিতে হবে আজ। না বললে শুনব না কিন্তু, দাদা।'

'আপনার ভাবীকে নিয়ে শপিঙে যেতে হবে। জানেনই তো, সংসারে কাদের রাজত্ব চলে। আজ একটু সাহায্য করতে হয় যে, দাদা। এই জীবন আর ভাল লাগে না একদম।'

'রানু পিসিটা হঠাৎ করে মরে গেল! আপনি যদি একটু সাহায্য করেন আমাকে, মরামুখটা দেখার সৌভাগ্য হবে আমার।'

এভাবেই আসে একের পর এক আবদার, কাউকেই মানা করে না বিমল। নির্বিকার ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে লোকের ফাইলগুলো নেয় সে, অনেক রাত অবধি বেগার খেটে কাজগুলো ঠিকঠাক করেও দেয়।

সবার জন্য এত করে, তবুও কারও প্রিয় মানুষের তালিকায় বিমলের নামটা খুঁজে পাওয়া যায় না! কেন যেন কেউই বিশেষ পছন্দ করে না তাকে।

প্রায়ই বিভিন্ন উপলক্ষে কারও না কারও বাড়িতে ছোটবড় পার্টি হয়। অফিসের প্রায় সবাই সেখানে নিমন্তন্ন পেলেও, বিমল কখনও পায় না!

যদিও এ নিয়ে কাউকে কখনও কিছু জিজ্ঞেস করেনি সে, তবুও মাঝেমধ্যে নিজ

থেকেই তাকে কৈফিয়ত দেয় লোকজন। চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে, নাকি? সময়ে-অসময়ে প্রায় সবারই তো উপকারে আসে মানুষটা।

অবশ্য অজুহাতগুলোর সবই ভীষণ খেলো ধরনের; কোন বৈচিত্র্য নেই!

'একেবারে তাড়াহুড়োর মধ্যে হয়েছে পুরো আয়োজনটা। হুলস্থূলের ভিতরে কী থেকে যে কী হয়ে গেল! আপনাকে বলা হয়নি! লজ্জায় একেবারে মরে যাচ্ছি, দাদা।'

'ছোট আয়োজন। পরিবার আর খুব কাছের কিছু মানুষজন ছাড়া বলতে গেলে আর তেমন কেউই ছিল না।'

'আপনাকে তো, দাদা, ফোনে পাওয়াই যায় না। কতবার বললাম, অপারেটর পাল্টান। আপনি তো কানেও তোলেন না আমাদের কথা!'

মুখে মৃদু হাসি নিয়ে সমানে দু'হাত চালাতে-চালাতে লোকজনের মিথ্যে অজুহাতগুলো শোনে বিমল, কখনও কোন প্রতিবাদ করে না। কী লাভ?

পাহাড় প্রমাণ কাজ করেও দিন শেষে তার প্রাপ্তির খাতাটা প্রায় শূন্যই বলা চলে। চার বছর হতে চলল, প্রমোশনের শিকেটা এখনও ছিঁড়ল না তার ভাগ্যে।

তার অনেক পরে জয়েন করা একেকজন ফাঁকিবাজ জুনিয়র, কেবল তেলবাজির জোরে পদোন্নতি পেয়ে-পেয়ে বড় অফিসার বনে গেল। কিন্তু এখনও ঠিক আগের চেয়ারেই বহাল রয়েছে বিমল।

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অবশ্য প্রতি সপ্তাহেই আশ্বাসের বাণী শোনায় তাকে; তার ধৈর্যের প্রশংসা করে।

'হবে, হবে। এবারে আপনারটা হবেই হবে। মন্ত্রণালয় থেকে ফাইনাল কাগজটা এই এল বলে...'

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস পেরিয়ে নতুন বছর চলে আসে। রোজ শত-শত সরকারী আদেশ-নিষেধও আসে; বিমলের পদোন্নতির নির্দেশটাই কেবল আসে না!

বিমলের নিজের অবশ্য এ নিয়ে তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। একমনে নিজের কাজ করতেই অভ্যস্ত সে। প্রমোশনের জন্য আজকাল যে আর কেবল কাজ করাই যথেষ্ট নয়; খানিকটা ছোটাছুটি, খানিকটা তেলবাজিও যে করতে হয়, এটা তাকে কে বোঝাবে!

অবশ্য একেবারেই যে এ নিয়ে কেউ কিছু বলেনি তাকে, ব্যাপারটা ঠিক তেমনও নয়। সহানুভূতিশীল হয়ে কেউ-কেউ আকারে-ইঙ্গিতে বিষয়টা খোলসা করেছে তাকে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। এক বাক্যে জানিয়ে দিয়েছে বিমল, এসব কাজ সে কস্মিনকালেও করতে পারবে না; এগুলো তার ধাতেই নেই।

এরপর আর কী-ই বা বলার থাকে? হতাশ হয়েই হাল ছেড়ে দিয়েছে লোকে। যার প্রয়োজন, তারই যদি গরজ না থাকে, অন্য কারও সেটা নিয়ে ভাববার কী এমন ঠেকা পড়েছে?

কেবল সহকর্মীরাই নয়, অফিসের পিয়ন রাঘবও ভীষণ বিরক্ত বিমলের ওপর। অন্য কেউ ডাকলে চিতার বেগে ছুটে যায় সে। অথচ বিমল ডাকলে শুনেও না শোনার ভান করে থাকে, জায়গা ছেড়ে এক চুলও নড়ে না।

অনেকক্ষণ হাঁকডাকের পর যা-ও বা যায়; অনাগ্রহের স্পষ্ট ছাপ থাকে তার চেহারায়। হয় উদাসীন হয়ে ছাতের দিকে তাকিয়ে থাকে সে, নয়তো গোমড়া মুখে নোংরা নখ দিয়ে ফাইলের কোনা ছেঁড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে! বিমল কী বলে না বলে, সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই থাকে না তার।

রাঘবের তখনকার হাবভাব দেখলে মনে হয়, বিমল কর সাধারণ একজন পিয়ন আর সে নিজেই বুঝি মস্ত কোন অফিসার!

প্রায়ই বড় স্যরের বিভিন্ন কাজের অজুহাত দেখিয়ে বিমলের দেয়া কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায় সে। যদিও তখন তার হাতে কোন কাজই থাকে না!

বিষয়টা বিমলের নিজেরও জানা আছে, তবুও এটা নিয়ে কখনও কোন উচ্চবাচ্য করে না সে। রাঘবকে সবসময় নম্র স্বরেই অনুরোধ করতে অভ্যস্ত সে।

সুযোগটার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে রাঘব; যতভাবে পারে হেনস্তা করে বিমলকে। সিঙ্গাড়া আনতে বললে আনে চমচম, জুস আনতে বললে আনে কোক!

তবে তাতে বিশেষ কোন লাভ হয় না। নির্লিপ্তই থাকে বিমল, রাগে না।

সারাদিন সর্ব সাকল্যে একবেলা মালতির হাতের রান্না খাওয়ার সৌভাগ্য হয় বিমলের; রাতে। তবে খাবারটা তাকে একা-একাই খেতে হয়, মালতি কখনও তাকে সঙ্গ দেয় না। অমল মরার পর থেকেই এই ব্যবস্থা।

একই বাড়িতে একই ছাদের নিচে বসবাসরত এই দুটো প্রাণীর মধ্যে লোক দেখানো সামাজিক সম্পর্কটা ছাড়া, আদতে আর কোন সম্পর্কই নেই। না শারীরিক, না মানসিক।

ওই দুর্ঘটনাটার পর থেকে আজ অবধি মালতিকে কখনও ছুঁয়েও দেখেনি বিমল। মালতির মধ্যেও ঘনিষ্ঠ হওয়ার কোনরকম আগ্রহ প্রকাশ পায়নি।

লোকে ভাবে, ওদের বর্তমান সম্পর্কটা খানিকটা শীতল বটে, তবে অচিরেই এই অচল অবস্থা পাল্টে যাবে। সংসারে আবার ছেলেপুলে এলেই ঠিক হয়ে যাবে সবকিছু। আবারও সুখের সুবাসে ভরে উঠবে ঘর-বাড়ি।

তবে সন্তান জন্মদানের প্রাকৃতিক উপায়টা থেকে যে তারা দু'জন যোজন-যোজন দূরে সরে আছে, এটা কারও কল্পনাতেও নেই।

মাথাব্যথার ব্যারাম আছে মালতির। অতি অল্প শব্দেই চট করে মাথা ধরে যায় তার। টিভির দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না; চোখ জ্বলে। তাই টিভি বলতে গেলে দেখেই না সে।

তবে রাতের আহার পর্ব সমাপ্ত হলে টিভিতে খানিকক্ষণ খবর দেখে বিমল। সেটাও অবশ্য পুরোপুরি শব্দহীনভাবে, যেন মালতির কোন অসুবিধে না হয়।

• এভাবে নিঃশব্দে টিভি দেখতে-দেখতে লিপ রিডিঙে অনেকখানি দক্ষ হয়ে উঠেছে বিমল। বহু দূর থেকেও কেবল ঠোঁট নাড়ানো দেখে মানুষজনের কথোপকথন বুঝতে পারে সে।

তার অফিসের কলিগদের কারও ধারণাও নেই যে, ওদের প্রত্যেকের কত-শত হাঁড়ির খবর জানা আছে বিমলের!

তিন

এক ছুটির দিনের সকালে বিমল করের নিস্তরঙ্গ জীবনটা হঠাৎ করেই আমূল বদলে গেল। ভোরবেলায় চোখ মেলা মাত্রই তার মনে হলো, এভাবে সবার অপছন্দের পাত্র হয়ে গোটা জীবনটা পার করে দেয়ার কোন মানেই হয় না!

সর্বজনবিদিত বাইরের মেকী খোলসটা ভাঙতে হবে তাকে; পুরোপুরি পাল্টে ফেলতে হবে নিজেকে। অন্য কারও জন্য নয়, কেবল নিজের জন্যই বাঁচতে হবে তাকে।

জীবন যদি রোমাঞ্চকরই না হয়, অহেতুক অক্সিজেনের অপচয় করে কী লাভ?

স্টোর রুমের আবর্জনার দঙ্গল ঘেঁটে মান্ধাতা আমলের একটা সিন্দুক বের করল বিমল। খুব একটা বড় নয় জিনিসটা; বহুদিন সেঁতসেঁতে জায়গায় পড়ে থাকার কারণে ডালার এখানে-ওখানে রঙ চটে গেছে।

সিন্দুকটা ওর দাদার সম্পত্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে ওটার মালিক হয়েছে বিমল। দাদার নিজের হাতে লেখা একটা জরাজীর্ণ ডাইরি ছাড়া আর তেমন কিছুই নেই ওটার ভিতরে। বোতাম আকৃতির ছোট-ছোট কিছু পাথর অবশ্য আছে; তবে ওগুলো যে ঠিক কী কাজে লাগে, খোদা মালুম!

বিমলের দাদাকে লোকে পাগল বলত। ঘর-সংসার বাদ দিয়ে অদ্ভুতুড়ে সব কাজে মেতে থাকত লোকটা।

তন্ত্র-মন্ত্রর চর্চা করত; বেশ কয়েকবার বহুদিনের জন্য গায়েবও হয়ে গিয়েছিল সে। কোথায় যেত, কী করত, সেটা কখনও কাউকে খোলসা করেনি সে।

এমন মানুষের সঙ্গে জীবন কাটানো যায় না। তাই বাধ্য হয়েই তার দাদীকে আবারও বিয়ে দিয়েছিল তার ভাইয়েরা। ততদিনে অবশ্য বিমলের বাবা বেশ বড় হয়ে গিয়েছিল।

মায়ের নতুন সংসারে উপদ্রব হতে চায়নি বলে অর্ধ-উন্মাদ বাবার সঙ্গেই রয়ে গিয়েছিল সে। তবে বাবার কোন প্রভাব নিজের ওপর পড়তে দেয়নি লোকটা, অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মতই ঘরকন্না সামলেছে সে।

স্বভাবতই বাবার সিন্দুক কিংবা ডাইরির প্রতি কোনরকম আগ্রহ ছিল না তার। কেবল পূর্বপুরুষদের আত্মাকে কষ্ট দিতে চায়নি বলেই সিন্দুকটাকে ঘরে রেখে দিয়েছিল সে, নাহয় বহু আগেই আঁস্তাকুড়ে ঠাঁই পেত ওটা।

ডাইরিটা বগলদাবা করে বৈঠকখানায় চলে এল বিমল। সোফায় আয়েশ করে বসে পড়তে

শুরু করল।

(মূল ডাইরিটাতে সবকিছু সাধু ভাষায় থাকলেও, বোঝার সুবিধার্থে এখানে চলিত ভাষা ব্যবহার করা হলো।)

দাদার হাতের লেখা চমৎকার, একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার। পড়তে কোন অসুবিধাই হলো না বিমলের।

প্রথম পাতাতেই গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা:

'হে, আমার প্রাণপ্রিয় বংশধর, তোমাকে আজ এক রহস্যময় পথের সন্ধান দিতে চলেছি আমি। তবে আগে বাড়ার পূর্বে তোমাকে সতর্ক করছি, কোন রকম পিছুটান থাকলে এখনই পঠনে ইস্তফা দাও; এই পথ তোমার জন্য নয়। ডাইরিটা রেখে দাও যথাস্থানে, সংসার বিবাগী অন্য কোন সাধকের জন্য; যে একদিন আমার এই সাধনার অংশ হবে।

'একবার এই পথে পা বাড়ালে, পিছিয়ে আসার আর কোন পথ থাকবে না। এলে ভয়াবহ অভিশাপ নেমে আসবে তোমার ওপরে।

'অতএব, ভেবেচিন্তে অগ্রসর হও। জাদুর নেশা, এ পৃথিবীর সবচাইতে বড় নেশা। একবার এই নেশায় মজলে, সাধারণ জীবন অর্থহীন মনে হবে।

'সচেতন অনুসারীই কাম্য আমার, পথহারা পথিক নয়। তোমাকে শুভেচ্ছা।'

ডাইরিটা পাশে রেখে চোখ মুদে খানিকক্ষণ ভাবল বিমল। সত্যিই কি তার কোন পিছুটান আছে?

না। নেই।

দিন কয়েকের জন্য সে বেমালুম গায়েব হয়ে গেলে কিছুই যাবে-আসবে না মালতির। এমনকী চিরকালের জন্যও যদি গুম হয়ে যায় বিমল, একরত্তি দুঃখও পাবে না সে; উল্টো মুক্তি দেয়ার জন্য দিনরাত মনে-মনে তাকে ধন্যবাদ দেবে!

আচ্ছা, তার বাবা কি দাদার লেখা এই ডাইরিটা পড়েছিল? মনে হয়, পড়েনি। যদিও বা কখনও হাতে নিয়ে থাকে, নিশ্চয়ই এই প্রথম পাতাটা পড়েই ক্ষান্ত দিয়েছিল সে।

সংসারী মানুষ ছিল বাবা, বৈরাগী হওয়ার কোন খায়েশ ছিল না তার। চারিত্রিক নির্লিপ্ততার অনেকখানি বাবার কাছ থেকেই পেয়েছে বিমল।

সাতপাঁচ ভেবে আবার ডাইরিটা হাতে তুলে নিল বিমল। মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করল।

'হে, শিষ্য, তোমাকে অভিনন্দন। আজ থেকে সজ্ঞানে রোমাঞ্চকর এক নয়া জীবন বেছে নিয়েছ তুমি। এই সাধক জীবন বড় বিচিত্র, বড্ড আনন্দময়। তোমাকে আশীর্বাদ করছি, নিশ্চয়ই তুমি সফলকাম হবে।

'শুধু একটা বিষয় মাথায় রাখবে, তোমাকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে হবে এই পুস্তক। ভুলেও কখনও এক পৃষ্ঠার কাজ সমাপ্ত না করে অন্য পৃষ্ঠায় যাওয়া চলবে না। তাহলে সমস্ত সাধনাই বৃথা যাবে।

'দেবতারা আকাশে থাকেন, দানবেরা পাতালে। আর আমরা মানুষ জাতি, এই দুয়ের মধ্যখানে অসহায়ের মত আটকে আছি।

'লক্ষ-কোটি বছর আগে দেবতাদের সঙ্গে দানবেরা এক মরণপণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। তার পরপরই নিজেদের সুবিধামত এলাকা ভাগাভাগি করে নিয়েছিল ওরা। স্বর্গ স্থাপন করা হয় অন্তরীক্ষে আর নরকের ঠাঁই হয় পাতালে।

'নভোমণ্ডলের পরিধি অসীম, তবে পাতালের ব্যাপ্তি অসীম নয়। তাই স্বর্গ দর্শন মানুষের জন্য প্রায় অসম্ভব হলেও, নরকের খোঁজ পাওয়া ততটা কঠিন নয়।

'মানুষের খুব কাছাকাছি বসবাস করে, আবার পাতালের সঙ্গেও নিবিড় যোগাযোগ আছে, এমন কোন প্রাণীর কথা কি মনে পড়ে তোমার? পড়ছে না?

জহির বুক হাউস

নিউ মার্কেট প্রথম গেট, ঢাকা।

ইস্টার্ন মল্লিকা, ২/৯৬-এ।

এখানে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের নতুন ও সমস্ত রিপ্রিন্ট বই পাওয়া যায়।

মোবাইল: ০১৭১৫-৩৫২৪৭১

'আমিই বলে দিচ্ছি তাহলে; মূষিক। যাকে আমরা সচরাচর ইঁদুর বলে ডাকি। মাটির ওপরে ওদের নিত্য আনাগোনা, তবে মাটির নিচেই ওদের স্থায়ী বসবাস।

'আমাদের চোখের আড়ালে সুরঙ্গ খুঁড়ে বিশ্বের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে চলে যেতে পারে ওরা। বিনা বাধায় চষে বেড়াতে পারে গোটা পৃথিবী।

'পাতালপুরী সম্পর্কে ওদের চেয়ে বেশি জ্ঞান আর কারোরই নেই। এই জ্ঞান ওরা পেয়েছে বংশানুক্রমে; সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে। একজোড়া ইঁদুরকে ঠিকঠাক বংশ বিস্তার করতে দিলে বছর শেষে সংখ্যাটা সর্ব সাকল্যে প্রায় হাজারে গিয়ে ঠেকবে। বুঝতে পারছ, আমাদের অগোচরে কত লক্ষ-কোটি ইঁদুর ছড়িয়ে আছে এই বিশ্বজগতে?

'হাজার-হাজার বছর ধরে পাতালপুরী সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করেছে ইঁদুরেরা, লুকিয়ে রেখেছে নিজেদের ভিতরে। অন্য কোন প্রাণীর সঙ্গে ভাগাভাগি করেনি, মানুষের সাথে তো নয়ই।

'তবুও বুদ্ধিমান মানুষ ঠিকই জেনেছে ওদের বিভিন্ন ক্ষমতার কথা। যুগে-যুগে এর উপযুক্ত সম্মান দিতেও কখনও কার্পণ্য করেনি। তবে আজও তাদের সবচেয়ে বড় ক্ষমতাটার কথা গোপন রয়ে গেছে সিংহভাগ মানুষের কাছে।

'মানুষ জানে না, নিয়মিতই নরকে আসা-যাওয়া করে ইঁদুরেরা; ওরাই নরকের আসল পাহারাদার!

'আজ আমরা যাকে আগ্নেয়গিরি বলি, সেগুলো আর কিছুই নয়, নরকের একেকটা খোলা মুখ। মানুষকে শায়েস্তা করার জন্যই ইঁদুরেরা কালে-কালে খুলে দিয়েছে ওগুলো। লাভার উদ্গিরণ শেষে এমনভাবে বন্ধ হয়ে যায় পথগুলো যে, ওপথে আর নরকের হদিস মেলে না। কিংবা হয়তো গোটা নরকটাকেই সরিয়ে ফেলা হয় ওখান থেকে। কেবলমাত্র ইঁদুরেরাই জানে নরকের সঠিক অবস্থান এবং ঠিক কীভাবে ওখানে যেতে হয়।

'ইঁদুরেরা ক্ষমতাবান, ভীষণ ক্ষমতাবান। যুগে-যুগে পৃথিবীর নানা প্রান্তের নানা লোকগাথায় ওদের সামর্থ্যের বয়ান আমরা পেয়েছি।

'ক্ষমতা এবং উন্নয়নের দেবতা গণেশ। লোকে বিদ্যার দেবী সরস্বতী কিংবা সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর চেয়ে তাঁর পুজো কোন অংশে কম করে না। তিনি যে একটা ইঁদুরের পিঠে চড়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়াতেন, সেটা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়। কিন্তু এটা কি জানো, ওই বাহন ইঁদুরটা আদতে কী ছিল?

'গণেশ পুরাণের মতে, দেবতা ইন্দ্রের দরবারে একজন সঙ্গীতজ্ঞের নাম ছিল, ক্রাঞ্চা। একদিন ভুলক্রমে মুনি ভামাদেভাকে অপমান করে ফেলেন তিনি। অভিশাপ দেয়া হয় তাঁকে; শেষটায় একটা ইঁদুরে পরিণত হন তিনি।

'কিন্তু তাঁর ছিল প্রচণ্ড রাগ আর সেই সঙ্গে দানবীয় শারীরিক কাঠামো। ক্রোধান্বিত হয়ে ঋষি পরোশারার আশ্রমে হামলা চালান তিনি, তছনছ করে দেন গোটা আশ্রম। নিরুপায় ঋষি গণেশের দরবারে আর্জি জানান; তাঁর ডাকে সাড়া দেন গণেশ। বিশাল শুঁড় দিয়ে তিনি চেপে ধরেন ক্রাঞ্চার গলা; সিদ্ধান্ত নেন, এখন থেকে ওই ইঁদুরের পিঠেই সওয়ার হবেন।

'কিন্তু গণেশের বিশালকায় দেহের ভার বহন করার সামর্থ্য ছিল না ওই ইঁদুরটার। তাই গণেশ পিঠে চড়া মাত্রই ব্যথায় ককিয়ে ওঠে ওটা। এতে গণেশের মনে দয়ার উদ্রেক হয়, তাই নিজেকে অনেকটা হালকা করে নেন তিনি। এরপর থেকে আর তাঁকে বইতে কোনরকম সমস্যা হয়নি বাহক ইঁদুরটার।

'একজন মহা পরাক্রমশালী দেবতা হয়েও সামান্য একটা ইঁদুরের পিঠে সওয়ার হতে কুণ্ঠাবোধ করেননি গণেশ; উল্টো ইঁদুরটাকে প্রাপ্য সম্মান দিয়েছিলেন তিনি। নিজের ভাগের লাড্ডু খেতে দিতেন ওটাকে, ওটার এঁটো করা খাবারও খেয়ে নিতেন নির্দ্বিধায়। সর্বদাই একান্ত একজন বন্ধুর মতন আচরণ করতেন প্রাণীটার সঙ্গে।

'গণেশের শরীর ছিল প্রকাণ্ড, মাথা ছিল হাতির। যতই তিনি নিজেকে হালকা করুন না কেন, অতবড় একখানা পাহাড়সম দেহ বইতে পারাটা, ইঁদুরটার শারীরিক সামর্থ্যেরই প্রমাণ। পরবর্তীতে গণেশের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতারই প্রতীক হয়ে উঠেছিল ইঁদুরটা। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য একটা ইঁদুর আদতে কতখানি গুরুত্ব বহন করে,

সবাইকে সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন গণেশ। অবশ্য হিন্দুদের কেউ-কেউ ইঁদুরকে অপদেবতা কিংবা শয়তানের প্রতিমূর্তি হিসেবেও বিবেচনা করে থাকে।

'চীনদেশে লোকে শূ নামে ডাকত ইঁদুরকে। ওরা বিশ্বাস করত, যে কয়টি প্রাণী সূর্য থেকে আলো বহন করে নিয়ে আসে মর্ত্যে, ইঁদুর তার মধ্যে অন্যতম। ইঁদুরকে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের রক্ষাকর্তাও ভাবত ওদের কেউ-কেউ।

'মিসরে ওদেরকে ভাবা হত ধ্বংসের দেবতা। মিসরীয়রা বিশ্বাস করত, ইঁদুরদের অবাধে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সর্বময় ক্ষমতা দিয়েছেন ঈশ্বর।

'আইরিশরা মনে করত, শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ ভাল ধারণা রাখে ইঁদুরেরা। কোন চমৎকার কবিতা কিংবা সুরেলা গানের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট ওরা হয়! তখন সম্মোহিত করে ওদের দিয়ে যে কোন কাজ করিয়ে নেয়া যায়। সম্ভবত এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই এককালে হ্যামিলিনের বাঁশিওয়ালার মত গল্পগুলো রচিত হয়েছিল।

'রোমানদের বিশ্বাস ছিল, ইঁদুরেরা সৌভাগ্য বয়ে আনে। তবে খ্রীষ্টানদের কেউ-কেউ আজও শয়তানের প্রতীক হিসেবেই দেখে ইঁদুরকে।

'জাপানে ওদেরকে বলা হত, নাজুমি। ভাবা হত, দেবতা দাইককুর বার্তাবাহক এই ইঁদুরেরা। জাপানীদের বিশ্বাস ছিল, নতুন বছরের কেক যদি ইঁদুরেরা স্বেচ্ছায় খেয়ে যায়, তাহলে সে বছর বেশ ভাল ফলন হবে।

'কিছু-কিছু আফ্রিকান উপজাতি এখনও যুদ্ধের ময়দানে ইঁদুরের লোমের মুকুট পরে। তারা বিশ্বাস করে, এই মুকুট ওদেরকে সকল প্রকারের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে। এমনকী শত্রুর ছোঁড়া তীর-বল্লমও ওদের গায়ে না লেগে পিছলে যাবে!

'ইঁদুরদের নিয়ে আগ্রহের কমতি ছিল না মায়ানদের। ইঁদুরের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখত ওরা। শত্রুর হাত থেকে বাঁচার পরিখা, মাটির নিচে সুরঙ্গ খোঁড়া, এসবকিছু সম্ভবত ইঁদুরদের কাছ থেকেই শিখেছিল মায়ানরা। এমনকী প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে ইঁদুরদের দেখাদেখি মাটির নিচে সম্পূর্ণ শহরও গড়ে তুলেছিল ওরা। শহরগুলোয় ঢোকার মুখে যে ধাতুর তোরণ থাকত, প্রায়শই সেটায় আঁকা থাকত বিশাল কোন ইঁদুরের ছবি। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ প্রায়ই ইঁদুরদের জন্য ভোজসভার আয়োজন করত মায়ানরা!

'ইঁদুর আকৃতির বিশাল-বিশাল সব মূর্তি শহরে স্থাপন করেছিল অ্যাজটেকরা। আপাতদৃষ্টিতে নিরেট মনে হলেও, এর বেশিরভাগই ছিল পুরোপুরি ফাঁপা। নগর রক্ষকের দল অনায়াসে ওগুলোর ভিতরে লুকিয়ে থাকতে পারত। শত্রুকে বিভ্রান্ত করতে যুদ্ধের ময়দানেও ব্যবহার করা হত এসব ইঁদুরের মূর্তি।

'সুমেরীয়দের বিশ্বাস ছিল, ইঁদুরেরা মূলত চাঁদে বসবাস করে। আর চাঁদের গায়ের কৃষ্ণ গহ্বরগুলো আসলে ওদেরই সৃষ্টি!

'আপাতত আর এসব নিয়ে কিছু বলতে চাচ্ছি না, নয়তো এগুলো বলতে বলতেই এই পুস্তকের সবক'টি পাতা ফুরিয়ে যাবে। তুমি নিজেই বরঞ্চ ইঁদুরদের সম্পর্কে খানিকটা পড়াশুনা করে নাও। তারপরও যদি এই ব্যাপারে তোমার আগ্রহ অব্যাহত থাকে, তবেই কেবল পরবর্তী অধ্যায়ের দিকে অগ্রসর হবে। সেখানে আমি তোমাকে মূষিক-সাধনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাব। তোমাকে শেখাব, কী করে এই মহা ধুরন্ধর প্রাণীকুলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। কীভাবে ওদেরকে তোমার আজ্ঞাবহ করতে হয় এবং কেমন করে ওদের সাহায্যে খুঁজে পেতে হয় নরকের দরজা! আপাতত, বিদায়!

চার

অসুস্থতার দোহাই দিয়ে অফিস থেকে দিন কয়েকের ছুটি নিল বিমল। আবেদন করা মাত্রই ছুটি মঞ্জুর হয়েছে তার, কোনরকম ঝক্কি পোহাতে হয়নি। দীর্ঘকালের চাকরি জীবনে ইতিপূর্বে একদিনের জন্যও অফিস কামাই দেয়নি সে!

ইঁদুর বিষয়ক কিতাবের খোঁজে পুরো শহর চষে বেড়াল বিমল। সদ্য প্রকাশিত ঝকঝকে বই থেকে শুরু করে প্রাচীন আমলের রদ্দিমাল, যেখানে যা পেল, খুঁজে-খুঁজে জড় করল। তারপর নাওয়া-খাওয়া শিকেয় তুলে একনাগাড়ে পড়তে শুরু করল।

মালতি বুঝল, কোথাও কোন একটা

গণ্ডগোল হয়েছে; কিন্তু পরোয়া করল না সে। উচ্ছন্নে যাক ব্যাটা, কী আসে-যায়?

তবে আগের তুলনায় কাজের পরিমাণ খানিকটা বেড়েছে তার, এক বেলার পরিবর্তে এখন দু'বেলার খাবার রাঁধতে হয় তাকে। তবে বেশিরভাগ সময় দিনে একবারই কেবল খাবার খায় বিমল, সেটাও একেবারে ভর সন্ধ্যায়। বাকিটা সময় মুখ গুঁজে থাকে বইয়ের পাতায়।

মালতিকে দেখেও যেন দেখে না সে; সবসময় চোখে-মুখে কীসের যেন একটা ঘোরলাগা দৃষ্টি তার! বিমলের চোখের দিকে চোখ পড়লে খানিকটা অস্বস্তিতে ভোগে মালতি; পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো লোকটা?

অবশেষে সপ্তাহ খানেক বাদে মূষিক সম্বন্ধীয় জ্ঞান আহরণ শেষ হলো বিমলের। অনেকটা সময় নিয়ে স্নান সারল সে, তারপর ভরপেট ভাত খেল। মালতির দিকে তাকিয়ে মুচকি একটা হাসিও দিল; গত কয়েক বছরে যে কাজটা একবারও করেনি সে!

নিজেকে ভীষণ হালকা লাগছে তার; শেষতক খুঁজে পেয়েছে নিজের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। দাদার মত মূষিক সাধক হবে সে, জানবে অন্ধকার জগতের নানা খুঁটিনাটি। সাধারণ একঘেয়ে জীবনের প্রতি ঘেন্না ধরে গেছে তার। কী লাভ এভাবে অহেতুক দিনের পর দিন শ্বাস নিয়ে?

যতদিন বাঁচবে, জীবনটাকে পুরোদমে উপভোগ করবে সে। জীবিত মানুষ হিসেবে নরক পরিদর্শনের সুবর্ণ সুযোগটা হেলায় হারানোর কোন ইচ্ছেই নেই তার। বিফল হলেও ক্ষতি নেই তেমন; মাঝখানের উত্তেজনাটাই বা কম কীসে?

সেই সন্ধ্যায় আবারও দাদার ডাইরিটা পড়তে শুরু করল বিমল। একে-একে জানতে লাগল মূষিক-সাধনার যাবতীয় নিয়ম কানুন। কিছু-কিছু বিবরণ এতটাই বীভৎস যে, পড়তে গিয়েই শরীরের সবক'টা লোম দাঁড়িয়ে গেল তার; চোখ-মুখ কুঁচকে গেল।

তবুও হাল ছাড়ল না বিমল, লেগে রইল। মনে-মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল, যেভাবেই হোক, এর শেষ দেখে ছাড়বে সে। মাঝামাঝি গিয়ে সটকে পড়ার লোক নয় সে মোটেও; অন্য দশজন মানুষের চেয়ে তার ধৈর্যের পরিমাণ বেশি বৈ কম নয়। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও যজ্ঞগুলো করতে পিছপা হবে না সে।

এক রাতে কৌতূহলবশত বিমলের ঘরে উঁকি দিল মালতি। দরজাটা ভেজানো, লক করেনি বিমল। ঘরের সবক'টা বাতি নেভানো; তবে জানালা-দরজার ফাঁকফোকর দিয়ে বাইরের খানিকটা আলো ঠিকই ঢুকে পড়ছে ঘরে। তাতে অবশ্য ভিতরের গুমট অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি, তবে চেনা ঘরে অতটুকু আলোই যথেষ্ট মালতির জন্য।

অন্দরের দৃশ্যটায় চোখ পড়তেই ভীষণ চমকে উঠল মালতি। অকারণেই ধক্ করে উঠল বুকের ভিতরটা। যা দেখছে, ঠিক দেখছে তো?

ঘরের মধ্যখানটায় চোখ মুদে পদ্মাসনে বসে আছে বিমল। পুরোপুরি দিগম্বর, একরত্তি সুতোও নেই তার পরনে। গায়ে কী যেন একটা মেখেছে সে। আবছা আলো-আঁধারিতেই রীতিমত চকচক করছে তার শ্যামবরণ দেহটা।

ঘরের বাতাস ভারী হয়ে আছে অচেনা একটা গন্ধে। গন্ধটা ভীষণ বিশ্রী, চট করে নাকে লাগে। বিমলের শরীরে মাখা তেলটা থেকেই এই বিচ্ছিরি গন্ধের উৎপত্তি কিনা, খোদা মালুম!

চোখজোড়া বন্ধ থাকলেও ঠোঁটদুটো অনর্গল নড়ছে তার। নিচু স্বরে কী যেন জপে চলেছে সে। শ্বাসের সঙ্গে বুকের ওঠানামার গতিটা এতটাই ক্ষীণ যে, ভালমত না তাকালে প্রায় নজরেই পড়ে না। কেবল ওই ঠোঁটজোড়া অনড় থাকলে, অবলীলায় একখানা পাথুরে মূর্তি বলে চালিয়ে দেয়া যেত তাকে।

চটজলদি ওখান থেকে সরে এল মালতি; সারা শরীর ঘামছে তার। নাড়ির গতি বেড়ে গেছে অনেকখানি; হাঁটু দুটোতেও ঠিক জোর পাচ্ছে না সে। দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে, চোখের তারায় স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ। কোনমতে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে নিজের ঘরে ফিরে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিল সে।

কী হয়েছে লোকটার? মাথা-টাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো? পাগল তো সে আগেই ছিল, এখন কি তাহলে বদ্ধ উন্মাদ বনে গেছে? কী করা উচিত এখন মালতির? ভাইদেরকে সবকিছু খুলে বলবে?

বহুদিন ধরেই বিমলকে ডিভোর্স দেয়ার

জন্য চাপ দিয়ে আসছে মালতির আত্মীয়-স্বজনেরা, কিন্তু মালতি কখনও রাজি হয়নি। লোকটাকে পছন্দ না করলেও, কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। অতীতে একে অপরকে ভালবাসত ওরা, সুখের একটা সংসার ছিল। চাইলেই সেসব দিনের অজস্র টুকরো-টুকরো সুখের স্মৃতিগুলো মন থেকে তাড়ানো যায় না।

ভালবাসা নেই; কিন্তু বিমলকে ছেড়ে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধার কথা কল্পনাও করতে পারে না মালতি। স্বামীকে ছাড়া যায় ঠিকই, কিন্তু নিজের সন্তানের পিতাকে কি অস্বীকার করা যায় কখনও?

এতদিন ঘরে সুখ ছিল না সত্যি, তবে জীবন ঠিকই চলছিল তার নিজস্ব গতিতে। কিন্তু এখন? একজন উন্মাদের সঙ্গে সংসার করাটা কতটা নিরাপদ?

আজ অবধি মালতির শীতল আচরণের জন্য কখনও কৈফিয়ত চায়নি বিমল, নীরবেই সহ্য করে গেছে সমস্ত অবহেলা। এজন্যই হয়তো তাকে ছেড়ে যেতে মন সায় দেয়নি মালতির। তার অবচেতন মন হয়তো দেখতে চেয়েছে, তাকে ঠিক কতটা ভালবাসে বিমল!

পরের সন্ধ্যায় বিমল খেতে বসলে, নিজের অজান্তেই টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল মালতি। নিজ হাতে খাবার তুলে দিল বিমলের টিনের থালায়।

ব্যাপারটা বহু বছর পর ঘটলেও, খুব স্বাভাবিকভাবেই নিল বিমল। এমন ভাব করল, যেন রোজই তাকে খাবার বেড়ে দেয় মালতি!

হালকা গলায় বলল, 'তুমি খাবে না?'

মুখ তুলে তার দিকে তাকাল মালতি। জবাব দেবে কিনা, সেটাই বোধহয় ভাবল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, 'পরে খাব। তুমি খাও।'

আলতো করে মাথা নাড়ল বিমল, মুখে কিছু বলল না। প্লেটের খাবারের দিকে মনোযোগ দিল সে। হাত বাড়িয়ে খানিকটা নুন তুলে নিয়ে, ভাত মাখিয়ে, খেতে শুরু করল।

হতবাক মালতি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল বিমলের নিরাসক্ত চেহারার দিকে। তারপর হতাশ গলায় বলল, 'তোমার সমস্যাটা কী?'

খাওয়া অব্যাহত রাখল বিমল। 'কই! কোন সমস্যা নেই তো!'

'সমস্যা না থাকলে অফিসে যাচ্ছ না কেন? চাকরি চলে গেছে?'

'চাকরি চলে যাবে কেন! কয়েক দিনের ছুটি নিয়েছি।'

'কেন? কী করো তুমি সারাদিন ঘরে বসে?' সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল মালতি।

এতক্ষণে মুখ তুলে তাকাল বিমল; আগ্রহ ফুটে উঠেছে দু'চোখে। 'জীবনটা পাল্টাতে চাইছি, বুঝলে...ভীষণ একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল সবকিছু।'

'ও আচ্ছা। ভাল,' নিরুত্তাপ গলায় বলল মালতি। 'তা কীভাবে করতে চাচ্ছ কাজটা, শুনি?'

চওড়া হাসি ফুটল বিমলের চেহারায়। 'দাদার লেখা একটা ডাইরি খুঁজে পেয়েছি। ওতেই বিশদভাবে লেখা আছে সমস্ত নিয়মকানুন।'

'দাদা! তোমার দাদা?' দ্রুত বলে উঠল মালতি। 'আমি তো জানতাম, পাগল ছিলেন উনি।'

নিমেষেই হাসি মুছে গেল বিমলের মুখ থেকে, চোখ-মুখ কঠিন হয়ে গেল। 'ভুল জানতে। মোটেও পাগল ছিলেন না তিনি। লোকে খামোকাই তাঁর নামে ভুলভাল বলত। সত্যি বলতে, অনেক বড় একজন মূষিক-সাধক ছিলেন তিনি।'

'কী ছিলেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল মালতি।

'মূষিক...ইঁদুর, ইঁদুর। ইঁদুরের সাধনা করতেন তিনি।'

'ইঁদুরের সাধনা!' আপনমনে বিড়-বিড় করল মালতি। 'তাহলে তো ঠিকই বলত লোকে! সত্যিই দেখছি বদ্ধ উন্মাদ ছিল লোকটা!'

'মোটেও না, মালতি। একেবারেই সুস্থ একজন মানুষ ছিলেন তিনি। আমাদের যে কারও চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখতেন মাথায়,' চটজলদি বলে উঠল বিমল। 'ইঁদুরদের ক্ষমতা সম্পর্কে তেমন কোন ধারণাই নেই মানুষের। একারণেই হয়তো সবার কাছে এতটা অস্বাভাবিক লাগে ব্যাপারটা।'

'তাই বুঝি?' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল মালতির কণ্ঠে। 'তা কী-কী ক্ষমতা আছে মহা পরাক্রমশালী ইঁদুরদের?'

তার গলার উপহাসের সুরটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল বিমল। 'অনেক ক্ষমতা, অনেক। সারা রাত বর্ণনা করেও শেষ করা যাবে না সেসব। তবে তুমি জানতে চাইলে, ওদের একটা বিশেষ ক্ষমতার কথা বলতে পারি তোমাকে।'

'বলো তাহলে। শুনে ধন্য হই।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল বিমল; পুরো বিষয়টায় খানিকটা বাড়তি গুরুত্ব আরোপের প্রয়াস পাচ্ছে। 'নরকের সন্ধান জানে ইঁদুরেরা। এই সাধনায় সফল হলে, জীবিত মানুষ হয়েও নরক দর্শন করতে পারব আমি।'

'অন্যদেরকে নরক দেখানোর ক্ষমতা তো তোমার এখনই আছে,' চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল মালতি। 'আমার জীবনটা কোন দোজখের চাইতে কম কীসে?'

চমকে উঠল বিমল। কথাটার মর্মার্থ অনুধাবন করতে, বেশ খানিকটা সময় লাগল তার। পরক্ষণেই চেহারাটা রক্তবর্ণ ধারণ করল, ভীষণ রেগে গেছে।

তবে সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপও করল না মালতি; অনল বর্ষণ অব্যাহত রাখল। 'এক সপ্তাহ সময় দিলাম তোমাকে। ভাল চাইলে এসব পাগলামি ছেড়ে-ছুড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরত এসো। নইলে ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে তোমার জন্য, এই আমি বলে দিলাম।'

এক মুহূর্তের বিরতি নিয়ে আবারও মুখ খুলল সে, 'যদি ভেবে থাকো, বাপের বাড়িতে চলে যাব আমি; তাহলে ভুল ভাবছ। যেতে চাইলে অনেক আগেই যেতে পারতাম, এতদিন অপেক্ষা করতাম না। আমি নই, তোমাকেই বরঞ্চ জায়গামত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। সেটা কোথায়, বুঝতে পারছ তো? পাগলা গারদে। আমার মনে হয়, দিনে-দিনে মানব সমাজে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছ তুমি!'

সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল মালতি, হন-হন করে হেঁটে চলে গেল তার শোবার ঘরের উদ্দেশে।

আরও বহুক্ষণ সেখানেই ঠায় বসে রইল বিমল, উথলে ওঠা ক্রোধটাকে দমন করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে তাকে।

মধ্যযুগে বন্দিদের ওপর ইঁদুরদের দিয়ে অত্যাচার চালাত সম্রাটরা। একটা ইঁদুরকে কয়েকদিন ধরে অভুক্ত রাখা হত, এতে করে ভীষণ ক্ষুধার্ত আর হিংস্র হয়ে উঠত জানোয়ারটা।

নির্দিষ্ট দিনে একজন বন্দিকে নগ্ন করে হাত-পা বেঁধে ফেলা হত। তারপর একটা খাঁচা সমেত ইঁদুরটাকে এনে রাখা হত লোকটার পেটের ওপর!

লোহার তৈরি খাঁচাটার অন্য সবদিক বন্ধ থাকলেও, কেবল নিচের দিকটা খুলে দেয়া হত। অনেকটা বাধ্য হয়েই বন্দির পেটের নরম চামড়া খুঁড়তে শুরু করত ইঁদুরটা, ধীরে-ধীরে সেঁধিয়ে যেত উদরের গভীরে! বাঁচার পথ এবং খাবার, দুটোই চাই তার।

পুরোটা সময় সজ্ঞানে ওই ভয়াবহ যন্ত্রণাটা অনুভব করত হতভাগা মানুষটা। তারপর একসময় তীব্র বেদনা অথবা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যেত। কিংবা বলা ভাল, মুক্তি পেত।

মালতিকে এখনই ওই ধরনের কোন শাস্তি দিতে ইচ্ছে করছে বিমলের!

রোমান সম্রাটদের মত ক্ষুধার্ত ইঁদুর ভর্তি একটা গোপন কুঠুরি যদি তার থাকত, নির্ঘাত এখন মালতিকে ওটাতে ঠেলে ফেলে দিত সে।

শত-সহস্র ইঁদুর একযোগ ঝাঁপিয়ে পড়ছে মালতির নধর দেহটার ওপর; দৃশ্যটা মানসপটে কল্পনা করতেই ভীষণ পুলক অনুভব করল বিমল!

পাঁচ

প্রয়াত মূষিক-সাধকের ডাইরির ভাষ্য অনুযায়ী, সাধনার পরবর্তী ধাপের জন্য বেশ কিছু জিনিসপত্র জোগাড় করল বিমল।

একেকটা উপকরণ খুঁজে বের করতে রীতিমত গলদঘর্ম হতে হলো বেচারাকে। সাধনার জন্য যে এসব জিনিসেরও প্রয়োজন পড়তে পারে কখনও, এটা সে কস্মিনকালেও কল্পনা করেনি।

মিয়ানো মুড়ি

খানিকটা ঝোলা গুড়
গোটা দুয়েক পচা ডিম
মাকড়সার ঝুল
দুটো নোনতা বিস্কিট
চালের রুটি
ডুবো তেলে ভাজা সিঙ্গাড়া
গোটা চারেক বাতাসা
একটা মরা টিকটিকি
বাসি পাউরুটি
খানিকটা মাখন
কয়েক বছরের পুরনো গম
আধ কাপ মোরগের রক্ত
কয়েক ছটাক আমন ধানের চিটা
এক মুঠো শুকনো দূর্বাঘাস
কয়েক গাছি বিড়ালের লোম
খানিকটা লাল মাটি
আরও কত কী...!

এসব জোগাড়যন্ত্র করা কি চাট্টিখানি কথা?

তবুও শেষতক ঠিকই সবকিছু এক জায়গায় জড় করল বিমল। একখানা বড় পোড়ামাটির পাত্র খুঁজে নিয়ে, তাতে আধ লিটার পানি ভরে নিল। তারপর সবগুলো উপকরণ ভালমত মিশিয়ে এক ধরনের শরবত মতন তৈরি করল।

জিনিসটা দেখতে অবিকল থকথকে কাদার মত। আর গন্ধটা এমন যে, মরণাপন্ন কোন মানুষের নাকের সামনে ধরলেও লাফিয়ে উঠে পালিয়ে যেতে দিশা পাবে না বেচারা!

একটা বড় মগে তরলটা ছেঁকে নিল বিমল, তারপর কিচেনের মিটসেফে তুলে রাখল সকালে ব্যবহার করার জন্য। ওটাকে পুরো রাত নিজের কাছে রাখার কোন উপায় নেই; রসুইঘরের আলমারিতে লুকিয়ে রাখাটাই নিয়ম। সারা রাতের পর ভোরের একেবারে শুরুর দিকে একদমে পান করতে হবে তাকে জিনিসটা, এর কোন অন্যথা করা যাবে না।

যদিও ওটা গেলার কথা কল্পনা করামাত্রই ভিতর থেকে সমস্তকিছু বেরিয়ে আসার উপক্রম হচ্ছে বিমলের। কিন্তু করার কিছুই নেই তার; হাত-পা বাঁধা। সাধনার উপরিস্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য অদ্ভুত এই শরবতটা গলাধঃকরণের কোন বিকল্পই নেই।

প্রত্যূষে পা টিপে-টিপে রান্নাঘরে গিয়ে মগটা বের করে আনল বিমল। বাইরে তখনও পুরোপুরি আলো ফোটেনি; নিজের ঘরে বেঘোরে ঘুমুচ্ছে মালতি।

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে ঠিকই শেষটায় নিজের গলায় ঢেলে দিল বিমল। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসতে চাইল তার, শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো; তবুও হাল ছাড়ল না সে। নিজের ওপর জোর খাটিয়ে গিলে নিল সবটুকু শরবত, খালি করে ফেলল মগটা। তারপর চোখ বুজে বসে রইল নিজের জায়গায়; শরীরটা কেমন-কেমন যেন করছে তার।

এহেন অখাদ্য একটা জিনিস পেটে চালান করার পর প্রচণ্ড অস্বস্তি লাগার কথা, পেট নেমে যাওয়ার কথা। উল্টো নিজের ভিতরে রাজ্যের ক্ষুধা অনুভব করল বিমল! এই মুহূর্তে প্রাগৈতিহাসিক ম্যামথ সামনে পেলেও যেন কাঁচা চিবিয়ে সাবাড় করে ফেলতে পারবে সে!

ঠিক এমনটাই অবশ্য লেখা ছিল ডাইরিটায়!

অপরিমেয় ক্ষুধা একটা প্রাণীকে ঠিক কতটা বিচলিত করে তুলতে পারে, সেটাই এখন অনুভব করবে বিমল। কোন সাধারণ খাবারেই এই বিশেষ ক্ষুৎপিপাসা মিটবার নয়। গোটা একটা দিন দুর্যোগটা কাটানোর পর, রাতে খুলতে হবে ডাইরির পরবর্তী পাতাটা; ওতেই মিলবে সমাধান।

জাতীয় পত্রিকা ও সেবা প্রকাশনীর বইসহ সৃজনশীল বইয়ের বিপুল সমাহার
আনন্দ বিপণী
১০ খান সুপার মার্কেট, জনতা ব্যাংক মোড়
ফরিদপুর।
মোবাইল: ০১৭১১-২৩৪২৭৩, ০৬৩১৬-৪৪৬৭

বহুদিন পর আবারও সেদিন অফিসের উদ্দেশে তৈরি হলো বিমল। যাত্রাপথে আবুল মিয়ার টঙ দোকানে রোজকার এক কাপ চা আর দুটো টোস্ট বিস্কিটের বদলে, ভরপেট খাবার খেল সে।

চার প্যাকেট মিষ্টি বিস্কিট, দুটো বড় পাউরুটি, দশ কাপ চা আর গোটা পনেরো সেদ্ধ ডিম খেয়ে, আবুল মিয়ার ছানাবড়া চোখজোড়াকে পেছনে রেখে অফিসের উদ্দেশে পা বাড়াল বিমল। তখনও তার পেটের আগুন একরত্তিও নেভেনি!

কিন্তু আবুলের দোকানে এর বেশি আর খাওয়ার উপায় ছিল না। কারণ কেবল দোকানীই নয়, অন্য সব খদ্দেররাও বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে ছিল তার দিকে! এতগুলো মানুষ অপলক তাকিয়ে থাকলে, কারই বা আর খেতে ইচ্ছে করে!

অফিসে ঢুকেই রাঘবকে উচ্চস্বরে বার কয়েক ডাকল বিমল। কান দিল না রাঘব; বিমলকে পাত্তা না দিয়েই অভ্যস্ত সে। গড়িমসি করে অনেকটা সময় কাটিয়ে, তবেই বিমলের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'কী কাম?'

'কিছু খাবার এনে দাও। জলদি।'

'অহন পারুম না। অন্য কাম আছে। বড় সাব যে কোন সময় ডাকবার পারে।'

নিজের ভাগ্যের লিখন সম্পর্কে যদি বিন্দুমাত্রও ধারণা থাকত রাঘবের, ভুলেও আজ বিমলের সঙ্গে বেয়াদবি করত না সে!

বিদ্যুৎ গতিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিমল, সজোরে চেপে ধরল রাঘবের ইউনিফর্মের কলার। তারপর দেহের সর্বশক্তি দিয়ে একখানা রামচড় বসিয়ে দিল তার ডান গালে। ছিটকে দু'হাত দূরে গিয়ে পড়ল রাঘব, মাথাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে তার। বিমলের হাতটা তার গাল ছোঁয়ার আগ পর্যন্ত ঘটনার কিছুই আঁচ করতে পারেনি সে।

কোনমতে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল সে, চেয়ারের হাতল খামচে ধরে নিজেকে ফের পতনের হাত থেকে রক্ষা করল। তারপর হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকাল বিমলের অগ্নিশর্মা চেহারাটার দিকে।

চার চোখের মিলন হতেই আতঙ্কে রীতিমত কুঁকড়ে গেল রাঘব। চোখ তো নয়, যেন এক জোড়া অঙ্গার!

কী হয়েছে লোকটার? রাতারাতি এভাবে বদলে গেল কেমন করে? আজ কেবল ভগবানই পারেন এই দানবের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে।

'ছোটলোকের বাচ্চা,' হিসহিসিয়ে বলল বিমল। 'আর কখনও যদি আমার মুখে-মুখে কথা বলিস, জুতোর তলা দিয়ে তোর ঠোঁট দুটো একদম থেঁতলে দেব আমি।'

তীব্র আতঙ্কে কাঁপতে-কাঁপতে বিমলের কথাগুলো শুনল রাঘব; নড়াচড়া করার সাহসটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছে সে। অবশ্য ভয় কেবল সে-ই নয়, অফিসের বাদবাকি সবাই-ই পেয়েছে। উপস্থিত সবক'টা চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টায় মত্ত; পলক পড়ছে না কারও চোখে! নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে সব ক'জন মানুষ, সত্যিই কি খানিকক্ষণ আগে কিছু ঘটেছিল এখানে? নাকি সবটাই ভ্রম?

সেদিন অন্তত দশ বার বিমলের জন্য খাবার আনতে বাইরে গেল রাঘব, ভুলেও একটা সেকেণ্ড বাড়তি সময় নষ্ট করেনি সে। অন্য কেউও রাঘবকে সেদিন কোন কাজের ফরমায়েশ দিল না; পাছে ওকে না পেয়ে রেগে যায় বিমল!

মিনিট পাঁচেকের জন্য বিমল একবার টয়লেটে যেতেই জাদুমন্ত্রেরস্মত উধাও হয়ে গেল তার টেবিলের বেশিরভাগ ফাইল! সবাই আজ নিজেদের কাজ নিজেরাই করবে; জলদি বাড়ি ফেরার তাড়া নেই আজ কারও!

সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার আগে অন্তত পাঁচটা রেস্টুরেন্টে ঢুঁ মারল বিমল। প্রতিটাতেই অন্তত দশ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের খাবার পেটে চালান করল সে।

বিরিয়ানি, সাদা ভাত, মোরগ-পোলাও, মণ্ডা-মিঠাই, কিছুতেই কিছু হলো না; উদরের এক কোনাও ভরল না তার। পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো; প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত জল গিললেও যেন সেই রাক্ষুসে পিপাসা মিটবার নয়!

বিফল মনোরথে ঘরে ফিরে আবারও দাদার ডাইরিটা হাতে তুলে নিল বিমল, তড়িঘড়ি করে খুলল সমাধান লেখা সেই বিশেষ পাতাটা।

পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে কেবল একটামাত্র শব্দই লেখা ছিল তাতে, 'মানুষের মাংস!'

ছয়

গভীর রাতে নিজের জন্য রাঁধতে বসল বিমল। পুরো মহল্লা ততক্ষণে ঘুমিয়ে কাদা, সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে চরাচরে।

অন্যান্য দিন রাত-বিরেতে চৌকিদারের হাঁকডাক শোনা যায় বটে, তবে আজ সেটাও অনুপস্থিত। নেড়ি কুকুরের দল কোথায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, কে জানে! ওদেরও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

আপনমনে খানিকক্ষণ হাসল বিমল। বহুদিন পর আজ উনুনে হাঁড়ি চড়িয়েছে সে; অথচ একটা সময় রোজই তাকে কিছু না কিছু রাঁধতে হত। রান্নার হাত বরাবরই ভাল ছিল তার। যে-ই খেয়েছে, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারেনি।

তবে বিয়ের পর আর খুব একটা বাবুর্চিগিরি করার মওকা পায়নি সে। পুরুষ মানুষ রসুই ঘরের হাঁড়ি-পাতিলের চারপাশে ঘুর-ঘুর করবে, ব্যাপারটা ভীষণ অপছন্দ ছিল মালতির।

সে রাতে তৃপ্তি সহকারে উদরপূর্তি করে আহার করল বিমল। মূষিক-সাধকের নিদান অনুযায়ী, তার পেটের রাক্ষুসে খিদেটাও মিটে গেল পুরোপুরি!

মাংসের সালনটা অবশ্য বেশ ঝাল হয়েছিল, তবে তাতে খুব একটা সমস্যা হয়নি বিমলের।

বেঁচে থাকতে যে পরিমাণ ঝাঁঝ ছিল মালতির, খানিকটা বাড়তি ঝাল না দিলে তার মাংস মুখে রুচত কিনা কে জানে!

সাত

এক বিকেলে বাক্স-পেঁটরা নিয়ে নিজের গ্রাম, বিজয়পুরে গিয়ে হাজির হলো বিমল। সীমান্তের কাছাকাছি টিলাটক্কর আর খানাখন্দে ভরা একটা পাহাড়ি গ্রাম, বিজয়পুর। বিমলের পৈতৃক ভিটাটা এখনও রয়ে গেছে, বিক্রি করেনি সে।

তার বেশ কিছু চাষবাসের জমিও আছে ওখানে, তবে ওগুলোর খোঁজ খুব একটা রাখে না সে। দূরসম্পর্কের চাচা-জ্যাঠারাই আজতক ভোগদখল করে আসছে জমিনগুলো।

বাড়িটাও এতদিনে জবরদখল হয়ে যেত নির্ঘাত; তবে একটা পুরানো কুসংস্কারই রক্ষা করে চলেছে ওটাকে।

আড়ালে আবডালে পাগল বললেও, বিমলের দাদাকে ঠিকই ভয় পেত লোকে। সেই ভয়টা এখন অবধি কাটেনি। তার যে বিশেষ কিছু ক্ষমতা ছিল, এ নিয়ে দ্বিমত নেই কারও। এমন একজন কামেল তান্ত্রিকের বসতভিটা দখলের কথা কল্পনাও করতে পারে না ওরা। জরাজীর্ণ একটা ইমারতের লোভে নিজেকে নির্বংশ করার কোন মানে হয় না।

আদতেই বেহাল দশা বাড়িটার। কী করে যে এখনও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটাই বিস্ময়কর! সীমানা প্রাচীর বহু আগেই মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, ফটকের কোন বালাই নেই। পুরো বাড়ি জুড়ে ঝোপঝাড় আর আগাছার দঙ্গল, পায়ে হাঁটার পথটুকুও নেই।

দালানটার মুমূর্ষু দশা, রীতিমত ধুঁকছে। বাতাসের একটা জোরদার ধাক্কায়, হুড়মুড় করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। রঙের কোন বালাই নেই, পলস্তারা খসে দেয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে বেশিরভাগ জায়গায়।

এক সময় যেখানে দরজা-জানালা নামের বস্তুগুলো ছিল, এখন সেখানে শুধুই শূন্যতা; কালো ফোকর। খানিকটা ডান দিকে হেলে আছে রুগ্ন ছাত; জমিনের আহ্বানে সাড়া দিতে পুরোপুরি প্রস্তুত!

হাজার টাকা সাধলেও কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এ বাড়িতে জীবন যাপন করতে রাজি হবে বলে মনে হয় না।

তবে আজ রাতটা বিমলকে এখানেই কাটাতে হবে! কারণ ডাইরির বয়ান মোতাবেক, সাধনার শেষ লগ্নে এ বাড়িরই কোথাও উন্মুক্ত হবে নরকের পথটা!

বিমলের এই আকস্মিক আগমনে তার আত্মীয়স্বজনদের কেউই ঠিক খুশি হতে পারল

না। তারা বিমলের সঙ্গে দেখা করতে এল মুখ ভার করে। সবার বদ্ধমূল ধারণা, বিমল এবারে নির্ঘাত সমস্ত জমিজমা বিক্রি করতে এসেছে! হয়তো কোন কারণে টাকাপয়সার টানাটানি চলছে তার, তাই দেখতে এসেছে এখানকার সহায়সম্পত্তি বিক্রিবাট্টা করে কিছু পাওয়া যায় কিনা।

এতদিন ভোগদখল করতে-করতে জমিগুলো নিজেদেরই ভাবতে শুরু করেছিল ওরা। ভাবতেও পারেনি, ন্যায্য দাবি নিয়ে কোন একদিন আচমকা এসে হাজির হবে ওগুলোর প্রকৃত মালিক!

শঙ্কর জ্যাঠার মুখটাই বেজার বেশি; বিমলের সিংহভাগ জমি তার দখলেই আছে কিনা!

শুকনো স্বরে বিমলকে জিজ্ঞেস করল সে, 'তা হঠাৎ কী মনে কইরা গেরামে আইলা, ভাতিজা?'

হাসল বিমল। ওদের মনে কী চলছে, আন্দাজ করতে কষ্ট হচ্ছে না তার। 'এমনিতেই এলাম। বিশেষ কোন কারণ নেই। অনেকদিন আসার সুযোগ হয়নি। তাই ভাবলাম, একবার এসে ঘুরে যাই। আপনাদের সবার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। আপনারা ছাড়া আপন বলতে আর কে-ই বা আছে আমার।'

ঠোঁটে হাসি ফোটানোর বৃথা চেষ্টা করল শঙ্কর। 'ভালাই করসো, ভাতিজা। সেই যে শহরে চইলা গেলা, আর তো গেরামে পা-ও ফেললা না।'

'সেজন্যই এলাম এবার। দিন দুয়েক থাকব, তারপর আবার ফিরে যাব শহরে।'

'জমি-জিরাতের কোন কারবার আছেনি, ভাতিজা?' খুব সাবধানে প্রশ্নটা করল শঙ্কর।

'আরেহ, না, না,' তাকে আশ্বস্ত করল বিমল। 'আমি কেবল দাদার ভিটায় দুটো দিন থাকতে এসেছি। অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।'

এবারে দাঁত কেলানো হাসি ফুটল শঙ্করের মুখে; অন্যদেরও যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আচমকা বিমলকে সমাদর করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই।

'এই বাড়িতে তো আর রাইতে থাহনের উপায় নাই। তুমি আমাগো বাড়িতে চলো। সকালে নাহয় সবকিছু ঘুইরা দেইখো,' বলে উঠল বিমলের চাচা, আদিত্য।

মাথা নাড়ল বিমল। 'না, খুড়ো মশাই। আমাকে রাতে এই বাড়িতেই থাকতে হবে। যদি একটা ঘর খানিকটা পরিষ্কার করে দেন, আর রাতে জ্বালানোর মত একটা লণ্ঠন পাওয়া যায়; তাহলেই চলবে।'

'কও কী তুমি! এইহানে ক্যামনে থাকবা রাইতে! ভূত-প্রেতের কথা নাহয় বাদই দিলাম, সাপ-খোপেরও তো অভাব নাই পুরা বাড়িতে।'

কাঁধ ঝাঁকাল বিমল; হাসছে। 'সমস্যা হবে না, খুড়ো মশাই। সঙ্গে করে কার্বলিক এসিড নিয়ে এসেছি আমি।'

একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল সমবেত জনতা, ঠোঁটে কোন রা নেই কারও। কেন এই পোড়ো বাড়িতে রাত কাটাতে গোঁ ধরেছে বিমল, এটা কারোরই মাথায় আসছে না!

বয়স্ক একজন মানুষকে তো আর জোরও করা যায় না তেমন। কী বলবে, কিছুই মাথায় আসছে না ওদের।

অবশেষে অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল শঙ্কর। হতাশ গলায় বলল, 'খাওন? রাইতের খাওনডা তো অন্তত আমাগো লগে খাইবা, নাকি?'

'তা খাওয়া যায়। এতে কোন আপত্তি নেই আমার,' হাসিমুখে জবাব দিল বিমল।

নিউজ কর্নার

প্রোপ্রাইটর: মোঃ বাহালুল কবীর (বাহার)

দোকান নং ১২, বাড়ি নং ১, রোড নং ১০, আলতা প্লাজা

ধানমণ্ডি, ঢাকা।

এখানে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের সমস্ত নতুন বই পাওয়া যায়।

ফোন: ৮১২৮৩৫৬, মোবাইল: ০১৮১৯-১৫৪৮৪৮

হাঁফ ছাড়ল সবাই। সদলবলে বিমলকে এগিয়ে নিয়ে গেল শঙ্করের বাড়ির উদ্দেশে।

অল্প সময়ে বেশ জমকালো আয়োজনই করা হলো বিমলের জন্য। জানা-অজানা অজস্র পদে বোঝাই হয়ে গেল খাবার টেবিল।

আরও বহুবছর ফসলের খেতগুলো ভোগদখল করতে পারবে, এই নিশ্চয়তা পেয়ে হাত খুলে খরচ করেছে শঙ্কর; কোন কার্পণ্য করেনি।

দ্বিগুণ মাইনেতে ঠিক করা দু'জন দিনমজুর গিয়ে বাড়িটার সবচেয়ে বড় ঘরটা যথাসম্ভব সাফসুতরো করে দিল; ওটাতেই রাত কাটাবে বিমল। একটার বদলে দুটো লণ্ঠনের ব্যবস্থা করা হলো, সারা রাত ধরে আলো দেবে ওগুলো। চারপাশে আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দেয়া হলো কার্বলিক এসিড; সাপের দল এই জিনিসটা একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

অবশেষে ভূরিভোজের পর গ্রামের মান্যগণ্য মানুষজনের সঙ্গে ভাব বিনিময় শেষে, নিজের বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়াল বিমল। দু'জন জোয়ানমর্দ লোক তাকে বাড়িটার সীমানা অবধি এগিয়ে দিয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটায় সময় রাত এগারোটা বেজে ত্রিশ মিনিট।

নিশুতি রাতে আগের চেয়েও অনেক বেশি ভুতুড়ে দেখাচ্ছে বাড়ির কাঠামোটাকে। কোণের ঝাঁকড়া নিম গাছটার ডালগুলো এমনভাবে দুলছে, যেন প্রচণ্ড আমোদে মাথা ঝাঁকাচ্ছে কোন দুষ্ট প্রেত!

আকাশে চাঁদ আছে, তবে জোছনাটা কেমন যেন ঘোলাটে। পাতলা মেঘের সার্বক্ষণিক আনাগোনা স্বচ্ছন্দে আলো বিলাতে বাধা দিচ্ছে ওটাকে।

দ্রুত কাপড়-চোপড় ছেড়ে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেল বিমল। হাত বাড়িয়ে কমিয়ে দিল লণ্ঠনগুলোর আঁচ। এখন আর কেউ আচমকা ঘরে ঢুকলে আবছা আলো-আঁধারিতে চট করে দেখতে পাবে না তাকে।

অবশ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের কেউই যে মাঝরাতে এ বাড়িমুখো হবে না, এই ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত বিমল। তবুও সতর্ক থাকা ভাল। গাঁয়ে একটা সম্মান আছে তার, অযথা সেটা খোয়ানোর ঝুঁকি নেয়ার কোন মানেই হয় না।

পুঁটলির ভিতর থেকে দুর্গন্ধময় একটা তেলের শিশি বের করল বিমল; আচ্ছামতন মেখে নিল সারা শরীরে। সিন্দুকে পাওয়া বোতাম আকৃতির পাথরগুলো বের করে বড় একটা বর্গ তৈরি করল মেঝেতে। তারপর ওর ভিতর গিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ছাতের একটা ফাটলের দিকে; মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করছে।

তারপর ধীরে-ধীরে চোখ মুদল সে; মূষিক-সাধনার মন্ত্র জপতে শুরু করল। পুরো দেহটা মূর্তির মত অনড় তার, শুধু ঠোঁটদুটো ক্রমাগত ওঠানামা করছে।

দেখতে-দেখতে পেরিয়ে গেল অনেকটা সময়, কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। শুধু ঘেমে-নেয়ে একাকার হয়ে গেল বিমলের বিবস্ত্র শরীরটা।

এক মুহূর্তের জন্যও মন্ত্র জপা থামাল না সে, ঠোঁটজোড়া নড়ে চলল অনর্গল। বাইরে ততক্ষণে একাকী চাঁদকে ঘিরে ধরেছে দস্যু মেঘেরা।

অনেক-অনেকক্ষণ পর মাটির গভীরে মৃদু একটা কম্পন অনুভব করল বিমল; সেই সঙ্গে দূরাগত মেঘের গর্জনের মতন ভোঁতা একটা আওয়াজ। যেন বহুদূর থেকে ধেয়ে আসছে বিশাল একটা অশ্বারোহীর দল!

পলকের জন্য এক চিলতে হাসি ফুটল বিমলের ঠোঁটের কোনায়, মন্ত্র জপার গতি আরও বাড়িয়ে দিল সে। অন্ধকার জগতের সমস্ত মূষিক অপশক্তিকে আহ্বান করছে সে। আগের মতই বুজে রেখেছে চোখ দুটো; খোলার সময় হয়নি এখনও।

ধীরে-ধীরে বাড়তে লাগল কম্পনটা, মেঘের গর্জনটাও যেন অনেকখানি কাছিয়ে এল। মন্ত্র জপা চালিয়ে গেল বিমল।

অবশেষে একটা বোটকা গন্ধ ভক্ করে এসে ধাক্কা দিল তার নাকে। গন্ধটা তার অতি চেনা, ইঁদুরের গন্ধ!

নিজের ওপর অসংখ্য চোখের দৃষ্টি অনুভব করল বিমল, একেকটা সুচের মতই যেন ছুটে

এসে শরীরে বিঁধছে ওগুলো!

বার কয়েক কেঁপে উঠল বিমলের নেত্র-পল্লব; ধীরে-সুস্থে চোখ মেলল সে। জানে, কী দেখতে পাবে; তবুও এপাশ-ওপাশ মাথা ঘুরাল ও।

লক্ষ-কোটি ইঁদুর সারিবদ্ধভাবে ঘিরে রেখেছে বর্গটাকে। কুঁতকুঁতে চোখে তার দিকেই অপলক তাকিয়ে আছে নরকের বাসিন্দাগুলো!

ওকে চোখ মেলতে দেখেই নড়ে উঠল ইঁদুরের দল; সার বেঁধে এগিয়ে গেল বাইরে দিকে।

দ্রুত উঠে দাঁড়াল বিমল। ইঁদুরের দলের পিছু নিয়ে সম্মোহিতের মত বেরিয়ে এল খোলা বারান্দায়।

আকাশের চাঁদ ততক্ষণে হার মেনে নিয়েছে কালো মেঘের কাছে, তবে সামনের দৃশ্যটা ঠিকই পরিষ্কার দেখতে পেল বিমল।

আগাছার দঙ্গলের মধ্যখান দিয়ে প্রশস্ত একখানা রাস্তা তৈরি হয়েছে, এই পথেই ঘর অবধি এগিয়ে এসেছে অগণিত ইঁদুর।

পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে আঙিনার একেবারে শেষ প্রান্তে, একটা কুয়োর মুখে। আজ বিকেলেও কুয়ার চাড়িটা আবর্জনা আর জংলায় ঢাকা ছিল। আগে থেকে জানা না থাকলে, কেউ ভাবতেও পারবে না, ওখানে একটা মান্ধাতা আমলের কুয়োমুখ লুকিয়ে আছে!

কিন্তু এই মুহূর্তে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওটাকে। কোন সন্দেহ নেই, ওই কুয়োর ভিতর দিয়েই পাতাল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ইঁদুরের দল; ওটাই নরকে যাওয়ার পথ!

মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গিয়ে কুয়োটার ভিতরে উঁকি দিল বিমল, তাকে সঙ্গ দিল সুশৃঙ্খল মূষিকের পাল।

কুয়োর ভিতরের দেয়ালটা আগে একেবারে মসৃণ ছিল। এখন সেখানে খানিক বাদে-বাদে খোঁড়ল তৈরি করে একটা মইমতন বানানো হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা ইঁদুরদেরই কাজ।

এক মুহূর্তের জন্যও ইতস্তত করল না বিমল, ধাপগুলো বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল। দ্রুত হাত-পা চালাচ্ছে সে; যত জলদি সম্ভব কুয়োর তলায় পৌঁছতে চায়।

ছায়ার মত তার সঙ্গে সেঁটে রইল মূষিকের পাল, জলস্রোতের মত কুয়োর দেয়াল বেয়ে নামতে শুরু করেছে ওরা।

বিমল নামছে তো নামছেই; এই অবরোহণের যেন কোন সমাপ্তি নেই! তার হাত-পায়ের পেশিগুলো প্রচণ্ড ব্যথা করছে, মস্তিষ্কের আদেশ আর শুনতে চাইছে না।

মাথার ওপরের কুয়োমুখটা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে-হতে একসময় একটা বিন্দুর আকার ধারণ করল, তবুও শেষ হলো না উলম্ব পথটা। অবশেষে যে-ই না হাল ছেড়ে দিয়ে নিচের অন্ধকারে নিজেকে সঁপে দিতে যাবে বিমল, ঠিক তখনই কুয়োর তলায় পৌঁছে গেল সে!

মেঝেতে শরীর এলিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিল বিমল। শ্বাসের তালে-তালে হাপরের মতন ওঠানামা করছে তার পাঁজরের হাড়। টনটন করছে গোটা দেহের সবক'টা মাংসপেশি।

আচমকা একটা গুঞ্জন কানে এল তার। গুঙিয়ে উঠেছে ইঁদুরের দল, যেন তাড়া দিচ্ছে তাকে!

ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল বিমল। কুয়োর বাম পাশে একটা সুরঙ্গমুখ দেখতে পেয়ে হাঁটা শুরু করল ওটা ধরে। পথটা নতুন, সদ্যই খোঁড়া হয়েছে। ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, খুব একটা প্রশস্তও নয়। খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে বিমলকে।

চোখে তেমন কিছু দেখতে না পেলেও আশপাশে ইঁদুরদের উপস্থিতি স্পষ্ট টের পাচ্ছে সে। এখনও তার চলনদারের ভূমিকা পালন করে চলেছে ওরা।

সুরঙ্গ পথে মাটির তলা দিয়ে ক্রমাগত দক্ষিণে এগিয়ে চলেছে বিমল। গাঁয়ের সবচেয়ে বড় পাহাড়টা ওদিকেই। ওখানকার মাটিতে কী যেন একটা সমস্যা আছে; কখনওই ওখানে ফসল ফলানো যায় না! এমনকী জুম চাষের চেষ্টাও বিফল হয়েছে প্রতিবার।

বিমলের মনে হচ্ছে, অনন্তকাল ধরে বুঝি পথ চলছে সে। তেপান্তরের মাঠ পেরোতেও তো এর চেয়ে কম সময় লাগার কথা!

আচমকা দৃষ্টিসীমার শেষপ্রান্তে খানিকটা আলোর আভা দেখতে পেল বিমল, সেই সঙ্গে অনুভব করল অদ্ভুত এক ধরনের খরতাপ!

যতই সে সামনে এগুতে থাকল, ততই বাড়তে লাগল ব্যাপারটার তীব্রতা।

তাহলে কি সত্যিই অবশেষে নরকের দেখা পেতে চলেছে সে? নাকি আদতে কোন সুপ্ত আগ্নেয়গিরি ওটা?

এদিকে তার মাথার ওপর আমূল বদলে গেছে প্রকৃতি! বিনা নোটিশে ভয়াবহ এক ঝড় আঘাত হেনেছে বিজয়পুর গ্রামে। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো কেউই নিজেদের জীবদ্দশায় এতখানি তীব্র ঝড় ইতিপূর্বে কখনও চাক্ষুষ করেনি।

দমকা হাওয়ার প্রথম ঝাপটাতেই বিমলের পৈতৃক বসতবাড়িটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। শতবর্ষী গাছগুলো হেলে পড়ে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল রুগ্ন দালানটাকে।

বানের জল তীব্র বেগে ছুটে গেল কুয়োটার দিকে। প্রচণ্ড আক্রোশে ভেঙে খান-খান করে ফেলল ফুট চারেক উঁচু চাড়িটা, তারপর ভয়ানক তর্জন-গর্জন করতে-করতে রওয়ানা হলো পাতাল অভিমুখে!

ধেয়ে আসা জলের গর্জনটা যতক্ষণে শুনতে পেল বিমল, কিছুই আর তখন করার নেই তার।

আচমকা সুনসান পাতালপুরীতে নিজেকে ভীষণ একা লাগল তার। মূষিকের পাল কোন্ ফাঁকে বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে, সেটা সে টেরও পায়নি। পরক্ষণে মালতির মায়াকাড়া মুখ আর অমলের নিষ্পাপ চাহনি ভেসে উঠল তার মনের পর্দায়। পাষাণ মাটির বুকে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা অশ্রুজল।

ঘোরলাগা দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ পিছনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল বিমল। মাথার ওপরের চেনা পৃথিবীটাতে আর কখনও ফেরা হবে না তার; ভাবনাটা ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে তাকে।

আচমকা প্রাণপণে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করল সে; জীবিত অবস্থায় একটিবারের জন্য হলেও নরক দেখতে চায়!

জলের স্তম্ভটা তাকে ছুঁয়ে ফেলার আগ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও হাল ছাড়েনি বিমল কর! ■

অচিরেই প্রকাশিত হচ্ছে

অনুবাদ

কুইন অভ দ্য ডন

মূল: হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

দলটা অদ্ভুত।

রানি হয়েও চাষির স্ত্রীর বেশ ধারণ-করা রিমা। চাষির মেয়ের মতো করে সাজানো রাজকুমারী নেফ্‌রা। সম্ভ্রান্ত ধাইমা থেকে আটপৌরে রমণী সাজা কেম্মাহ্। দেহরক্ষী থেকে কুলিতে পরিণত হওয়া দৈত্যাকৃতির রু। এবং ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়া রহস্যময় টাউ। পালাচ্ছেন তাঁরা। কারণ ভীষণ এক যুদ্ধে নিহত হয়েছেন ফারাও খেপের্‌রা, বিজয়ীপক্ষ হত্যা করতে চাইছে রানি ও রাজকুমারীকে। দলটা কি পারবে মেমফিসের পবিত্র ভূমিতে হাজির হতে, যেখানে থাকেন গোপন এক ভ্রাতৃসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধু রয়? তিনি কি নেফ্‌রাকে আগলে রাখতে পারবেন আসলেই? দেবী আইসিস ও হাথোরকে নিয়ে যে-স্বপ্ন দেখেছেন রিমা, তা কি সত্যি হবে শেষপর্যন্ত?...প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলনের পটভূমিতে ক্ষমতার-দ্বন্দ্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রেম এবং অবশ্যম্ভাবী নিয়তির একটি অবিস্মরণীয় উপাখ্যান।

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ট্রিসমাস নাকি টিটেনাস?

ডা. মোঃ ফারুক হোসেন
মুখ ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ

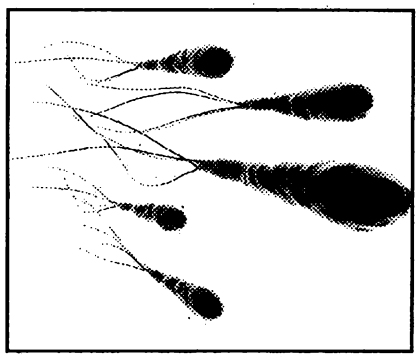

রোগী কোনও কারণে হাঁ করতে না পারলে অবশ্যই তা গুরুত্বের সঙ্গে ডাক্তারকে বিবেচনা করতে হবে।

ট্রিসমাস সাধারণত হয়ে থাকে স্থানীয় প্রদাহ, যেমন: পেরিকরোনাইটিস অথবা টেম্পোরোম্যাণ্ডিবুলার জয়েন্টের ব্যথাযুক্ত কোনও অকার্যকারিতায়। উভয় ক্ষেত্রেই রোগীর হাঁ করতে সমস্যা হয়। ফলে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। যখন ট্রিসমাসের ক্ষেত্রে স্থানীয় কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন অবশ্যই টিটেনাসের কথা বিবেচনায় আনতে হবে। ট্রিসমাসের রোগী রোগ চলাকালীন সময়ের কিছু আগে কোনও আঘাত পেয়েছে কি না তা অবশ্যই জানতে হবে। বিশেষ করে যারা বাগানের মালি বা কলকারখানায় মেশিনের কাজ করে থাকে তাদের বেলায় এ ধরনের সমস্যা হলেও হতে পারে।

অতএব, রোগী কোনও কারণে হাঁ করতে না পারলে অবশ্যই তা গুরুত্বের সঙ্গে ডাক্তারকে বিবেচনা করতে হবে। সব সময় ছকবাঁধা কারণে রোগের উৎপত্তি না হয়ে বিকল্প কোনও কারণেও হতে পারে। এ বিষয়ে রোগীদের আরও সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে শিশু জন্মের পর নির্দিষ্ট সময়ে এবং গর্ভবতী মায়েদের টিটেনাসের টিকা টিটি নেয়া একান্ত আবশ্যক। ■

মোবাইল: ০১৮১৭-৫২১৮৯৭
ই-মেইল: dr.faruqu@gmail.com

ফ্ল্যাশ ফিকশন

আদিল

সবাই বলছে ব্যাপারটা আত্মহত্যা। তবে খুনি হিসেবে আমি জানি ওটা মোটেও আত্মহত্যা নয়।

•

নারিকেল গাছটার মাথা ছুঁয়ে থাকা ছায়ামূর্তিটার দিকে চোখ পড়তেই শিউরে উঠল ফাহিম। মানুষ এত লম্বা হয়?!

•

হানাবাড়িটায় রাত কাটাবে বলে গিয়েছিল লোকটা। আর কোনও দিন ফেরেনি সে।

•

খুব মনে পড়ে তেইশ নম্বর রুমটার কথা। ওখানেই খুন হয়েছিলাম আমি। ■

প্রিয়

সূর্যদেব

নির্দিষ্ট একটা সময় স্বামী কোথায় যেত, ঠিক কী করত স্ত্রী তা বুঝতে পারত না।

চীনের এক কিশোর তার চাইতে দশ বছরের বড় এক বিধবা মহিলার প্রেমে পড়ল। তাদের ভালবাসাটা ছিল বেশ গভীর। কিন্তু তখনকার চীনে সমাজ বয়সের এই অসমতা কোনওভাবেই মেনে নিত না। তারা দু'জন দু'জনকে গভীরভাবে নিজের করে পেতে চাইল।

কোনও এক সকালে সবকিছু ছেড়ে দু'জনে পাড়ি জমাল দূরে এক পাহাড়ের চূড়ায়। চূড়াটা এতটাই উঁচু ছিল যে, মানুষজন ভয়ে সেখানে উঠত না। দু'জন প্রথম দিকে বেশ কষ্টেই দিনগুলো কাটাচ্ছিল। এমনও হয়েছিল যে, ঘাস-লতাপাতা পর্যন্ত খেতে হয়েছিল তাদের।

প্রিয় মানুষটির কষ্ট দেখে কিশোরটি প্রশ্ন করল, 'এখানে তো কিছুই নেই। না আছে আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা, না আছে খাবারের ব্যবস্থাটুকুও। এখানে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না?'

প্রকাশিত হয়েছে
ওয়েস্টার্ন
টর্নেডো টেক্স
মাসুদ আনোয়ার

বাবা-মা মারা যাওয়ার পর ঋণের দায়ে বাড়িঘর হারিয়ে বড়ভাইয়ের খোঁজে পশ্চিমে এসেছে মেলিন্দা নেলসন, সঙ্গে ছোটভাই জন আর বুড়ো গাইড চেরেকি। নেভিলে এসে জানতে পারল, বার এমএল র‍্যাঞ্চের মালিক হ্যারি নয়, কাড ব্রুস নামের একজন। ওটা আসলে আউটল দল ওয়াইল্ড ওয়ানসের আড্ডা। কিন্তু নিখোঁজ বড়ভাই ছাড়া আর কেউ নেই যে ওদের! এদিকে ইভান রাইন নামের একজন গরুব্যবসায়ী মেলিন্দাকে দূর থেকে দেখেই সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। শুরু হলো ঘটনা। একদিকে সুন্দরী অসহায় এক তরুণী, অন্যদিকে দুর্ধর্ষ ওয়াইল্ড ওয়ানস। মাঝখানে বার এমএল নামক এক রহস্যময় র‍্যাঞ্চ। জমে উঠল গল্প।

দাম ■ একশ' পনেরো টাকা

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

তার প্রিয়তমা হাসল। আর তার কাঁধে মাথা রেখে বলল, 'তুমি যতক্ষণ পাশে আছ, আমার সবকিছুই আছে।'

এভাবে তাদের সংসার চলতে লাগল। লোকালয়ে যেত স্বামীটি কাজ করে খাবারের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু এ ছাড়া নির্দিষ্ট একটা সময় স্বামী কোথায় যেত, ঠিক কী করত স্ত্রী তা বুঝতে পারত না। রাগ করবে ভেবে কোনওদিন জিজ্ঞেসও করেনি।

পঞ্চাশ বছর পর...

একদিন বৃদ্ধ স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, 'চলো, আমরা এবার এলাকায় ফিরে যাই। এখন কোনও সমস্যা হবে না।'

স্ত্রী বলল, 'কিন্তু আমি তো পঞ্চাশ বছরে কোনওদিন নিচে নামিনি! এতটাই উপরে চুড়োটা যে নিচের দিকে তাকালেই ভয় করে আমার! কী করে নামব আমি?'

বৃদ্ধ স্ত্রীর হাতটা ধরে পাহাড়ের একপাশে নিয়ে গেল। স্ত্রী দেখল, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বিশাল সিঁড়ির খাঁজ কাটা। সেখানে প্রায় ছয় হাজার সিঁড়ি হবে।

স্ত্রী বিস্ময়ে স্বামীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। স্বামী বলল, 'সারা জীবন ভালবাসা ছাড়া তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি। আমার জন্যই তো তুমি সবকিছু ছেড়ে এসেছ। তাই ভাবলাম বৃদ্ধ বয়সটাতে আমরা লোকালয়ে ফেরত যাব। সবার কাছে।

'কিন্তু তুমি তো এই পাহাড় থেকে নিচে নামতে পারবে না, তাই সিঁড়ি বেয়ে যাতে নিচে নামতে পারো, পঞ্চাশটা বছর প্রতিদিন আস্তে-আস্তে এই সিঁড়িগুলো কেটেছি।'

স্ত্রী কিছু না বলে, স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল ভালবাসার দৃষ্টিতে। ■

(চীনের প্রাচীন সত্য ঘটনা)

সঠিক চিকিৎসা না হলে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। তাই সচেতন হতে হবে।

ম্যালেরিয়ার ওষুধ

ডা. মোঃ ফজলুল কবির পাভেল

ম্যালেরিয়া অতি পরিচিত এক অসুখ। স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা এ রোগ ছড়ায়। ম্যালেরিয়ায় খুব জ্বর হয়। জ্বর কয়েক ঘণ্টা থাকে, তারপর ভাল হয়ে যায়। আগে ম্যালেরিয়ায় প্রচুর রোগী মারা যেত। বর্তমানে উন্নতমানের ওষুধ আবিষ্কারের ফলে মৃত্যুহার অনেক কমে এসেছে। তবে ম্যালেরিয়ার ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক। তাই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শমত ওষুধ খাওয়া উচিত।

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে আছে:

১। ক্লোরোকুইন
২। কুইনাইন
৩। অ্যামোডিয়াকুইন
৪। আর্টেমিথার
৫। আর্টেসুনেট
৬। হ্যালোফেনট্রিন
৭। মেফলোকুইন
৮। প্রগুয়ানিল
৯। পাইরিমিথামিন-সালফাডক্সিন
১০। কুইনিডিন
১১। প্রিমাকুইন

এ ছাড়া আরও কিছু ওষুধ আছে যেগুলো ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় যেসব ওষুধ ব্যবহৃত হয় তার বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। যেমন: ম্যালেরিয়ার বহুল ব্যবহৃত ওষুধ ক্লোরোকুইন খেলে পেটব্যথা, মাথাব্যথা, রক্তচাপ কমে যাওয়া, চোখে কম দেখা, চুলকানি, বমি, মাথাঘোরা, ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। কুইনাইন এক অব্যর্থ ওষুধ ম্যালেরিয়া অসুখে। কিন্তু এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও অনেক। কুইনাইন খেলে বমি, বমিভাব, অস্থিরতা, কান ভোঁ-ভোঁ করা, চুলকানি, আমবাত, জ্বর, পেটব্যথা, ডায়রিয়া, চোখে ঝাপসা দেখা, বুকে ব্যথা, ঘাম, মাথাঘোরা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন, ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে। পাইরিমিথামিন ও সালফাডক্সিনের কম্বিনেশন ম্যালাসাইড নামে পাওয়া যায়। এই ওষুধ বেশ সহনীয়। বাচ্চাদেরও দেয়া যায়। তবে কিছু সমস্যা এ ওষুধেও হতে পারে। এর মধ্যে আছে ফুস্কুড়ি, বমি, রক্তকণিকা কমে যাওয়া, দুর্বলতা, জ্বর, মাথাব্যথা, মানসিক অস্থিরতা, ইত্যাদি। ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় প্রিমাকুইন একটি পরিচিত নাম। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পূর্বোক্ত ওষুধের মতই। তবে প্রিমাকুইনের সবচেয়ে বড় জটিলতা হচ্ছে অনেক সময় লোহিত রক্তকণিকাকে ভেঙে ফেলে। সাধারণত যাদের G6PD এনজাইমের অভাব থাকে তাদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা বেশি হয়। ম্যালেরিয়ায় যেসব ওষুধ ব্যবহৃত হয় তাদের প্রত্যেকটিরই এমন কমবেশি জটিলতা আছে।

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় যেমন জটিলতা আছে, চিকিৎসা না করলে জটিলতা আরও বেশি হয়। সঠিক চিকিৎসা না হলে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। তাই সচেতন হতে হবে। ম্যালেরিয়ার ওষুধ খেয়ে কোনও সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ■

প্রতিশোধ

মূল ■ এলসি এলিস

রূপান্তর ■ সৈয়দা আফসানা মান্নান

'চিঠিতে কী লিখেছে... তোমাকে খুন করবে!'

ম্যাকগিল ওয়ার্ডেনের অফিসে ঢুকে তাঁকে স্যালুট জানাল।

'ম্যাকগিল, পুরো সপ্তাহ জুড়ে তোমাকে খুব উদ্বিগ্ন লাগছে। প্যারোলে মুক্তি পাওয়াটা কি তোমার জন্য এতই জরুরি?' ওয়ার্ডেন ফাউলস জানতে চাইলেন।

'জি, স্যর।'

'তুমি বলেছিলে বাইরে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, যেখানে তোমাকে যেতেই হবে?' ওয়ার্ডেন আবার প্রশ্ন করলেন।

'জি, স্যর।'

'আমি জানতে চাই, এটা এতটা জরুরি কেন? তুমি কি আমাকে বলবে?'

'স্যর, বিষয়টা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।'

'হুমম...তুমি মুক্তি চাও যাতে আজ রাতে শহরে যেতে পার, তাই না?'

'জি, স্যর।'

'দেখো, ম্যাকগিল, তোমার কোনও কিছুই আমার অজানা নয়। বাইরে বের হওয়ার জন্য কেন এমন মরিয়া হয়ে উঠেছ সেটা আমি জানি।'

ওয়ার্ডেন ফাউলস দারুণ বিদ্বেষ নিয়ে কঠিন কণ্ঠে কথাগুলো বলে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। 'শুনে রাখো, আজ কেন, আগামী বিশ বছরেও তুমি মুক্তি পাবে না। এই সত্যিটা তোমার মাথায় ভাল করে গেঁথে নাও। ম্যাকগিল, তুমি কি বুঝতে পেরেছ আমার কথা?'

'জি, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু দেখুন, স্যর, বাইরে কী ঘটে তার কত কিছুই তো আমরা জানি না।'

'তোমার কিছু জানার দরকার নেই,' ওই চেয়ারটায় বসো,' ওয়ার্ডেন রুক্ষভাবে তাকে আদেশ করলেন।

ঘড়িতে নটা বাজে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, জানালার ফাঁক গলে জ্যোৎস্না এসে ঘরের মেঝেতে থই-থই করছে। ম্যাকগিল সেদিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটু হাসল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তার মুখের পেশীতে খিঁচুনী উঠল; ঠিক নটায় তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। ম্যাকগিল তার চেয়ারের হাতল শক্ত করে চেপে ধরল, মনে হচ্ছে চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে।

একটু পর ওয়ার্ডেন তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে দু'হাতে কপাল ঠেকিয়ে বসে আছে।

ইতোমধ্যে ফোনের সংযোগ পাওয়া গেছে।

'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ডাউনি লাইনে আছেন,' অপারেটর বলল।

ওয়ার্ডেন এক হাজার মাইল দূর থেকে, টেলিফোনের অন্য প্রান্তে তাঁর বন্ধুর কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছেন।

'হ্যালো, জিম,' ওয়ার্ডেন বললেন, 'আমি জর্জ বলছি।'

'হ্যালো!' তাঁর কণ্ঠ শুনে বোঝা যাচ্ছে তিনি নার্ভাস। 'কী মনে করে?'

'তোমার বিবাহবার্ষিকীর দাওয়াত দিলে না তো, জিম?'

'হ্যাঁ, সে-সে কি প্যারোল পেয়েছে?'

'আসলে বোর্ডের সিদ্ধান্ত তো বোঝোই; ম্যাকগিলের রিপোর্টে কোনও গণ্ডগোল ছিল না। কিন্তু তুমি চিন্তা কোরো না; আমার উপর ভরসা রাখো, আমি সব সামলে নিয়েছি।'

'জর্জ, তুমি আসলে ওকে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছ না। আমার তো মনে হয় সে এতক্ষণে এখানে আসার জন্য রওনা দিয়েছে। কারণ সে এক কথার মানুষ। আমাকে যে চিঠিটা পাঠিয়েছে সেটাতে স্পষ্ট হুমকি দিয়েছে, তুমি জানো না?'

'কী! ম্যাকগিলের চিঠি?'

'হ্যাঁ, তাতে পরিষ্কার করে জানিয়েছে সে তার কথা রাখবে, কিন্তু জুডিথের সঙ্গে দেখা করবে না। আমি আজও বুঝতে পারলাম না জুডিথ এই ম্যাকগিলের মাঝে কী পেয়েছিল। জর্জ, সেদিন যদি আমরা চালাকিটা না করতাম তবে সে তাকেই বিয়ে করত, আমাকে নয়। আমার খুব ভয় লাগছে। ম্যাকগিল বলেছে জেল হোক বা জাহান্নাম-কোনও কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারবে না। আজ রাত নটায় তার ওয়াদার পাঁচ বছর পূর্ণ হবে, আর এখন ঠিক নটা বাজে। আমার মনে হচ্ছে সে আসছে...ফিরে আসছে।'

'জিম, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? জানি না শয়তানটা কীভাবে তোমাকে চিঠিটা পাঠিয়েছে...কিন্তু সে কোনওদিনই তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না-চিঠিতে কী লিখেছে...তোমাকে খুন করবে! সে আমার সামনে বসে আছে, মাত্র দশ ফিট দূরে-'

'জর্জ!' ঠিক কান্না নয়, ভীষণ ভয়ে, আতঙ্কে আর্তচিৎকার শোনা গেল। 'জর্জ! তুমি কী বললে? কে তোমার সামনে বসে আছে-দশ ফিট দূরে-'

'কেন, ম্যাকগিল-'

'জর্জ! ম্যাকগিল আমার এখানে...'

ওপাশে মনে হচ্ছে কেউ হাঁপাচ্ছে, খাবি খাওয়ার মত শব্দ শোনা গেল।

'কী বলছ? ম্যাকগিল তো আমার সামনে শান্ত হয়ে বসে আছে। জিম, তুমি অযথা চিন্তা করছ। দেখে তো মনে হচ্ছে ও ঘুমিয়ে পড়েছে...হ্যালো!! হ্যালো! হ্যালো, জিম! শুনতে পাচ্ছ, হ্যালো, জিম! অপারেটর! হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!'

ওপাশ থেকে কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না, অদ্ভুত নিস্তব্ধতা গ্রাস করে রেখেছে...

হঠাৎ মনে হলো কেউ গভীরভাবে শ্বাস নিতে চেষ্টা করছে। কিছু একটা যেন টেলিফোনের গায়ে আঘাত করেছে...

একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার, তারপর আবারও নিশ্চুপ।

ওয়ার্ডেন রিসিভারের হুকটা খটখট করতে লাগলেন। কার যেন কণ্ঠস্বর শোনা গেল...

একটা ফিসফিসানি শব্দ, কেউ কথা বলছে টেলিফোনে!

'হ্যালো!' ওয়ার্ডেন কেঁদে ফেললেন। 'আমি ওয়ার্ডেন ফাউলস বলছি, কী হয়েছে জিমের-মিস্টার ডাউনির?'

'স্যর, আমি সঠিক বলতে পারছি না। আমরা তাঁর দেহ মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় পেয়েছি। মনে হচ্ছে কেউ তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে, এখানে কাউকে খুঁজে পাইনি-'

ফাউলস পিছন ফিরে দেখলেন ম্যাকগিল আগের মতই স্থির হয়ে বসে আছে।

তার কাছে গিয়ে হাত ধরতেই সেখান থেকে খসে পড়ল প্রিজন হাসপাতালের লেবেল লাগানো একটা খালি শিশি; তাতে লেখা-'বিষ'।

হাতটা মৃত!

ম্যাকগিলের আত্মা শেষপর্যন্ত ঠিকই প্রতিশোধ নিল। ■

ঘর-সংসার

শামীমা আক্তার

যে রান্নায় আপনি অভ্যস্ত নন সেটি অতিথির উপর এক্সপেরিমেন্ট করা বোকামির কাজ হবে।

অতিথি আপ্যায়নে প্রস্তুতি নিন

প্রিয় বোনেরা,

সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এবারের আলোচনা। বর্তমান কর্মব্যস্ত নাগরিক জীবনে বাড়িতে অতিথির আগমন তেমন একটা হয় না, যেমনটি হত ৩০-৪০ বছর আগে। গ্রামের নিকট আত্মীয়ের ছেলে চাকরির খোঁজে শহরে এসেছে, সে হয়তো আপনারই বাড়িতে এসে হাজির হলো। কাজ শেষ করে আবার ফিরে গেল গ্রামে। চিকিৎসা কিংবা পরীক্ষা দেয়ার জন্যও বাড়িতে মেহমানের আগমন ঘটত। এখন সময় পাল্টেছে। ওই সব কাজে যাঁরা শহরে আসেন, তাঁদের বেশিরভাগই হোটেলে অবস্থান করে নিজ-নিজ কাজ সারেন, কিন্তু এমন কিছু বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় আছেন, যাঁদেরকে আমরা সাদরে বরণ করে নিই; এবং তাঁরা আমাদের বাড়িতে এসে বেড়িয়ে গেলে আমরা যার পর নাই খুশি হই। এরকম নিকট আত্মীয় হোক কিংবা বন্ধু, ক'দিনের জন্য আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসবে ভাবলেই বাড়ি জুড়ে একটা খুশির আবহ সৃষ্টি হয়। হইচই, আড্ডা, গতানুগতিক দিন যাপনের বাইরে অন্যরকম কয়েকটা দিন কাটানোর জন্য মানসিকভাবেও প্রস্তুত হই আমরা। অতিথির যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সেজন্য বাড়ি-ঘর একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে সচেষ্ট হই। অতিথি-অভ্যাগতদের স্বাগত জানানোর জন্য আপনার একটু যত্ন আর আন্তরিকতাই যথেষ্ট। আদর-যত্নের সঙ্গে অতিথিদের প্রয়োজন ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রাখলে দেখবেন বাড়ি সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে অতিরিক্ত তেমন কিছু লাগছে না। আপনার সামর্থ্য ও উপযোগিতা অনুযায়ী একটু ভেবে নিন, তা হলেই হবে। প্রথমেই আসা যাক বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথায়। ঘর সুন্দর ও ঝকঝকে থাকলে মন এমনিতেই ভাল থাকে। একদম নিখুঁত, পরিপাটি না হলেও ঘর যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। অপরিচ্ছন্ন ঘরে কিন্তু খুশি মনে থাকা যায় না। তাই ঘর পরিষ্কার রাখার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতেই হবে। একা পুরো বাড়ি-ঘর গুছাতে গেলে সময় যেমন বেশি লাগবে, তেমনি তাড়াহুড়োয় সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করাও মুশকিল হবে। বাড়ির সবদিকেই যেন কম-বেশি পরিচ্ছন্নতার ছোঁয়া লাগে, সেদিকে নজর রাখুন। প্রথমেই আসি গেস্টরুমের কথায়। গেস্টরুমের ওয়ার্ডরোবে অতিথির পছন্দসই তোয়ালে, বডি সোপ, শ্যাম্পু ইত্যাদি গুছিয়ে রাখুন। ঘরে পরার স্যাণ্ডেল রাখুন একটি নির্দিষ্ট জায়গায়। বেড সাইড টেবিলে অ্যালার্ম ক্লক, পানির গ্লাস ও রিডিংল্যাম্পের মত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো রাখতে কিন্তু ভুলবেন না। ক্যামেরার ব্যাটারি বা মোবাইল ফোন চার্জ দেয়ার জন্য মাল্টি প্লাগের ব্যবস্থা রাখাটা জরুরি। মশারি ও মশা তাড়ানোর স্প্রে অবশ্যই রাখবেন। এ ছাড়া কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধ, অ্যান্টি-সেপটিক লোশন ও ব্যাণ্ডেজ মেডিসিন বক্সে গুছিয়ে রাখুন। অন্যান্য বেডরুম ও ড্রইংরুমের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখুন। বেডরুমে পরিষ্কার বেডকভার বিছিয়ে দিন। সঙ্গে ম্যাচিং বালিশ রাখুন। ঘরের কোণে জমে থাকা ঝুল, মাকড়সার জাল ইত্যাদি পরিষ্কার করে ফেলুন। পুরানো পরদার বদলে নতুন পরদা লাগাতে পারেন, নইলে পুরানো পরদা ভাল করে ধুয়ে ইস্তিরি

করে লাগাতে পারেন। লক্ষ রাখুন ফার্নিচারের গায়ে যেন ধুলো-ময়লা জমে না থাকে। কুশন কভার বদলে ফেলুন। বেডরুমের সুন্দর গন্ধের জন্য এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার করতে পারেন। কিচেন ও ডাইনিং রুম–কিচেন, ডাইনিং রুম ইত্যাদি পরিষ্কার রাখার জন্য বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য নিন। তা হলে নিজের উপর খুব বেশি চাপ পড়বে না। ড্রইংরুমের সেন্টার টেবিলে ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রাখুন। কিচেনের সিঙ্ক ঝকঝকে রাখার চেষ্টা করুন। ডাইনিং টেবিলের ম্যাটগুলোতে যাতে খাবার পড়ে না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখুন। বাথরুম–বাথরুমে পরিষ্কার বাথ টাওয়েল, হ্যাণ্ড টাওয়েল তো রাখতেই হবে, এ ছাড়া গেস্ট আসার আগেই পরিষ্কার বালতি, মগ, সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি বাথরুমে গুছিয়ে রাখুন। বাথরুমের সামনে ডোরম্যাট রাখুন। বাথরুমের অন্যান্য জিনিস, যেমন: কল, কমোড ইত্যাদি ঠিক আছে কি না যাচাই করে নিন। বাথরুমের বেসিন পরিষ্কার রাখুন। বাচ্চাদের রুম–বাচ্চারা নিজেদের ঘর নিজেরা গুছাতেই বেশি উৎসাহী হয়। তবে সেক্ষেত্রে আপনার নজরদারি বিশেষ জরুরি। এমন যেন না হয়, অতিথি তার বাচ্চাকে সঙ্গে এনে অগোছালো ঘরের কারণে অস্বস্তিতে পড়ল! প্রত্যেকটা ঘর নিখুঁত করে গুছানোর সময় যেহেতু হাতে নেই, তাই ঘরে ঢুকে প্রথমেই যে জিনিসটা চোখে পড়বে সেটা ঠিক করার চেষ্টা করুন। ধরুন, বাচ্চাদের রুমে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়তে পারে খেলনার শো-কেস। উচিত হবে, ওই খেলনার শো-কেস এবং খেলনাগুলোকে একটু বেশি যত্ন নিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। এবার বাড়ির যেখানে পুরানো খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, বাতিল জিনিসপত্র স্তূপ করে রাখেন, সেই স্টোর রুম পরিষ্কার করার সময় হয়েছে। এখানে যা কিছু আছে তা সুন্দর করে গুছিয়ে রাখুন। দেখবেন বেশ অনেকটা খালি জায়গা বেরিয়ে আসছে, যেখানে ঘরের অন্য কোনও জিনিস, যা বর্তমানে কাজে লাগছে না, তা সহজেই স্থানান্তর করে রুমের স্পেস বাড়িয়ে তুলতে পারেন। অতিথির স্বাচ্ছন্দ্য–অতিথির জন্য ঘর সাজানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যেমন জরুরি, তেমনি তাঁরা যাতে স্বচ্ছন্দে ক'টা দিন আপনার বাড়িতে কাটিয়ে যেতে পারেন, তারও বন্দোবস্ত করা দরকার। ওয়ার্ডরোব অ্যারেঞ্জমেন্ট–গেস্টরুমে আলাদা ওয়ার্ডরোব থাকলে শুধু পরিষ্কার করলেই সমস্যা মিটে যাবে। নিজের ওয়ার্ডরোবের এক অংশেও অতিথির জন্য কিছু জায়গা করে দিতে পারেন। ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুমকে আরও একটু প্রশস্ত করা যেতে পারে। সোফা সরিয়ে জায়গা করে নিতে পারেন। রেডিমেড ম্যাট্রেস পেতে দিন। আর একটু খরচ করতে অসুবিধা না থাকলে সোফা-কাম-বেড বা বক্স বেড কিনতে পারেন। সোফা-কাম-বেডরুমের জায়গা বাঁচানোর জন্য দারুণ! আর বক্স বেডও বেশ ভাল। অতিথিদের জিনিসপত্র–বিশেষ করে, সুটকেস, ট্রলি ব্যাগ ইত্যাদি রাখার জন্য ক্যাবিনেটে আলাদা জায়গা করে দিতে পারলে ভাল হয়। অতিথির জন্য খাবার-দাবার–বাড়িতে অতিথি আসছে শুনলে প্রথমেই মনে হয় খাওয়া-দাওয়ার জোগাড়যন্ত্র কী হবে! অনেকে বাইরের খাবার খাইয়ে অতিথিকে তুষ্ট করতে চান। কিন্তু অনেকে বাইরের খাবার পছন্দ করেন না। সেক্ষেত্রে রান্না-বান্নার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিংবা তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা কী খেতে পছন্দ করে তা আপনার জানা থাকার কথা। সে অনুযায়ী খাবারের আয়োজন করতে পারেন। সকালে পরোটা-মাংস, সাথে ডিম ও সবশেষে মিষ্টি রাখতে পারেন। কেউ পরোটা পছন্দ না করলে তাঁর জন্য পাঁউরুটি-জেলির ব্যবস্থা রাখতে পারেন। বাচ্চারা কর্নফ্লেকস-দুধ এসব দিয়েও নাস্তা করতে পছন্দ করে। নাস্তার টেবিলে মৌসুমী ফল সাজিয়ে দিতে ভুলবেন না। দুপুরে মোগলাই খানার আয়োজন করতেই হবে, এমন নয়। বরং মেহমানের রুচি অনুযায়ী ছোট মাছের ঝোল, বিভিন্ন রকমের ভর্তা ইত্যাদিও পরিবেশন করতে পারেন। একটা জরুরি কথা বলে রাখা দরকার। বাড়িতে অতিথি এলে নতুন কিছু রান্না করে তাঁর মন জয় করার দিকে অনেকের নজর থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে রান্নায় আপনি অভ্যস্ত নন সেটি অতিথির উপর এক্সপেরিমেন্ট করা বোকামির কাজ হবে। বরং যে পদগুলো আপনি ভাল রাঁধতে পারেন সেগুলোই রেঁধে অতিথিকে পরিবেশন করুন। রাতের বেলায় অপেক্ষাকৃত হালকা খাবারের আয়োজন করতে পারেন। খুব বেশি গুরুপাক রান্না পরিবেশন না করাই ভাল; এ ধরনের খাবার খেয়ে অতিথি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। অতিথিকে হাসিখুশি রাখাটাই সবচেয়ে বড় বিষয়। আপনার আচরণে অতিথি যাতে সামান্যতম বিব্রত বোধ না করেন সেদিকে নজর রাখুন। আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। সবাইকে আবারও অনেক শুভেচ্ছা।

রান্নাঘর

মালপোয়া

উপকরণ: ঘন দুধ–২ কাপ; মৌরি–আধ চা-চামচ; গোলমরিচ–৮-১০টা (থেঁতো করা); ময়দা–২

টেবিল চামচ; রসের জন্য চিনি–২ কাপ; এ ছাড়া ঘি ও তেল–ভাজার জন্য।

প্রণালী: প্রথমে একটা পাত্রে চিনি ও পানি দিয়ে ঘন সিরা তৈরি করে নিন। এবার ঘন করে রাখা দুধের সঙ্গে মৌরি, গোলমরিচ ও ময়দা মিশিয়ে নিন। এমনভাবে মেশান যাতে ময়দায় ডেলা না থাকে। এবার কড়াইতে ঘি ও তেল একসঙ্গে গরম করুন। দুধের হাতায় একহাতা করে গোলা নিয়ে তেলে ছাড়ুন। দু'পিঠ লাল করে ভাজা হলে তুলে গরম রসে দিন। রস বেশ ভালভাবে ঢোকার জন্য বেশ কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে পরিবেশ করুন।

রসবড়া

উপকরণ: কলাইয়ের ডাল–১ কাপ; বেকিং পাউডার–আধ চা-চামচ; সিরার জন্য চিনি–আধ কাপ; তেল–আন্দাজমত।

প্রণালী: কলাইয়ের ডাল গরম পানিতে ঘণ্টাদুয়েক ভিজিয়ে নিন এবং তারপর ভাল করে বাটুন। পানিতে চিনি মিশিয়ে সিরা তৈরি করে রাখুন। এবার বাটা ডালে বেকিং পাউডার দিয়ে খুব ভাল করে ফেটিয়ে গরম তেলে ছোট-ছোট করে ভাজতে থাকুন। লাল করে ভাজা হলে রসে ছেড়ে দিন। সব ভাজা হলে বড়া সমেত রস একবার ফুটিয়ে নিন। এই রসবড়া ঠাণ্ডা কিংবা গরম যেভাবে খুশি পরিবেশন করতে পারেন।

ফুলকপির পাতুরি

উপকরণ: ফুলকপি–১টা (খুব ছোট টুকরো করা); সরষে বাটা–৪ টেবিল চামচ; লবণ ও চিনি–স্বাদমত; হলুদ–আধ চা-চামচ; শুকনো মরিচ গুঁড়ো–আধ চা-চামচ; কাঁচা মরিচ–স্বাদ অনুযায়ী; সরষের তেল–১০০ গ্রাম।

প্রণালী: গরম পানিতে ফুলকপির টুকরোগুলো সামান্য ভাপিয়ে নিন। সরষের সঙ্গে কাঁচা মরিচ বেটে নিন। তাতে সামান্য লবণ দিন। এবার অন্য একটি পাত্রে সরষে বাটা, নারকেল বাটা, লবণ ও চিনি খুব ভাল করে মেশান। কড়াই আঁচে বসিয়ে তাতে ফুলকপি সমেত পুরো মিশ্রণটি ঢেলে দিন। ঢিমে আঁচে রাখুন, যতক্ষণ না তেল বের হয়। সুসিদ্ধ হয়ে গেলে গরম-গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ফ্রায়েড মাটন বল

উপকরণ: খাসির মাংসের কিমা–২৫০ গ্রাম; আলু–৩টা; পেয়াজ–২টা (কুচানো); আদা বাটা–১ চা-চামচ; শুকনো মরিচ গুঁড়ো–সামান্য; ডিম–২টা; তেল–৬-৭ টেবিল চামচ; লবণ ও চিনি–স্বাদমত।

প্রণালী: কিমা ভাল করে সিদ্ধ করে রাখুন। আলু সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে রাখুন। আলু, আদা বাটা, লবণ, পেঁয়াজ কুচি, মরিচ গুঁড়ো ও সামান্য চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে মাংসের কিমার সঙ্গে মেখে নিন। একটি আলাদা পাত্রে ডিম ফেটিয়ে রাখুন। কিমার মিশ্রণটিকে বলের আকারে গড়ে ডিমের গোলায় ডুবিয়ে নিন। প্যানে তেল গরম করে রাখুন। ডুবো তেলে বলগুলোকে ভেজে তুলে নিন। যে কোনও স্যালাডের সঙ্গে এটি পরিবেশন করতে পারেন।

ছানার চপ

উপকরণ: ছানা–২০০গ্রাম; কিশমিশ–অল্প কয়েকটা; নারকেল কুচি–পরিমাণ মত; আদা বাটা–১ চা-চামচ; জিরে গুঁড়ো–১ চা-চামচ; ময়দা–৩ টেবিল চামচ; বিস্কুটের গুঁড়ো–১০০ গ্রাম; তেল, লবণ, চিনি ও বেকিং পাউডার– আন্দাজমত।

প্রণালী: প্যানে ছানা, নারকেল কুচি, কিশমিশ, আদা বাটা, লবণ ও চিনি দিয়ে একসঙ্গে শুকনো খোলায় নাড়াচাড়া করে নামিয়ে রাখুন। ঠাণ্ডা হলে একসঙ্গে মেখে নিন। মাখার সময় মিশ্রণটিতে অল্প জিরে গুঁড়ো দিন। এবার মিশ্রণটিকে চপের আকারে গড়ে ময়দার গোলাতে ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে নিন। আগে থেকে প্যানে তেল গরম করে রাখুন। চপগুলোকে তেলে ভাল করে ভেজে তুলে রাখুন। যে কোনও স্যালাডের সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন।

আপনাদের চিঠির জবাব

• আমার বিয়েটা হয়েছিল প্রেম করে। বাবা-মা'র একমাত্র মেয়ে হিসেবে সবসময়েই খুব আদরের ছিলাম। আমার মুখের দিকে চেয়ে বাবা-মা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিল। মা শুধু একটা কথা বলেছিল, ছেলেদের জয়েন্ট ফ্যামিলি, তুই পুরো পরিবারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবি তো? আমি তখন ঝোঁকের মাথায় বলেছিলাম, আমি কি অন্যদের চেয়ে আলাদা নাকি? অন্যরা পারলে আমিও পারব। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে দেখি, যে যেভাবে পারছে সংসারের কাজকর্ম আমার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। শাশুড়ি তো বটেই, দেবর-ননদ ও ভাসুর-ভাবীরাও সুযোগ বুঝে সংসারের বিভিন্ন কাজ আমার উপর চাপিয়ে দিতে শুরু করেছে। আমার স্বামী এসব দেখেও না দেখার ভান করে আর বলে, মাত্র তো বছরখানেক হলো আমাদের বিয়ে হয়েছে, দেখো আস্তে-আস্তে সবকিছুই ঠিকঠাক হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতি দিনকে দিন আরও খারাপের দিকেই যাচ্ছে। আপা, এ অবস্থায় আমার কী করা উচিত?

নন্দিতা ইয়াসমিন
মহাখালী, ঢাকা।

•• বোন নন্দিতা, তুমি যে যৌথ পরিবারের সদস্য হয়েছ তা এককথায় তোমার স্বাভাবিক জীবনটাকে অতি অল্পদিনেই দুর্বিষহ করে তুলেছে। তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে এতদিনে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া করে ফেলত। কিন্তু তুমি ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছ–যা অন্যের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। বোন, আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যৌথ পরিবার দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। নানারকম বাস্তব কারণেই তা একসময় ভেঙে যায়। আমি বলছি না, তুমি যৌথ পরিবার ভেঙে বেরিয়ে আসো। কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরেই একসময় তোমার একান্ত নিজের সংসারটাকে নিয়ে আলাদাভাবে ভাবতে হবে। তবে যতদিন তুমি সবাইকে নিয়ে আছ, ততদিন ধৈর্য ধরে অন্যের নানারকম আবদার বা অনুরোধ (এর মধ্যে অন্যায় আবদারও থাকতে পারে) হাসিমুখে মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তোমার ভবিষ্যৎ জীবন যাতে সুন্দর ও মঙ্গলময় হয়, সে কামনাই করছি।

• আমার যখন বিয়ে হয় সে সময় বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। স্বামী ব্যবসায়ী। বয়সও একটু বেশি। সে সময় তার বয়স ছিল ৩১ বছর। বিয়ের প্রথম ৩-৪ বছর বেশ সুখেই ছিলাম। কিন্তু এরপর সম্পর্কটা কেমন যেন বেসুরো হয়ে উঠতে লাগল। আমার স্বামী ব্যবসায়িক কাজে সারাদিনই ব্যস্ত থাকে। আমি বাসায় একা-একা টিভি, ইন্টারনেট–এসব নিয়ে সময় কাটাই। হঠাৎ করেই আমার একজন ফেসবুক ফ্রেণ্ড জুটে গেল। পেশায় সে একজন মিডিয়া কর্মী। আমরা প্রাথমিক যোগাযোগের পর একাধিকবার সাক্ষাৎও করেছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তার প্রতি আমার মনে এক ধরনের দুর্বলতা জন্মেছে। ওদিকে আমার স্বামী তার কাজ নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত থাকছে। মাঝে মধ্যে সে অবশ্য বলে, আসলে ব্যবসায় কাজের চাপ এত বেশি যে, তোমাকে ঠিকমত সময়ই দিতে পারি না। স্বামী কাজপাগল মানুষ, তার কোনও বাজে অভ্যাস নেই। আপা, আমি বুঝি, আমার স্বামী একজন ভাল মানুষ। কিন্তু সে যদি সব সময়েই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে তা হলে দাম্পত্য সম্পর্ক বলে তো কিছু থাকে না। আর আমি যার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছি সে অত্যন্ত আমুদে ও মিশুক প্রকৃতির। আমি বেশ বুঝতে পারছি, ধীরে-ধীরে আমাদের সম্পর্কটা অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে। এ অবস্থায় আমার কী করা উচিত? আপা, সুপরামর্শ দিয়ে বাধিত করবেন।

শিলা মোমতাজ
মালিবাগ, ঢাকা।

•• শিলা, তুমি আগুন নিয়ে খেলছ যা নৈতিকতার বিচারে অন্যায় তো বটেই, এ ছাড়া সামাজিক প্রেক্ষাপটেও বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। তোমার নিজের ভালর জন্যই বলছি, এই বিপজ্জনক খেলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নাও। তুমি নিজেই উল্লেখ করেছ, বন্ধুত্বের সম্পর্কটা ধীরে-ধীরে অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে। কাজেই যত দ্রুত সম্ভব সম্পর্কের ইতি টেনে দাও। আরেকটা কথা, যে স্বামী দিনরাত পরিশ্রম করছে সংসারের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য, সে সময় না দেয়ার অজুহাতে তুমি অন্য কারও সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলবে, এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। তাই খুব তাড়াতাড়ি এই সম্পর্কের ইতি টানো। এতেই সবার জন্য মঙ্গল হবে। আশা করি বাস্তবতার আলোকে তুমি সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে।

• মাত্র তিন বছর দাম্পত্য সম্পর্কের পর গত বছর জানুয়ারি মাসে আমার ডিভোর্স হয়ে যায়। এরপর কিছুদিন একা-একাই কেটে গেল। এ বছরের শুরুর দিকে আমার একজনের সঙ্গে এক বান্ধবীর মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছে। সে দেখতে সুপুরুষ; ভাল

আপনি কি হতাশ?

আর হতাশা নয়। নির্ভুল ভাগ্য গণনার মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হলে স্বনামখ্যাত জ্যোতিষী **কাজী সারওয়ার হোসেন** পরিচালিত **'ভাগ্যচক্র'**তে আসুন।

৩৪৫ সেগুনবাগিচা (চতুর্থ তলা)
(ভিশন অ্যাডভারটাইজিং সংলগ্ন)
শনি থেকে বৃহস্পতিবার: বিকেল ৫.৩০–৭.৩০
ফোন: ৮৩২২৭০৬, ৮৩৫২১৬৭ (অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য)

ব্যবসা করে। কিন্তু এর আগে সে একবার বিয়ে করেছিল। অল্পদিনেই তার বিয়েটা ভেঙে যায়। যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল সে অন্য একজনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে, পরে এই লোককে ডিভোর্স করে তাকে বিয়ে করে বিদেশ চলে যায়। সে বর্তমানে আমার প্রতি খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছে। আমিও ভাবছি, বিয়ে যদি করতেই হয় তা হলে তাড়াতাড়ি করে ফেলাই ভাল। যার আগে বিয়ে হয়নি এমন কাউকে আমার জন্য পাওয়া কঠিন হতে পারে। তাই ভাবছি, এ প্রস্তাবেই রাজি হয়ে যাই। সে দেখতে যেমন সুপুরুষ, চারিত্রিক দিক দিয়েও তাকে সজ্জন বলেই মনে হয়েছে। এ ছাড়া তার আগের বিয়েটা ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টতই তার স্ত্রীর হাত ছিল। আপা, যদি আমি তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখি, তা হলে কি ভুল করব?

ইরিনা হক

বাসাবো, ঢাকা।

●● ইরিনা, তোমার সিদ্ধান্তটা যে বাস্তবসম্মত, এ কথা বলতেই হচ্ছে। কারণ জীবন তো আর থেমে থাকে না; কাজেই জীবনের চলার পথে কাউকে না কাউকে অবলম্বন হিসেবে দরকার। তুমি তার আগের বিয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছ। এ ব্যাপারে একটা পরামর্শ দিই। আসলে কী কারণে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়েছে তা অন্য কারও মাধ্যমে যাচাই করা প্রয়োজন বলে মনে করি। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। যদি দেখা যায়, সে তোমাকে যা বলেছে সেটাই সত্য তা হলে নির্দ্বিধায় তার ব্যাপারে রাজি হয়ে যেতে পার। তবে পুরো বিষয়টি নিয়ে খুব একটা তাড়াহুড়ো করতে যেয়ো না। আশা করি তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হবে।

● আমার বয়স এখন প্রায় ৩৭ বছর। বিয়ে হয়েছিল ২৫ বছর বয়সে। বাবা-মা'র পছন্দের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমার। প্রায় বারো বছরের দাম্পত্য জীবনে বেশ সুখেই ছিলাম আমরা। কিন্তু গত বছর হঠাৎ করেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে সবাইকে ছেড়ে চলে যায় সে না ফেরার দেশে। আমাদের দু'সন্তান। বড়টি মেয়ে, বয়স ১০, আর ছেলের বয়স ৮ বছর। স্বামীর মৃত্যুর এক বছর পেরিয়েছে এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে। এর কিছুদিন পর থেকেই বাবা-মা ও ঘনিষ্ঠজনেরা আমাকে দ্বিতীয়বার বিয়ের জন্য চাপ দেয়া শুরু করে। প্রথম-প্রথম এসব কথায় ভীষণ রাগ হত। একদিন মা আমাকে খুব করে বোঝাল। জীবনের তো অনেকটাই বাকি এখনও, ছোট-ছোট দুই সন্তান। টাকা-পয়সার প্রয়োজন না থাকুক, মাথার উপর একজনের ছায়া থাকাটা খুবই জরুরি। মা'র কথায় ভাবনায় পড়ে গেলাম। সত্যিই তো, আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় মাথার উপর নির্ভরতার ছায়া থাকা অপরিহার্য। কিন্তু এ ভাবনাটাও মাথায় আসে—যাকে বিয়ে করব সে যদি আমার দু'সন্তানকে মন থেকে গ্রহণ না করে? আপা, কিছুদিন যাবৎ পুরো বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। আপনার মতামত চাই...

সারিকা

কাঁঠাল বাগান, ঢাকা।

●● বোন সারিকা, দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে আপনি যেরকম চিন্তাভাবনা করছেন তা অযৌক্তিক নয়। বিয়ের পর যদি আপনার স্বামী আগের দুই ছেলে-মেয়েকে যথাযথভাবে আদর-যত্ন না করে তা হলে তা কচি মনে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এজন্য যার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্কে জড়াবেন তাকে এই বিষয়টি খোলাখুলি বলতে হবে। তবে অনেক সময় এমনও হয় যে, কথা দিয়েও কথা রাখে না কেউ-কেউ। বিষয়টি আইন-কানুনের অনুশাসন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেও বাস্তবে তা হয়ে ওঠে না। তবে একজন উদার মনের মানুষকে যদি জীবনসঙ্গী হিসেবে পান, সেক্ষেত্রে দেখবেন হয়তো শর্ত ছাড়াই সে আপনার সন্তানদের যাবতীয় দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করছে। আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য আগাম শুভ কামনা রইল। ■

যা কিছু সংগীত
তাই নিয়ে সরগম
দেশের সংগীত বিষয়ক একমাত্র নিয়মিক পত্রিকা
প্রকাশনায় ২১ বছরে মাসিক
সরগম
সংগীত সম্পর্কে জানতে
সংগীত শিখতে
নিজে পড়ুন
অন্যদের পড়তে উৎসাহিত করুন
৩৪৫,লেক মার্কিট (২য় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন: ৮৩২২৭০৬, ৫৮৩২৯১৭
E-mail :sargam@yahoo.com,
facebook/sargam

মৃত্যুর ওপারে

রিয়াজুল আলম শাওন

'আসলে বাস্তব ঘটনা খুব বেশি ভয়ের হয় না। আর এটা ভয়ের ঘটনা না, তবে অলৌকিক ঘটনা।'

নাদিয়া বসে আছে আয়েশী ভঙ্গিতে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কোনও একটা বিষয় নিয়ে সে খুব আনন্দে আছে। আনোয়ার নাদিয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নাদিয়ার সাথে দেখা করতে এক ধরনের সংকোচ হয় তার। কারণ এই মেয়েটাকে সে খুব পছন্দ করে। শুধু পছন্দ নয়, পছন্দের চেয়ে বেশি কিছু। কিন্তু নিজের ভবঘুরে জীবনের সাথে আনোয়ার কোনও মেয়েকে জড়াতে চায় না। তাই নাদিয়ার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে। আজ নাদিয়া সরাসরি আনোয়ারের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। বুকের ভিতরের চাপা উত্তেজনাটা কমিয়ে আনোয়ার বলল, 'কেমন আছ, নাদিয়া?'

'ভাল আছি। আপনার তো কোনও খোঁজই পাই না।' নাদিয়া ভুরু কুঁচকে বলল।

আনোয়ার হাসল। এই কথার জবাব দেয়ার কিছু নেই।

নাদিয়াকে একদম অন্যরকম লাগছে। এতটা আত্মবিশ্বাসী তাকে আগে কখনও মনে হয়নি। নাদিয়া আনোয়ারের দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলল, 'আমাকে দেখতে কেমন লাগছে?'

হঠাৎ এমন প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গেল আনোয়ার। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'সুন্দর লাগছে।'

'আমার দিকে ঠিকমত না তাকিয়েই বলে দিলেন?' নাদিয়ার গলায় অভিমান।

আনোয়ার নাদিয়ার দিকে তাকাল। আসলেই খুব সুন্দর লাগছে নাদিয়াকে।

নাদিয়া বলল, 'আজ আপনার সাথে গল্প করতে এসেছি।'

'গল্প করতে?'

'হ্যাঁ, আজ আকাশটা সকাল থেকেই মেঘে ঢাকা। যে-কোনও সময় বৃষ্টি নামবে। আপনার কাছ থেকে গল্প শুনতে চাই।', বাইরের দিকে তাকিয়ে নাদিয়া বলল।

'কী গল্প?'

'আপনার জীবনে তো গল্পের শেষ নেই। তার থেকেই একটা বলবেন। আপনার কোনও একটা অ্যাডভেঞ্চার।'

'এক মাস আগের একটা ঘটনা তোমাকে বলা যায়। সেটা অবশ্য কোনও অ্যাডভেঞ্চার ছিল না।'

'খুব ভয়ের কোনও ঘটনা?'

'আসলে বাস্তব ঘটনা খুব বেশি ভয়ের হয় না। আর এটা ভয়ের ঘটনা না, তবে অলৌকিক ঘটনা। একই সাথে ঘটনাটা তীব্র কষ্টেরও।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'হ্যাঁ, করো।'

'পৃথিবীর এত অলৌকিক ঘটনা আপনার সাথেই ঘটে কেন?' নাদিয়া আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'হয়তো আমি যেমন রহস্যকে পছন্দ করি, রহস্যও আমাকে পছন্দ করে। আর জানোই তো রহস্যের মধ্যেই অলৌকিকতা, ভয়ের উৎপত্তি।' আনোয়ার আনমনে বলল। 'আজকে মনে হচ্ছে ভাল বৃষ্টি হবে।'

'শুধু বৃষ্টি না, ঝড়ও হবে। আবহাওয়ার সংবাদ জানেন না?' নাদিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমি টিভি খুবই কম দেখি।'

'ওহ। ভুলে গিয়েছিলাম।'

'তুমি এই ঝড়-বৃষ্টির দিনে বাসা থেকে বেরোলে কেন?'

'বাসা থেকে বেরিয়ে বাসাতেই আছি। আপনার বাসায় আসা নিষেধ নাকি?'

'না, না। তা বলিনি।'

'আপনার চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে বসবেন নাকি ছাদেই থাকবেন? যে-কোনও সময় বৃষ্টি নামতে পারে।' আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল নাদিয়া।

'বৃষ্টি নামুক, তারপর না হয় যাব।' আনোয়ারের গলায় ক্লান্তির ছাপ।

'আচ্ছা। আপনি গল্পটা বলুন।'

'গল্প না, সত্যি কাহিনি।'

'ওহ, দুঃখিত। হ্যাঁ, সত্যি কাহিনিটা বলুন।'

আনোয়ার বলতে শুরু করল।

'আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের এক পাগলা বন্ধু ছিল। নাম শাফায়েত বাঁধন। আমিও কিছুটা পাগলা গোছের। তাই ওর সাথে জমত ভাল। আমি তো সুযোগ পেলেই বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারে বেরোতাম। মানে ভয়, রহস্যের পিছনে ছুটতাম। বাঁধনও মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গী হত। কিন্তু বাঁধনের বাবা-মা ছেলের এ অভ্যাস পছন্দ করতেন না। তাঁরা ছেলেকে সংসারে বেঁধে রাখার জন্য বিয়ে দিয়ে দিলেন। এই তো কয়েক মাস আগেই বাঁধনের বিয়ে হলো। বিয়ে করে আসলে বেচারা বিপদেই পড়েছিল। বউ ছিল দজ্জাল প্রকৃতির। দূরে ঘোরাঘুরি তো বন্ধ হয়েছিলই, বাঁধনের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারেও ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল।

'দুই মাস আগে একদিন হুট করেই বাঁধনের সাথে দেখা হয়েছিল। আগে পোশাক-আশাকে এলোমেলো বাঁধনের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করেছিলাম। ছিল পরিপাটী পোশাক, কিন্তু মুখের সেই নির্মল হাসিটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। আমাকে দেখে ওর প্রবল আনন্দটা টের পেয়েছিলাম। কথা প্রসঙ্গে বাঁধন বলল সে সুখে নেই। তার স্ত্রী ছন্দা তার সব আনন্দের পথে প্রধান বাধা। আমি অবশ্য বাঁধনের কথা বেশি সিরিয়াসলি নিইনি। সেদিন গল্প তেমন জমছিল না আমাদের।

'আমি বাঁধনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তোর কী হয়েছে? ঠিকঠাক বল তো?"

'বাঁধন এদিক-ওদিক তাকিয়ে ইতস্তত করছিল।

'আমি বুঝতে পেরেছিলাম বাঁধন কিছু বলতে চায়। বাঁধনকে জোর গলায় বলেছিলাম, "কী হয়েছে, বাঁধন? তোকে খুব আপসেট মনে হচ্ছে।"

'বাঁধন হঠাৎই বলে বসেছিল, "আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, ছন্দা আমাকে মেরে ফেলবে।"

'আমার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল। মুখটা তবু যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলেছিলাম, "তুই কি পাগল হয়েছিস?"

'"তোর সাথে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে অতিপ্রাকৃত বিভিন্ন বিষয়ের সাথে পরিচিত হয়েছি। এখন কিছু বিষয়ে আমার মধ্যে সিক্সথ সেন্স কাজ করে। আমার মনের ভিতর কেউ বারবার বলতে থাকে ছন্দা আমাকে মেরে ফেলবে।"

'আমি বিষয়টা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, "আরে, গর্দভ। বউ তোর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে। তুই তাকে শত্রু হিসাবে নিয়েছিস, তাই তোর এমন মনে হচ্ছে। একটা মেয়ের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তোকে কেন মারবে?"

'"তা তো জানি না। হয়তো পুরনো সম্পর্কের কাছে ফিরে যেতে চায়।"

'"তোর মাথাটা গেছে।"

'বাঁধন ফ্যাকাসে ভঙ্গিতে হাসল। বলল, "আসলে আমি একটা গোপন বিষয় জেনে গেছি। ছন্দার অতীত ইতিহাস তেমন ভাল না। এখনও অন্য একটা ছেলের জন্য তার মন কাঁদে। আমি প্রমাণসহ সব খোঁজ-খবর বের করেছি।"

'"অতীত সবারই থাকে। তুই, আমি, আমরা সবাই-ই তো কোন না কোন সময় সম্পর্কে জড়িয়েছি। জীবনের বর্তমানটাই আসল। আশা করি তোর মত ভাল ছেলেকে পেয়ে ভাবী অতীতের সবকিছু ভুলে যাবে।"

'"জানি না। আমার কিছু হলে, আমার মা-বাবাকে একটু দেখিস।" করুণ গলায় বলেছিল বাঁধন।

'"ধুর! তোর কিচ্ছু হবে না।"

'"প্রতিরাতে ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙে।" বাঁধনের চোখে-মুখে ভয়ের ছায়া পড়েছিল।

'"কী দুঃস্বপ্ন?"

'"দেখি, আমি মারা যাচ্ছি। সারা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আর ছন্দা উন্মাদিনীর মত হাসছে।"

'"তোর আম্মা-আব্বাকে বলেছিস এসব বিষয়ে?"

'"নাহ।" বাঁধন আনমনে বলেছিল। "তারা বউমার সবকিছু নিয়ে মুগ্ধ।"

'আমি সেদিন বাঁধনের মন থেকে এই দুশ্চিন্তা দূর করার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কতটুকু কাজ হয়েছিল জানি না। তবে বাঁধনের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতাম। বেশিরভাগ সময়ই ওকে ফোনে পেতাম না। ছন্দাই ফোন ধরত। বাঁধনের কথা জিজ্ঞেস করলেই বলত ব্যস্ত আছে বা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার মনের ভিতর অজানা ভয় দানা বেঁধেছিল।

'সেই ভয়টাই একদিন সত্য হয়ে গেল। ঠিক এক মাস আগে রাত তিনটার দিকে আমার নাম্বারে ফোন করেছিল বাঁধন। আমি ঘুম থেকে ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠেছিলাম। আমি যতই "হ্যালো" বলছিলাম, ওপাশ থেকে শুধু শোঁ-শোঁ আওয়াজ হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পরে ওপাশ থেকে শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। বাঁধনের গলাই মনে হয়েছিল। আমি কাঁপা গলায় বলেছিলাম, "বাঁধন, বাঁধন, কী হয়েছে?" বাঁধন কেমন যেন টেনে-টেনে কথা বলছিল, "আ-আমাকে মে-মেরে ফেলছে। আমাকে মে-মেরে ফেলছে।"

'আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। "বাঁধন, কী বলছিস এসব!!"

'বাঁধনের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম। বহু কষ্টে সে আবার বলেছিল, "আ-আমার জা-জানালা..."

'"তোর জানালা কী?"

'"আমার জানালার শি-শিকগুলো নড়বড়ে। মিস্ত্রি...মিস্ত্রি..."

'বাঁধনের কথা শেষ হওয়ার আগেই লাইনটা কেটে গিয়েছিল। আমি অনেকবার ফোন করেও ব্যর্থ হয়েছিলাম। এরপর কী হলো জানি না, আমার চোখে ঘুম নেমে এসেছিল। এরপর

আবার চোখ মেলেই প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলাম। সকাল হয়ে গেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম আটটা বাজে। পরক্ষণে মোবাইলের দিকে নজর গিয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, কললিস্টে বাঁধনের নাম ছিল না। বাঁধনের নাম্বারে কল যাচ্ছিল। কিন্তু কেউ ধরছিল না। যে পোশাকে ছিলাম, সে অবস্থায়ই বাঁধনের বাসায় গিয়েছিলাম। গিয়েই বুঝলাম কিছু একটা ঠিক নেই। পুরো বাসা ভর্তি লোকজন। পুলিস এসেছিল। আমাদের কয়েকজন পুরনো বন্ধুও এসেছিল।

'বাঁধনদের বাসার পুরনো কাজের লোক নেয়ামতের কাছে জানতে পেরেছিলাম, বাঁধন গতকাল রাতে সুইসাইড করেছে। নেয়ামতকে আমি আগেও এই বাসায় দেখেছিলাম। সে গৃহস্থালি কাজ ছাড়াও অন্যান্য কাজে বেশ পারদর্শী। ইলেকট্রিক কাজ, ঘর রঙ করাসহ নানা কাজে সে বাঁধনদের পরিবারের আস্থা কেড়ে নিয়েছিল। জানতে পেরেছিলাম বাঁধনের বাবা-মা চিকিৎসার জন্য ইণ্ডিয়া গেছেন। বাসার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন নেয়ামতের উপর।

'আমার মাথা এলোমেলো লাগছিল। বুক ফেটে কান্না আসছিল। কিন্তু আগে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সবকিছু বোঝার চেষ্টা করছিলাম। পুলিসের সাথে কথা বললাম। গত রাতে বাঁধন প্রথমে দুধের সাথে মিশিয়ে এক গাদা ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। সেখানেই থেমে থাকেনি, সাথে-সাথেই ঘরের ফ্যানের সাথে দড়ি টানিয়ে ফাঁস নিয়েছিল। লাশ তখন হাসপাতালে ছিল। ডাক্তারদের ধারণা ছিল রাত বারোটার দিকে তার মৃত্যু হয়েছে। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। পুলিস এসে দরজা ভেঙে বাঁধনকে উদ্ধার করেছিল। আমাকে পুলিস বাঁধনের রুমের ভিতর ঢুকতে দিতে চাইছিল না। অনেক অনুরোধের পর অবশ্য কাজ হয়েছিল। আমি বাঁধনের ঘরের জানালার শিকগুলো পরীক্ষা করেছিলাম প্রথমেই। নাহ। সেগুলো মোটেই আলগা ছিল না। জানালার পাশেই কার্নিশ। সেখানে অনায়াসে একজন মানুষ দাঁড়াতে পারে। জানালার শিকগুলো তো একদম মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। বাঁধন ফোনে এসব কী বলেছিল? আর কললিস্টে তো বাঁধনের নাম্বার ছিল না। তা হলে সবটাই কি আমার স্বপ্ন ছিল? এটা কি শুধুই আত্মহত্যা? বাঁধন কি খামোকাই তার স্ত্রীকে সন্দেহ করত? নানা প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।

'ছন্দার দিকে লক্ষ করলাম। দেখে মনে হচ্ছে সে এই পৃথিবীতে নেই। মাঝেই-মাঝেই জ্ঞান হারাচ্ছিল, কাঁদছিল আকুল হয়ে। আহাজারি করে বলছিল, "মানুষটাকে আমি ভাল রাখতে পারিনি। সব দোষ আমার। কাল রাতেও আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। মানুষটা রুমে একা-একা ঘুমাতে গিয়েছিল। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। তখন কি জানতাম, তার মধ্যে এই চিন্তা আছে?"

আনোয়ার থামল।

নাদিয়া বলল, 'এরপর কী হলো?'

'আমি পুলিসকে জানিয়েছিলাম আমার সন্দেহের কথা। বলেছিলাম, বাঁধন বলেছিল ওর ধারণা ছিল তার স্ত্রী তাকে হত্যা করতে পারে। পুলিসের হাতে এ সংক্রান্ত কোনও প্রমাণই ছিল না। ছন্দাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। নেয়ামতকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের কোনও দোষ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঘটনা এখানেই শেষ হলে ভাল হত।'

নাদিয়া হুট করে বলল, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে। বাঁধন ভাই মারা গেলেন বারোটায়, আর আপনাকে ফোন করলেন রাত তিনটায়। সবটাই কি আপনার স্বপ্ন ছিল?'

'এটা একটা অতিপ্রাকৃত ঘটনা হিসাবেই নিয়েছি।' আনোয়ারের মুখের মাংসপেশী হঠাৎই শক্ত হয়ে গেল। 'ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি। বাঁধন নিয়মিত আমার সামনে আসছিল। সেগুলো স্বপ্ন ছিল নাকি আমি সত্যি বাঁধনকে দেখেছিলাম জানি না। বাঁধন একটাই কথা বলত, "আমার জানালার শি-শিকগুলো নড়বড়ে। মিস্ত্রি... মিস্ত্রি..." আমার বন্ধু ডিবি পুলিস অফিসার শাহেদ চৌধুরীকে সব খুলে বলেছিলাম। তদন্তে যেন নতুন করে হাওয়া লেগেছিল এরপর। কিছুদিনের মধ্যেই আসল রহস্য আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়েছিল।

'হুট করেই আমি শাহেদকে বলেছিলাম, "শাহেদ, বাঁধন বারবার মিস্ত্রি, মিস্ত্রি বলছিল।"

'শাহেদ আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

'আমি বলেছিলাম, "এমন কি হতে পারে না, নেয়ামতই সেই মিস্ত্রি?"

'"তোর মাথায় কী ঘুরছে বল তো?" শাহেদও কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিল।

'"ধরলাম, ছন্দা কৌশলে দুধের সাথে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। হাতে ছিল গ্লাভস। তাই গ্লাসে তার হাতের ছাপ ছিল না।"

'"কিন্তু স্ত্রীর হাতে গ্লাভস দেখে কি বাঁধন সাহেবের সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক না?" শাহেদ পাল্টা প্রশ্ন করেছিল।

'"এমন হতে পারে দুধের গ্লাসটা ছন্দা রুমের টেবিলে রেখে চলে গিয়েছিল। তাই বাঁধন গ্লাভস পরার বিষয়টা দেখতে পায়নি। আর রান্নাঘরেও তো মেয়েরা আজকাল গ্লাভস ব্যবহার করে।"

'"এরপর?"

'"আমরা পুরো বিষয়টা যদি এভাবে সাজাই, দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল বাঁধন। এরপর ঘরে নেয়ামত আর ছন্দা প্রবেশ করল। দু'জনের হাতেই গ্লাভস। ঘরের ফ্যানের সাথে দড়ি টানাল তারা। তারপর ধীরে সুস্থে দড়িতে ঝুলিয়ে দিল বাঁধনকে। ঘরের কোথাও সন্দেহজনক কোনও দাগ আছে কি না দেখল, তারপর সেগুলো মুছে ফেলল। ছন্দা পাশের রুমে চলে গেল। এরপর ভিতর থেকে দরজা লক করল নেয়ামত। জানালার নড়বড়ে শিকগুলো সহজে খুলে বের হলো সে। এরপর জানালার সামনের কার্নিশে দাঁড়িয়ে নতুন শিকগুলো জানালায় লাগিয়ে দিল। এমনিতেই সে দক্ষ মিস্ত্রি। আর আমরা কিন্তু লক্ষ করেছি জানালার শিকগুলো একদম নতুন।"

'"আমি তো তোর কথা শুনে হতবাক হয়ে যাচ্ছি।" শাহেদ আঁতকে উঠেছিল। "নেয়ামত এবং ছন্দাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। এবার মনে হয় তারা ছাড়া পাবে না।"

আনোয়ার আবার থামল।

নাদিয়া উত্তেজিত গলায় বলল, 'আপনার অনুমান ঠিক ছিল?'

আনোয়ার সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক ছিল। পুরনো প্রেমিকের কাছে ফিরতে ছন্দা এই জঘন্য কাজটা করেছিল। তার বিদেশে চলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। টাকার লোভে তাকে এই কাজে সাহায্য করেছিল নেয়ামত।'

'আপনার মধ্যে সত্যি অতিপ্রাকৃত কিছু ক্ষমতা আছে।' নাদিয়া কোমল গলায় বলল। 'আত্মাদের সাথে কি আপনি যোগাযোগ করতে পারেন?'

'এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।' আনোয়ার অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়ল। 'তবে বাঁধনের কাছ থেকে মিস্ত্রি বা জানালার শিকের ওই সূত্র না পেলে কিছুই উদ্‌ঘাটন সম্ভব হত না।'

নাদিয়া আনোয়ারের চোখে জল দেখতে পেল। পুরনো বন্ধুকে হারিয়ে আনোয়ার ভাল নেই। টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নাদিয়া কিংবা আনোয়ার কারও সেদিকে নজর নেই।

নাদিয়া আনোয়ারের কাঁধে হাত রাখল। 'আনোয়ার ভাই।'

আনোয়ার ধরা গলায় বলল, 'আমাদের সম্পর্কগুলো এমন নোংরা হয়ে যাচ্ছে কেন, নাদিয়া? বিনা দোষে কেন একজন মানুষ প্রাণ দেবে?'

নাদিয়ার খুব মায়া হচ্ছে আনোয়ারের জন্য। আচ্ছা, এই ছেলেটাকে কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরে রাখলে ব্যাপারটা কি খুব খারাপ দেখাবে? নাদিয়া আনোয়ারের মাথাটা তার বুকের সাথে শক্ত করে চেপে ধরে রাখল। ■

আলী লাইব্রেরী

টি এ রোড, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

এখানে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের নতুন ও সমস্ত রিপ্রিন্ট বই পাওয়া যায়।

মোবাইল: ০১৭১১-৮১৩৬০৫

কাজী সারওয়ার হোসেন

মেষ

২১ মার্চ–২০ এপ্রিল

মাসের শুরু থেকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করবে। যে কোনও ধাতব পদার্থের ব্যবসায় হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। কারও-কারও জন্য মাসের শেষ দু'সপ্তাহ বিশেষ শুভ বলে বিবেচিত হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার অনুকূলে যেতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য মাসটি বিশেষ শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ-কেউ বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রত্যাশার চেয়েও ভাল ফল অর্জনে সক্ষম হতে পারেন। রাজনীতিতে আপনার অবস্থান সুসংহত হতে পারে। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ৮, ১৫, ১৯, ২৪, ৩০।

বৃষ

২১ এপ্রিল–২১ মে

এ মাসে সার্বিকভাবে আপনার উপার্জন বৃদ্ধি পেতে পারে। সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রশংসিত হতে পারেন। চাকরিতে কারও-কারও বকেয়া পাওনাদির বিষয়টি নিষ্পত্তি হতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার মনের আকাশে জমে থাকা কালো মেঘ দূর হতে পারে। জমিজমা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের অবসান হতে পারে। কোনও পুরানো আইনী জটিলতার অবসান হতে পারে। বিদেশ যাত্রায় প্রবাসী আত্মীয়ের সহায়তা পেতে পারেন। রাজনীতিতে আপনার অবস্থান সুসংহত হতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন। বিশেষ শুভ তারিখ: ২, ৯, ১৩, ১৯, ২৫, ২৯।

মিথুন

২২ মে–২১ জুন

সুতা, কাপড় কিংবা তৈরি পোশাকের ব্যবসায় হাত দিলে সাফল্যের দেখা পেতে পারেন। জনসংযোগ ও প্রচারের কাজে সাফল্য অর্জিত হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে বিরাজমান জটিলতা দূর হতে পারে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে নতুন অনুষ্ঠানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন। পাওনা আদায়ের জন্য মাসের শুরু থেকেই উদ্যোগ নিন। চাকরিতে কারও-কারও কর্মস্থল পরিবর্তন হতে পারে। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ৫, ১০, ১৫, ১৯, ২৩, ৩১।

কর্কট

২২ জুন–২২ জুলাই

ব্যবসায়িক যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। কর্মস্থলে সার্বিক পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে। পরিবারের বয়স্ক কারও রোগমুক্তি ঘটতে পারে। সৃজনশীল কাজের প্রসারে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা পেতে পারেন। শিক্ষাক্ষেত্রে কারও-কারও বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকুন। বিশেষ শুভ তারিখ: ৫, ৮, ১৬, ১৯, ২৫, ৩১।

সিংহ

২৩ জুলাই–২৩ আগস্ট

চাকরিতে কারও-কারও কর্মস্থল পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। উপার্জনের নতুন উৎস খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যৌথ বিনিয়োগ শুভ। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার পক্ষে যেতে পারে। যে কোনও ধাতব পদার্থের ব্যবসায় হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। যে কোনও চুক্তি সম্পাদনের জন্য মাসের শেষ দু'সপ্তাহ বিশেষ শুভ। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন। বিশেষ শুভ তারিখ: ২, ১০, ১৬, ২০, ২৫, ২৯।

কন্যা

২৪ আগস্ট–২৩ সেপ্টে

চাকরির জন্য বিদেশে আবেদন করে কেউ-কেউ ইতিবাচক সাড়া পেতে পারেন। পাওনা আদায় করতে হলে কৌশলের আশ্রয় নিন। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে একাধিক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব পেতে পারেন। পেশাজীবীদের কারও-কারও পসার বৃদ্ধি পেতে

পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য সুখবর অপেক্ষা করছে। রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন। দূরের যাত্রা শুভ। যাবতীয় কেনাকাটায় লাভবান হতে পারেন। বিশেষ শুভ তারিখ: ৫, ৮, ১৪, ১৯, ২৩, ৩০।

তুলা

২৪ সেপ্টে–২৩ অক্টো

কর্মস্থলে সার্বিক পরিস্থিতি আপনার-অনুকূলে থাকতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার অনুকূলে যেতে পারে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে। পেশাজীবীদের কারও-কারও পসার বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনি একজন অভিনয়শিল্পী হয়ে থাকলে নতুন নাটক বা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন। কোনও গোপন শত্রুর পরিচয় জানা যেতে পারে। ব্যর্থ প্রেমের সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। দূরের যাত্রা শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ১, ৫, ১৪, ১৯, ২৩, ২৯।

বৃশ্চিক

২৪ অক্টো–২২ নভে

কর্মস্থলে সার্বিক পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। যে কোনও চুক্তি সম্পাদনের জন্য মাসের শেষ দু'সপ্তাহ বিশেষ শুভ। পাওনা আদায়ের জন্য মাসের শুরু থেকেই উদ্যোগ নিন। প্রেমের ব্যাপারে কেউ আপনার মনের দরজায় কড়া নাড়তে পারে। শিল্পকলা কিংবা সাহিত্যকর্মের জন্য সম্মাননা পেতে পারেন। আপনি একজন চিত্রশিল্পী হয়ে থাকলে বিদেশ থেকে সম্মাননা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ফাটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে লাভের দেখা পেতে পারেন। বিশেষ শুভ তারিখ: ৫, ৯, ১৫, ১৮, ২৩, ৩০।

ধনু

২৩ নভে–২১ ডিসে

ব্যবসায় ঝুঁকি গ্রহণ করে লাভবান হতে পারেন। এ মাসে সার্বিকভাবে আপনার উপার্জন বৃদ্ধি পেতে পারে। বেকারদের কারও-কারও জন্য মাসের শেষ দু'সপ্তাহ বিশেষ শুভ। পাওনা আদায় হতে পারে। যে কোনও তরল পদার্থের ব্যবসায়ে হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। ভাল লাগার মানুষই ভালবাসার মানুষে পরিণত হতে পারে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে বিদেশ থেকে সম্মাননা পেতে পারেন। কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ৮, ১৩, ১৮, ২৪, ৩০।

মকর

২২ ডিসে–২০ জানু

মাসের মাঝামাঝি সময়ে বিদেশ যাত্রার সুযোগ আসতে পারে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে একাধিক অনুষ্ঠানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন। ব্যবসায়িক লেনদেন শুভ। পাওনা আদায়ের জন্য মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে উদ্যোগ নিন। এমন কারও সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে যার সামাজিক অবস্থান আপনার চেয়ে উঁচুতে। দূরের যাত্রায় অচেনা সহযাত্রীর ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। শিক্ষার্থীদের কেউ-কেউ বিদেশে অধ্যয়নের সুযোগ পেতে পারেন। তীর্থ ভ্রমণ শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ৪, ৭, ১৩, ১৭, ২২, ২৮।

কুম্ভ

২১ জানু–১৮ ফেব্রু

জনসংযোগ ও প্রচারের কাজে সাফল্যের দেখা পেতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার পক্ষে যেতে পারে। ব্যর্থ প্রেমের সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। আপনি একজন চিত্রশিল্পী হয়ে থাকলে বিদেশ থেকে সম্মাননা পেতে পারেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। রাজনীতিতে প্রতিপক্ষকে কাবু করা সহজ হতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ। স্বাস্থ্য ভাল যাবে। বিশেষ শুভ তারিখ: ৪, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, ৩১।

মীন

১৯ ফেব্রু–২০ মার্চ

বেকারদের কারও-কারও মাসের মাঝামাঝি সময়ে বিদেশ যাত্রা হতে পারে। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে আপনার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য মাসের শেষ দু'সপ্তাহ বিশেষ শুভ। পাওনা আদায় হবে। আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। রাজনীতিতে আপনার অবস্থান সুদৃঢ় হতে পারে। জমিজমা সংক্রান্ত পারিবারিক বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি বাড়তি যত্ন নিন। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ১০, ১৬, ১৮, ২১, ২৭।

আপনার প্রশ্ন ও সমাধান

লাজিমা আফরিন
দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।
● জন্ম: ২৭-১২-৮৮। আমার কবে নাগাদ বিয়ে হতে পারে?
●● আগামী বছরের প্রথমার্ধে বিয়ের জোর সম্ভাবনা আছে।

আলী কদর
সরাইল, বি. বাড়িয়া।
● জন্ম: ১৩-৭-৮২। আমার জন্য কোন্ ব্যবসা উপযোগী হতে পারে?
●● যে কোনও তরল পদার্থের ব্যবসায় হাত দিলে সুফল পেতে পারেন।

মিতা রহমান
কচুখেত, ঢাকা।
● জন্ম: ১৭-২-৯২। যাকে ভালবাসি তার জন্মতারিখ: ৫-৬-৮৭। এক্ষেত্রে ফলাফল কী হতে পারে?
●● প্রেমে সাফল্যের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে; অভিভাবকের পছন্দে বিয়ে হলে বিবাহিত জীবন সুখের হতে পারে।

মোনা
আত্রাই, কুড়িগ্রাম।
● জন্ম: ১-৮-৮৯। আমার কবে নাগাদ বিয়ে হতে পারে?
●● আগামী বছরের শেষ ভাগে বিয়ের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

মাহিয়া রহমান
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
● জন্ম: ২৮-১০-৯০। ভবিষ্যতে আমি কি বিদেশ যেতে পারব?
●● আগামী দু'বছরের মধ্যে এক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

আফজাল হোসেন
শৈলকূপা, নারায়ণগঞ্জ।
● জন্ম: ৫-৭-৮০। ভবিষ্যতে আমার অর্থভাগ্য কীরকম হতে পারে?
●● ৪২ বছর বয়স থেকে আর্থিক বিষয়ে উন্নতির দেখা পেতে পারেন।

কামরুল হাসান
বানারীপাড়া, বরিশাল।
● জন্ম: ১৮-১২-৯২। আমি লেখালেখিতে সুনাম অর্জন করতে চাই...
●● চর্চা চালিয়ে গেলে বাস্তবধর্মী লেখালেখির মাধ্যমে সুনাম অর্জিত হতে পারে।

সাবরিনা
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।
● জন্ম: ২৫-১০-৯৬। যাকে ভালবাসি তার জন্মতারিখ: ১-৭-৮৯। এক্ষেত্রে ফলাফল কী হতে পারে?
●● এ সম্পর্ক বিয়েতে গড়াতে পারে।

মৌরী
সেনবাগ, নোয়াখালী।
● জন্ম: ২৭-১-৭২। আমার সার্বিক উন্নতির জন্য কী পাথর পরা উচিত?
●● ডান হাতের মধ্যমায় ৭-৮ রতি ওজনের ইন্দ্রনীলা (রুপোয়) পরলে উপকার পেতে পারেন।

সিরাজ হায়দার
তালা, সাতক্ষীরা।
● জন্ম: ২৩-৯-৮৮। ভবিষ্যতে আমি কি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা পাব?
●● যে কোনও ব্যবসায় আপনি হাত দিতে পারেন, তবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।

রিনা খান
বনানী, ঢাকা।
● জন্ম: ২৬-৮-৮৯। কাজে-কর্মে সবসময় বাধার সম্মুখীন হই; প্রতিকার কী?
●● ডান হাতের মধ্যমায় ৬-৭ রতি ওজনের ইন্দ্রনীলা (সোনায়) পরলে উপকার পেতে পারেন।

মালেক মজুমদার
কাঁঠালিয়া, ঝালকাঠি।
● জন্ম: ১৩-৩-৮০। আমার কবে নাগাদ বিয়ে হতে পারে?
●● আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বিয়ের সম্ভাবনা আছে।

ফায়জুল ইসলাম
পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।
● জন্ম: ২১-৪-৭৫। ভবিষ্যতে আমার আর্থিক অবস্থা কেমন হতে পারে?
●● ডান হাতের কনিষ্ঠায় কমপক্ষে ৮ রতি ওজনের ব্রাজিলিয়ান পান্না (রুপোয়) পরলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে পারে বলে আশা করা যায়।

রুমানা তৌহিদ
উত্তরা, ঢাকা।
● জন্ম: ১৯-২-৯৫। ভবিষ্যতে আমি কি সংগীতে সুনাম অর্জন করতে পারব?
●● চর্চা চালিয়ে গেলে বছর দুয়েকের মধ্যে পরিচিতি লাভে সক্ষম হবেন।

শাহ মোয়াজ্জেম
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।
● জন্ম: ১০-৯-৮১। ভবিষ্যতে আমি কি বিদেশে ইমিগ্র্যান্ট হতে পারব?
●● যথাযথ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে অদূর ভবিষ্যতে আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে।■

এ বিভাগে চিঠির উত্তর পেতে হলে ইংরেজিতে সঠিক জন্মতারিখ, পুরো ঠিকানা ও এক কপি ছবি সহ লিখতে হবে।

সেলফি

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

আগের দিনের মানুষ মন্ত্র-তন্ত্রে দারুণ ভয় পেত, তাই ওদের এসব বলে দূরে রাখা সহজ ছিল।

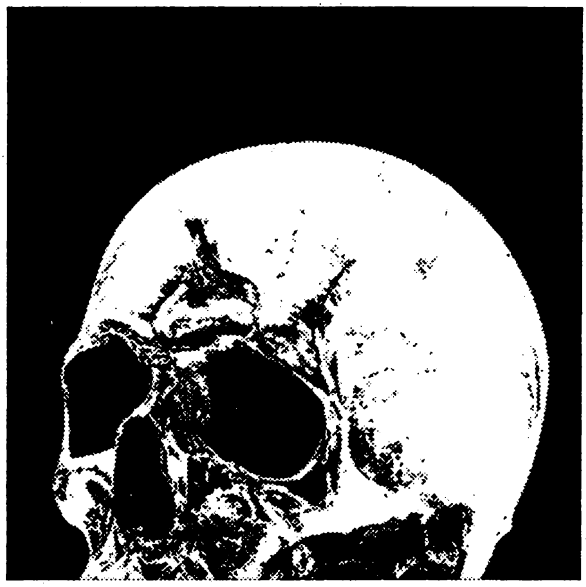

'চেয়ারটা দেখেছেন?' হাত বাড়িয়ে সিংহাসনের মত আসনটা দেখাল ট্যুর গাইড। লোকটার নাম বড় করে লেখা আছে নেইমপ্লেটে, *কাদের*। ছোটখাট দেখতে, মাথায় আধকাঁচা চুল, ভুরু জোড়া কপালের মাঝখানে এসে এক হয়ে গেছে। বাড়তি নাটকীয়তা করা লোকটার স্বভাব। থেকে-থেকে কানের লতিতে তা দেয়া দ্বিতীয় স্বভাব।

মতিনউদ্দিন স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে এসেছে তিতিরপুরে। জায়গাটাকে শহর না বলে গ্রাম বলাই ভাল। আশপাশের রাস্তার যা অবস্থা তাতে যাত্রা পথে প্রাণ আসে আর যায়। প্রাইভেট কারের টায়ার যে পাংচার হয়নি তা-ই মতিনের চোদ্দ পুরুষের কপাল। এমনটা আগে জানলে এখানে কিছুতেই আসত না সে! তবে না এলেও রেহাই পেত কি না সন্দেহ! স্ত্রী, আফসানা হায়দার, ছেড়ে দিত না তাকে। তিরিক্ষে মেজাজ আফসানার। বিয়ের পর থেকেই হাড় জ্বালাচ্ছে মতিনের, অথচ কিচ্ছু করার নেই। বিয়ের পর সাত বছর পেরিয়ে গেছে, কোনও সন্তান হয়নি তাদের। সময়ের সঙ্গে বেড়েছে আফসানার মিলিটারি মেজাজ আর স্বাস্থ্য। সেই পঁয়তাল্লিশ কেজি ওজনের ছিপছিপে তরুণী, যার ফটো দেখে মতিনউদ্দিন প্রেমে পড়ে নিমিষেই বিয়েতে হ্যাঁ করে দিয়েছিল, আজ চুরাশি কেজির চলমান পর্বত! তার উপরে সন্তান না পাবার দোষও থেকে-থেকে মতিনের উপরেই চাপায় আফসানা। মহা যন্ত্রণা!

মাসখানেক আগে একটা চকমকে বিজ্ঞাপনে চোখ পড়ে যায় আফসানার। দেশের দক্ষিণ সীমান্ত ঘেঁষা তিতিরপুরে খুলেছে নতুন জাদুঘর। প্রায় পনেরো বছর আগে প্রত্নতত্ত্ববিদরা এলাকাটায় প্রাচীন এক সভ্যতা খুঁজে পায়। তারপর থেকেই শুরু হয় উদ্ধার কাজ। একটু-একটু করে বহু পুরানো দ্রব্যাদি আবিষ্কার হয় সেই মাটি চাপা ইমারতগুলো থেকে। বিজ্ঞানীরা বলেন, ওগুলো নাকি হাজার-হাজার বছর পুরানো *ফারকানি* সভ্যতার নিদর্শন। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে হারিয়ে গিয়েছিল সভ্যতাটা। এরপর মাসাবধি হইচই হয় আবিষ্কারগুলো নিয়ে। দৈনিক নিউজ কাভারেজ করে বিশিষ্ট টিভি চ্যানেলগুলো, পত্রিকায় ফিচার ছাপা হয়। প্রাচীন লিপি পাঠোদ্ধারে তোড়জোর শুরু হয়, এক্সপার্ট আসে বিদেশ থেকে। ক্রমশ এক্সক্লুসিভ সব নতুন খবরের ভিড়ে চাপা পড়ে যায় সেই আবিষ্কার। তাই হুট করে বিজ্ঞাপনটা চমকে দেয় আফসানাকে। প্রাচীন পুরাকীর্তি সংস্কার করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে তিতিরপুরেই। বিশাল সংগ্রহশালাটা দেখবার জন্য সেই থেকে মরিয়া হয়ে উঠেছে আফসানা।

মতিনউদ্দিন বাধা দিয়ে কূল করতে পারেনি। স্ত্রীকে বাধা দিয়ে কোনদিনই সে জিততে পারেনি। আফসানার স্বাস্থ্য বিয়ের পর যে হারে বেড়েছে, মতিনের স্বাস্থ্য ঠিক সেই হারে কমেছে। এখন তার ওজন মেরে কেটে পঁয়ষট্টি কেজি, চেহারা লিকলিকে বাঁশের মত। শরীরে কোট চাপালে মনে হয় যেন কাকতাড়ুয়ার বন্ধু। মুখটাও ওই কাকতাড়ুয়ার মাথারূপী হাঁড়ির মত, গোল।

মিউজিয়াম কোম্পানির নিজস্ব বাস থাকলেও প্রাইভেট কার নিয়ে এসেছে ওরা। গাড়িটা পার্কিং চত্বরে রেখে টিকিট কেটে এন্ট্রি নিয়েছে ভিতরে। দর্শনার্থীদের জন্য গাইডের ব্যবস্থা করে দিয়েছে মিউজিয়াম অথরিটি, প্রতি পনেরো জনে একজন করে গাইড। খুব বেশি ভিজিটর নেই আজ, মতিনরা ছাড়া আর মাত্র চারটে দল দেখা গেছে সুবিশাল মিউজিয়ামে। এক-একটা দলকে গাইডরা এক-এক দিকে দেখাচ্ছে। ওদের ঘরে ওরা ছাড়া আর কোনও দল নেই। বাকি দলগুলো অন্য ঘরগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। মিউজিয়ামে কক্ষ সর্বসাকুল্যে আটচল্লিশটা, ঢোকার সময়ে দেয়ালে বড় করে প্রতিটি ঘরে সংরক্ষিত দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা আছে।

চোখ বড়-বড় করে চেয়ারের দিকে তাকাল আফসানা হায়দার। মতিনউদ্দিনের দৃষ্টিতে নিরামিষ ভাব, মিউজিয়ামের কিছু দেখেই মজা পাচ্ছে না সে। এই জাতীয় পুরানো জিনিস দেখতে বিরক্তি লাগে তার। আপাতত মনে-মনে বউয়ের মুণ্ডুপাত করছে।

গাইড কাদের বলল, 'চেয়ারটা দেখে খুব সাধারণ মনে হচ্ছে, তাই না?' গোটাকতক দর্শনার্থী সায় দিয়ে মাথা নাড়ল। বাকিরা অনড়। কাদের কথা চালল, 'এই দেখুন না, হাতলে খোদাই করে হাবিজাবি কী সব লেখা! পায়াগুলো প্রয়োজনের তুলনায় ছোট, যেন কোনও বাচ্চাকে উঠিয়ে বসানোর ব্যবস্থা করেছে। রাজ সিংহাসনের পায়া ছোট করার কী দরকার? উঁচুপদের মানুষ, উঁচু আসনে বসবে, সেটাই তো রীতি! তাই না?'

এবারে মাথা নাড়ল মতিনউদ্দিন। সত্যিই, সিংহাসন বটে, হয়তো কালের বিবর্তনে সাদামাঠা দেখাচ্ছে। কিন্তু এত ছোট-ছোট পায়ার ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক। তা হলে কি সে যুগের রাজারা ছোটখাট ছিল? নাকি ঘটনা অন্য কিছু?

দর্শকদের চুপ থাকতে দেখে খেই ধরল

মনির বুক স্টল ও সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র

প্রোপ্রাইটর: মনির হোসেন

এখানে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের নতুন ও সমস্ত রিপ্রিন্ট বই পাওয়া যায়।

মুক্তবাংলা মার্কেট সংলগ্ন, মীরপুর-১

মোবাইল: ০১৯১২-২২৫৫৮৩

কাদের। 'চেয়ারটা দেখে হেলাফেলার মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু এই চেয়ারেই বসত রাজা, পঞ্চম মামামস্‌সা।'

'এ আবার কেমন তর নাম?' প্রতিবাদী হলো দলটার এক প্রবীণ সদস্য। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের ঘরে, গালে ভাঁজ পড়েছে, চোখে চশমা। চশমার উপর দিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে দেখছে গাইডকে। লোকটার স্ত্রী কবজিতে আলতো করে চিমটি কাটল। স্বামী বোকার মত প্রশ্ন করে লজ্জায় ফেলে দিয়েছে বেচারিকে।

'আঙ্কেল, নামটা ফারকানীয়। আপনি নিশ্চয়ই আড়াই হাজার বছর আগের রাজাদের নাম মণ্টু, কামাল, কুদ্দুস আশা করেন না,' পাশ থেকে ফোড়ন কাটল আরেক দর্শনার্থী। গাইড মুখ টিপে হাসল। মতিনউদ্দিনও ফিক করে হেসে ফেলল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বউয়ের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে হাসিটা গায়েব হলো মুখ থেকে। মুখটা কালো হাঁড়ির মত হয়ে গেল ফের।

ছোট্ট কাশি দিয়ে ব্যাপারটা স্বাভাবিক করল কাদের। 'আহা! আড়াই হাজার বছর আগেকার রাজার নাম নিয়ে দয়া করে নিজেদের মধ্যে মারামারি লাগাবেন না। মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ আমাকে ফাইন করবে!' সবাই হেসে ফেলল একযোগে। কাদের বলে চলল, 'দেখতে সাদামাঠা রাজার আসন মনে হলেও জিনিসটা একদম সাদামাঠা নয়। অন্তত ইতিহাস ভিন্ন কথা বলে। এই চেয়ারটা রাজ পরিবারের সম্পদ। রাজা প্রথম মামামস্‌সার সভার বিশিষ্ট স্থপতি, ববাভভা এটা তৈরি করে। লোকটা এলেবেলে স্থপতি তো ছিলই না, বরং রীতিমত তন্ত্রসিদ্ধ সাধকও ছিল। লিপিবদ্ধ আছে, এই চেয়ারে এমন মন্ত্র পড়ে কারসাজি করা হয়েছিল যাতে রাজা ছাড়া এতে কেউ বসতে না পারে। রাজা কিংবা রাজ পরিবারের উত্তরাধিকারী ছাড়া কেউ এতে বসলে কঙ্কালে বদলে যেত তার শরীর। রাজা প্রথম মামামস্‌সা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে হাসিল করেছিল্ ফারকানি অঞ্চল। রাজসভা তৈরির পর ভবিষ্যৎ নিয়ে বড্ড চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। ততদিনে সে দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত, রাজ্য পরিচালনার ভার তার কাঁধে বোঝার মত। কিন্তু সে অবস্থাতেও নিজের সৎ ভাইদের মনটা ঠিক বুঝতে পেরেছিল। ভাইয়েরা কেবল দিন গুনছিল কবে সে মরবে। তখন তারা সিংহাসন সহজেই দখল করে নিতে পারবে। রাজা দ্বিতীয় মামামস্‌সা সে সময় নেহায়েত নাবালক, দশ বছরের কিশোর, তাই তাকে পরবর্তী সিংহাসনের দাবিদার করে গেলেও বাহুবলে সিংহাসন দখল ঠেকাতে পারবে এমন বিশ্বাস করতে পারেনি রাজা প্রথম মামামস্‌সা। সুতরাং, পরবর্তী রাজার রাজত্ব নিশ্চিত করতেই এই চেয়ারের উদ্ভব।'

পিছনের সারির ডানদিক থেকে তৃতীয় মেয়েটা আপত্তি তুলল, 'যতসব গুলপট্টি!' মুখ বাঁকা করে পোর্টেবল মেকাপ কিট খুলে সামান্য পাউডার ঘষতে ব্যস্ত হয়ে গেল ফের। বিরক্তির চোখে আফসানা হায়দার দেখল মেয়েটাকে। একরত্তি মেয়ের কত্ত সাহস! বড়দের দঙ্গলে মাথা তুলে কথা বলে! তার ইচ্ছে করল এক চড়ে মেয়ের সব কটা দাঁত ফেলে দিতে। কিন্তু আপাতত কিছুই করল না সে, ঘরের বাইরে এলে নিজের ভালমানুষী মুখোশটা পরে নিতে পছন্দ করে আফসানা, তখন তার সাত চড়ে রা নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে মতিনের বেলায়, তাকে ঘরে এবং বাইরে সমান টাইট দেয় সে।

'হতেও পারে!' সায় দিল কাদের। 'তবে ফারকানি জাতির ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে রাজা প্রথম মামামস্‌সা থেকে শুরু করে পঞ্চম মামামস্‌সা পর্যন্ত প্রত্যেকে এই সিংহাসনে বসেই রাজকার্য চালিয়েছে। সম্ভবত পঞ্চম মামামস্‌সার আমলেই বিরাট কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায় ফারকানি সভ্যতা। এর পরের কোনও ইতিহাস পাওয়া যায়নি। এই সুদীর্ঘ সময় রাজাদের বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র হয়নি, কিংবা তাদের সিংহাসন কেউ দখল করতে চায়নি এমনটা ভাবা ঠিক নয়। সে সময় ক্ষমতার লড়াই লেগেই থাকত রাজায়-রাজায়। এমনকী পরিবারেও সিংহাসন দখলের জন্য তোড়জোর চলত। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে একের পর এক নির্বাচিত রাজাই পারিবারিক সূত্র ধরে ক্ষমতায় এসেছে, এই সিংহাসনে বসে রাজ্য চালিয়েছে। কী অদ্ভুত! তাই না?'

'তারমানে ঘটনা সত্যি?' পাউডার ঘষা বন্ধ করে বলল মেয়েটা।

'সত্যি? কে জানে!' ঠোঁট উল্টাল কাদের, 'আমি ইতিহাস জানি, সত্যি-মিথ্যার হিসাব আমার কাছে নেই। ইতিহাস তার নির্দেশ দেয়নি, ম্যাডাম। ইতিহাস ঘোলাটে।'

'ওহ!' খানিকটা দমে গেল মেয়েটা।

হাসল কাদের, মেয়েটার অবস্থা দেখে মায়া হচ্ছে। আজকালকার ছেলে-মেয়েরা মিউজিয়ামমুখী হয় খুব কম, তাও আবার শহর থেকে এত দূরে, আসারই কথা না। এই মেয়ে মনে হয় মা-বাবার পাল্লায় পড়ে এসেছে। তবুও আগ্রহ নিয়ে শুনছে, এ-ই বা কম কী!

মামামস্‌সা রাজতন্ত্রের সিংহাসন আড়াই হাজার বছর পাড়ি দিয়ে অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে। যা কালশিটে পড়েছিল, স্পেশাল লিকুইড ঢেলে সব পরিষ্কার করা হয়েছে। এখন অনেকটাই পরিচ্ছন্ন লাগছে দেখতে। সোনালি হাতল, সোনালি পায়া, আর গদি হালকা বাদামি মখমলের তৈরি। মখমলটুকু এখনও নরম, খুব আশ্চর্যজনকভাবে এতদিন চাপা থেকেও একটুও অমসৃণ হয়নি। চেয়ারের পাশে একটা মাটির ফলকে কায়দা করে লেখা আছে ইতিহাস। যে কথাগুলো দর্শনার্থী দলটাকে কাদের এতক্ষণ বলছিল তার সবটাই ওখানে লেখা। সঙ্গে লেখা আছে মামামস্‌সা রাজাদের রাজত্বকাল। সিংহাসনের পিছনে, ধার ঘেঁষে দু'পাশে দুটো রঙিন পাখা মাটির সঙ্গে পাকাপাকিভাবে লাগানো। বিশালাকার হাতপাখা দুটো উঁকি মারছে আসনের দুই কাঁধে। দেখে মনে হয় বাতাস করে রাজার দফারফা করে দেবে।

কাদের অন্যদিকে পা বাড়াল। দর্শনার্থী দলটা একমনে অনুসরণ করল তাকে। ঘরের আনাচে-কানাচে লাগানো কয়েকটা ছবি দেখিয়ে রাজ পরিবারের বর্ণনা দিয়ে চলল সে। দুই-একটা প্রশ্নের উত্তরও দিল থেকে-থেকে। রাজা তৃতীয় মামামস্‌সার বিশাল তলোয়ার দেখে চোখ কপালে উঠল আফসানার। এত বড় একটা অস্ত্র দিয়ে কীভাবে লড়াই করত ভেবেই পেল না! মতিনও দেখল তলোয়ার, মনে-মনে বলল, রাজা তৃতীয় মামামস্‌সাকে ভাড়া করে আফসানার কল্লাটা ফেলে দিতে পারলে কত ভালই না হত!

পুরো দলটা নিয়ে কাদের ঘর থেকে বেরিয়ে লম্বা করিডর ধরে ডানে মোড় নিল। তারপর হাতের বাঁয়ে একটা ঘরে চলে গেল। সেখানে আড়াই হাজার বছর আগের মানুষের জীবনধারা নিয়ে কিছু বিস্তারিত বিবরণ আছে। আছে তাদের ব্যবহার্য সামগ্রীর কিছু নিদর্শন।

মতিনউদ্দিন দলটা থেকে কৌশলে পিছিয়ে গেল। ফিরে এল আগের ঘরটাতে। লোভী চোখে দেখল মামামস্‌সা রাজাদের সিংহাসনটা। আহা! কী ভালই না হত ওতে বসে সরাসরি কঙ্কাল হয়ে যেতে পারলে! রউয়ের গঞ্জনায় জীবনটা এমনিতেই তেজপাতার মত ভাজাভাজা হয়ে গেছে। সারাদিন নানা বিষয়ে ঝগড়া করতে-করতে রীতিমত ক্লান্ত মতিন। জীবন থেকে মুক্তি পাবার এমন কোনও উপায় বহুদিন ধরে খুঁজছে। বিষ খাওয়ার কথা ভেবেছে, পারেনি, যদি হাসপাতালে নিয়ে ওকে বাঁচিয়ে ফেলে, এই ভয়ে। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে পারেনি, যদি ফ্যান ভেঙে কোনক্রমে বেঁচে যায়, তবে! পাহাড় থেকে লাফাতে পারেনি, উচ্চতাভীতি আছে বলে। গাড়ির সামনে ঝাঁপাতে পারেনি, না মরে যদি পঙ্গু হয়ে যায়, তা হলে তো মাঝে-মাঝে বাসা থেকে পালাতেও পারবে না। কিন্তু চেয়ারে বসে নিশ্চিত মৃত্যু থাকলে অত ঝামেলা নেই। বসো আর পটল তোলো, একদম সহজ উপায়।

চারদিকের দেয়ালে আর সিলিঙে উঁকি দিল মতিন। নাহ্, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা নেই। কর্তৃপক্ষ এখনও কেন সিকিউরিটির এই ব্যবস্থাটুকু নেয়নি ভেবে অবাক হলো সে। তবে সেসব নিয়ে আপাতত খুব বেশি মাথা ঘামাল না। একবার সাবধানে চেয়ারটাকে পরখ করল হাত দিয়ে। ঘষে মোটামুটি চকচকে করা হয়েছে। বাড়তি সোনালি রং পালিশ করা হয়েছে। হাতল ধরে চেয়ারটা তেমন নড়বড়ে মনে হলো না তার। একবার বসেই দেখবে নাকি? ভাবল, কেউ তো নেই আশপাশে, বসলে ক্ষতি কী? কেউ টেরও পাবে না। মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মতিন, ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে লাভ নেই, বসেই দেখবে।

পিছনটা চেয়ারের মখমলে প্রায় স্পর্শ করে-

করে ভাব, এমন সময় খপ করে একটা হাত এসে পড়ল মতিনের ঘাড়ে। ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে মতিন তাকাল হাতের মালিকের দিকে। জমে হিম হয়ে গেল, ওর রুদ্রমূর্তি-স্ত্রী স্বয়ং হাতের মালকিন!

'কী করছিলে তুমি, হুঁ?' হুঙ্কার দিল আফসানা হায়দার।

'না, ইয়ে মানে...' ইতস্তত করল মতিন, মুখে কথা সরছে না। ভয়ে গলায় একদলা পাথর আটকে গেছে যেন।

'আমতা-আমতা করছ কী? রাজা হবার শখ হয়েছে, তাই না? রাজা হবে?' চোখ পাকাল আফসানা। পারলে চিবিয়ে খায় স্বামীকে।

'না, মানে, ভাবছিলাম। জীবনে তো কিছুই পেলাম না, যদি সিংহাসনে বসতে পারি তবুও কিছু একটা থাকবে বলার মত।'

'তাই নাকি?'

'হুম। সেলফি তুলে বন্ধুদের দেখাতে পারতাম।' পকেটে হাত দিয়ে স্মার্টফোনটা উদ্ধার করল মতিন।

চকচক করে উঠল আফসানার চোখ দুটো। 'সেলফি!' ঘাড় ধরে একপাশে সরিয়ে দিল মতিনকে। 'চমৎকার আইডিয়া!'

মতিন ঘাড় ডলতে-ডলতে সরে দাঁড়াল, আত্মহত্যার চেষ্টা লাটে উঠেছে। তবে এই বুজরুকি চেয়ারে বসে আত্মহত্যা করা যেত না সেটা মোটামুটি নিশ্চিত, এসব কিংবদন্তী স্রেফ মানুষকে দূরে রাখার জন্য প্রাচীন রাজ-রাজড়ারা বানাত। আগের দিনের মানুষ মন্ত্র-তন্ত্রে দারুণ ভয় পেত, তাই ওদের এসব বলে দূরে রাখা সহজ ছিল।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে নিজের স্মার্টফোনটা বের করে ব্যাগটা মতিনের হাতে ধরিয়ে দিল আফসানা হায়দার। গোবেচারার মত দাঁড়িয়ে বউয়ের কাণ্ড দেখে চলল মতিন। আফসোস হলো, সেলফিটা নিজে তুলতে পারলে কত ভালই না হত, আসলেই বন্ধুদের দেখানো যেত। বন্ধুমহলে বলার মত কথাই আজকাল পায় না মতিন, আফসানার বদনাম শুনতে-শুনতে ওদের কান পচে গেছে, তাকে দেখলেই ইদানীং পালিয়ে বাঁচে।

মতিনকে গার্ডে রেখে দিব্যি আয়েশ করে সিংহাসনে বসল আফসানা হায়দার। প্রশস্ত দাঁতে ঝকমকে হাসি দিল। ঘচাৎ করে ফ্রন্ট ক্যামেরায় একটা সেলফি তুলে ফেলল। তারপর আরও কয়েকটা তুলল। গোটা সাতেক সেলফি তুলে শান্ত হলো অবশেষে। এরপর স্বামীকে বগলদাবা করে চলল ভিতরের ঘরে। কাদেরের নেতৃত্বাধীন দলটার সঙ্গে এক হলো সেখানে গিয়ে। ট্যুরের মাঝামাঝি আছে ওরা, আরও বেশ কয়েক ঘণ্টা চলবে এই পরিক্রমা।

মতিন সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠল। আজও এক খাটে ঘুমায়নি দু'জন। বিয়ের দেড় বছর পর থেকেই এই নিয়ম, আফসানা সহ্যই করতে পারে না তাকে। তাই ওরা আলাদা ঘরে ঘুমায়।

স্মার্টফোনটা পাওয়ার বাটন টিপে চালু করল মতিন। স্ক্রিন আনলক করা হতেই ফেসবুক ওপেন করে স্ট্যাটাস আপডেট দেখল। আফসানা সিংহাসনে বসা ফটো আপলোড করেছে গতকাল রাতেই, তাতে এখন পর্যন্ত বারোশো লাইক পড়েছে। ওর মত বেঢপ মানুষের এত ফ্যান ফলোয়ার কীভাবে হয় কিছুতেই ভেবে পায় না মতিন। নিজের দেয়ালের পোস্টে টেনেটুনে দশটাও লাইক পড়ে না সাধারণত।

চোখ মুছে, মুখ ধুয়ে নাস্তা বানাল মতিন। সকালের এই কাজটা ধরা-বাঁধা ওকেই করতে হয়। আফসানা ঘুম থেকে ওঠে দেরি করে, উঠেই টেবিলে নাস্তা না দেখলে তুলকালাম করে। বিয়ে করে সুখ সব দিক থেকে গায়েব হয়েছে মতিনউদ্দিনের!

আফসানাকে ডাকতে গিয়েই অবাক হলো মতিন। কোথায় গেল মেয়েটা? খাটে তো নেই! ওয়াশরুমেও নেই। বারান্দাতেও নেই, বাগানেও না, কোথাও নেই। কেবল স্মার্টফোন পড়ে আছে বিছানার উপর, জুতো পড়ে আছে জুতোর জায়গায়, ভ্যানিটি ব্যাগও আছে যথাস্থানে।

দিশেহারা হয়ে যত্রতত্র ফোন করল মতিন।

১/১২/১৬ প্রকাশিত হচ্ছে
কিশোর থ্রিলার
ভলিউম-১৪০/২
শামসুদ্দীন নওয়াব

ক্যামেলটের জাদুকর/শামসুদ্দীন নওয়াব: নতুন লাইব্রেরি সহকারী মিস্টার মার্লি আসলে কে? রাজা আর্থারের সেই বিখ্যাত জাদুকর মার্লিনের সঙ্গে তাঁর চেহারার এত মিল কেন? বিশাল মাছের ট্যাঙ্কের ওটা কি সত্যিই গোল্ডফিশ, নাকি...? এসব প্রশ্নের জবাব পেতে চাইল তিন গোয়েন্দা।

কয়েন-রহস্য/শামসুদ্দীন নওয়াব: শেলী আন্টির সঙ্গে টিম্বারউলফ লেকে ক্যানু ট্রিপে বেরিয়েছে তিন গোয়েন্দা। জঙ্গলে প্রকাণ্ড এক পাথরের গায়ে লেখা রহস্যময় এক ধাঁধা আবিষ্কার করল ওরা। ধাঁধাটার সঙ্গে কি বছর খানেক আগে চুরি যাওয়া দুষ্প্রাপ্য কয়েনগুলোর কোন যোগসূত্র আছে? সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে তদন্ত শুরু করল তিন গোয়েন্দা।

মৃত্যুকূপ/শামসুদ্দীন নওয়াব: গণ্ডগোল বেধেছে হিরু চাচার সোনার খনিতে। সরেজমিনে তদন্ত করতে কিশোরকে নিয়ে প্লেনে করে রওনা দিল সে। শুরু হলো পদে-পদে বিপদ। স্বর্ণখনির ভিতরে দস্যুদলের মুখোমুখি হলো চাচা-ভাতিজা। ডাকাতদের টেক্কা দিয়ে, রুদ্ধশ্বাস অভিযান শেষে, জলদস্যুর বহুমূল্য মুকুটটা কি উদ্ধার করতে পারল ওরা?

দাম ■ আটাশি টাকা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

অফিস থেকে ছুটি নিয়ে রাতদিন এক করে খুঁজল চতুর্দিক। হাসপাতাল, আত্মীয়দের বাসা, এমনকী আফসানার বিদেশী বন্ধুদের কাছেও খোঁজ লাগাল। শেষমেশ থানায় নিখোঁজ হিসাবে একটা জিডি করল। কিছুতেই কিছু হলো না। বেশ কয়েক মাস চেষ্টার পর, কোনও খবর জোগাড় করতে না পেরে অবশেষে ক্ষান্ত দিল মতিন। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভালই হয়েছে তার, জীবন এখন অনেকটাই নির্ঝঞ্ঝাট। আপদ বিদেয় হয়েছে।

রাত দশটা। তিতিরপুর ফারকানি মিউজিয়ামের নিয়মিত ক্লিনার সাদেকুল মান্না বিরক্তিতে নাক কুঁচকে ফেলল। আজ আবার একটা কঙ্কাল এসে হাজির হয়েছে রাজা মামামস্‌সার সিংহাসনের উপর! এই নিয়ে অষ্টমবার। কী ভুতুড়ে কাণ্ড রে, বাবা! নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না তার। অথচ ঘটনাটা ঘটে চলেছে গত কয়েক মাস ধরেই। কথা নেই, বার্তা নেই, রাত হলেই মাঝে-মাঝে উদয় হয় এসব কঙ্কাল। নাহ, কঙ্কাল হাঁটা-চলা করে না, ভয়ও দেখায় না, কেবল রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে থাকে সিংহাসনের উপর। একটা হাত মোবাইল ধরা ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে থাকে কপালের কাছে, আর ঠোঁটবিহীন দাঁতে দেখা যায় হাসির পোজ। এগুলোকে অতি গোপনে কবর দিতে হয় সাদেকুলকেই। কর্তৃপক্ষের কড়া নির্দেশ, এই ভুতুড়ে কাণ্ড পাঁচকান হলে দর্শনার্থী আসা একেবারে বন্ধই হয়ে যাবে মিউজিয়ামে। কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট পানিতে যাবে। তাই কেউ টের পাবার আগেই কাজটা সারতে হয় ওকে। ভয় করে, কিন্তু উপায় কী! জীবিকার স্বার্থে ওটুকু করতেই হয়। তা ছাড়া কঙ্কালগুলো তো মারকুটে নয়, শান্তশিষ্ট।

কঙ্কালটা তুলে সাবধানে বস্তায় ভরল সাদেকুল মান্না। বস্তাটা কাঁধে তুলে পা বাড়াল পিছনের কবরস্থানের দিকে। শীত বাড়ছে, দ্রুত কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে হবে। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। এত রাতে খালি পেটে কাজ করতে ভাল লাগে কারও? একদমই না। ■

শব্দ-ফাঁদ ১২৩

রবীন্দ্র

১	২	৩	৪	৫		৬	৭
৮					■	৯	
১০				■	১১		■
	■		■	■	১২		১৩
১৪	১৫	■	১৬				
১৭		১৮		■	১৯		
■	২০			২১		■	
২২			■	২৩			

সমাধানের সূত্রাবলী

পাশাপাশি

১. ঝগড়াঝাঁটি।
৮. পাকশালা, রান্নাঘর।
৯. সুজনী, শতরঞ্জি।
১০. সঠিক তথ্য, বিবরণ।
১১. বাঞ্ছিত কিছু পাওয়া বা ঘটার সম্ভাবনায় বিশ্বাস।
১২. ১৬ পণ, ১২৮০টি।
১৪. ধূলি, মৃত্তিকাচূর্ণ।
১৬. বাঙালি হিন্দুর ৩৬ শ্রেণী।
১৭. উগ্র, রাগী।
১৯. ফলবিশেষ, নৌকার পাল।
২০. অভিন্নতা, সমতুল্যতা।
২২. পেয়াদা, পদাতিক সৈন্য।
২৩. সাক্ষ্য, সত্যতা পরীক্ষা।

উপর-নীচ

১. বিরহকাতর।
২. সর্পরাজ অনন্ত, শেষনাগ।
৩. দই ও কলা।
৪. আধহাত, বারো আঙুল।
৫. দুধ বা ক্ষীরের উপরের পাতলা আবরণ।
৬. বাদশাহের পুত্র।
৭. কন্দর, গিরিগুহা।
১১. গগন ও পবন।
১৩. নতশির।
১৫. উপযুক্ত, যথোচিত।
১৬. ১/৬ সের, ১/৬ কাঠা।
১৮. ঝলকানি, আকস্মিক ভয় বা বিস্ময়।
২১. কাটা স্থান, ঘা।

সমাধান পাঠাবার ঠিকানা: **শব্দ-ফাঁদ ১২৩, রহস্যপত্রিকা, ২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০।** যাঁদের সমাধান নির্ভুল বিবেচিত হবে, তাঁদের ভিতর থেকে লটারির মাধ্যমে তিনজনকে নির্বাচন করে পুরস্কার হিসেবে তাঁদের প্রত্যেকের ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয়া হবে পরবর্তী তিন সংখ্যা রহস্যপত্রিকা। সমাধান আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছুবার সর্বশেষ তারিখ: **১৫ ডিসেম্বর, ২০১৬।**

সমাধান
শব্দ-ফাঁদ ১২২

মে	ঘ	না	দ	ব	ধ	কা	ব্য
হ	র	ক	রা	■	ন	■	গ্র
ন	খ	■	জ	ল	ভা	ত	■
ত	র	ল	■	খা	গু	র	নি
■	চ	লি	ত	■	র	ঙ্গ	ক
ন	■	ত	ক	দি দ্ধা	র	■	ট
হ	র	ক	ত	■	ক্ষ	রি	ত
লা	ই	লা	ক	■	ক	ল	ম

শব্দ-ফাঁদ ১২২-এ যাঁরা পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন:

১। **মীম**
উত্তর টোলারবাগ,
মিরপুর।

২। **ক্লান্ত পথিক**
চারতালার মোড়
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

৩। **ডাঃ ইন্দিরা রানী ভট্টাচার্য্য**
আকবরশাহ পাহাড়তলী
চট্টগ্রাম।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন

ডিউক জন

আজ যেখানে মাধুরী, কালকে ক্যাটরিনা কাইফ। আজ আসর মাতাচ্ছে শাবনূর, তো কাল সেখানে অপু বিশ্বাস, পরশু হয়তো পরীমনি।

অবশেষে ফিরে এল হৃদি। হৃদিতা হক–যে কিনা হুট করে একদিন হারিয়ে গিয়েছিল ফেসবুক নামের ভারচুয়াল জগৎ থেকে; শুধু সোশ্যাল নেটওঅর্ক থেকেই না, পরিচিত অধিকাংশ মানুষের জীবন থেকেও; সম্প্রতি তোলা এক ছবি আপলোডের মাধ্যমে জানান দিল, হারিয়ে যায়নি ও, স্বেচ্ছা-নির্বাসনে গিয়েছিল কিছু দিনের জন্য।

হৃদির অনুপস্থিতি খেয়াল করে ফ্রেণ্ডলিস্ট চেক করতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছিল কেউ-কেউ। লিস্টে না পেয়ে অনেকেই মনে করেছিল, মেয়েটা ওদের আনফ্রেণ্ড করল কি না। নাকি ব্লক করল। করবার মত সঙ্গত কারণ যেহেতু ছিল না, বুঝতে পেরেছে তখন, আসলে নিজের আইডিটা ডিঅ্যাকটিভেট করে রেখেছে হৃদিতা হক, যে কারণে সার্চ দিয়েও খুঁজে পাওয়া যায়নি ওকে।

চোখের আড়াল হলে মনেরও আড়াল। কথাটা ভারচুয়াল রিয়েলিটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্যক্তিগতভাবে হৃদিতাকে যারা চেনে না, তাদের কাছে ও তো স্রেফ একটা আইডি, রক্তমাংসের কোনও মানুষ নয়। সাইবার জগতের অযুত অস্তিত্বের ভিড়ে একটা ভারচুয়াল মানুষ থাকা-না-থাকায় কী আসে-যায়? রাজা যায়, রাজা আসে। আজ যেখানে মাধুরী, কালকে ক্যাটরিনা কাইফ। আজ আসর মাতাচ্ছে শাবনূর, তো কাল সেখানে অপু বিশ্বাস, পরশু হয়তো পরীমনি। কে কার খবর রাখে?

কিন্তু যারা ওর কাছের মানুষ, নিদেন পক্ষে প্রত্যক্ষ যোগাযোগে ছিল, তাদের জন্য অত সহজ ছিল না হৃদিতাকে ভুলে যাওয়া। এমনই একজন জান্নাতুল ফেরদৌস। হৃদির জানের-জান-প্রাণের-প্রাণ দোস্ত। যতক্ষণ ফেসবুকে থাকত, ওর বাঁধা কাজ ছিল, মিনিটে-মিনিটে খেয়াল করা–হৃদিতা হক (মেঘবালিকা) অ্যাকাউন্টটা জ্যান্ত হয়েছে কি না। বান্ধবীর নতুন ছবি দেখে ধড়াস করে এক লাফ মারল জান্নাতুল ফেরদৌসের হৃৎপিণ্ড। 'হৃদিইইইইইইই...!!!!!' বলে এক চিৎকার দিল ও কমেন্টের ঘরে। প্রথম কমেন্টটাই ওর।

আকস্মিক এই প্রত্যাবর্তনে স্বাভাবিকভাবেই লাইক-কমেন্টের বন্যা বয়ে গেল। সবাই অবশ্য 'লাইক'-এই সন্তুষ্ট থাকেনি। হৃদিতাকে ওরা কতটা পছন্দ করে, সেটা বোঝানোর জন্য অনেকেই চাপ দিল 'লাভ' বাটনে। কেউ-কেউ চাপল 'ওয়াও'। কেউ 'স্যাড'। কেউ 'অ্যাংরি'। ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ সবই।

'ওয়েলকাম ব্যাক,' লিখেছে **আশিক সরওয়ার**।

শফিক হাসান: এতদিন কোথায় ছিলেন?

জান্নাতুল ফেরদৌস: নাম্বার কি আগেরটাই আছে, নাকি নতুন নাম্বার নিছিস? কল যাচ্ছে না কেন? প্লিজ, সোনা, প্লিজ! ইনবক্সে দে নাম্বারটা। এক্ষুণি তোর সাথে কথা বলতে না পারলে মারা যাব! তখন কিন্তু তুই-ই দায়ী থাকবি!

সুস্মিতা জাফর: আমাকেও দিস।

আদনান ফারুক: রহস্যময়ী! বাচ্চাকালে পরীক্ষার খাতায় লিখেছি...নামকরণের সার্থকতা প্রমাণ করো। দেখালি, ভাই, তুই! তোকে দেয়া খেতাবের যথার্থতা প্রমাণ করেই ছাড়লি! আসলেই তুই একটা রহস্য-মানবী।

কামরুন নাহার: শফিক হাসানের মত মিষ্টি করে বলতে পারছি না, সরি। কই ডুব দিয়ে ছিলি, হারামজাদী! একটা খবর পর্যন্ত নেই! সামনে আয়, তারপর এর পাওনা উসুল হবে!

জান্নাতুল ফেরদৌস: মাইর হবে, সাউণ্ড হবে না!

ক্র্যাঙ্কি সেইন্ট: আমার অবাক লাগছে যে, একটা মানুষ কীভাবে এরকম নেটওঅর্কের বাইরে চলে যায়! মোবাইলে নেই, ল্যাণ্ডফোনে নেই, কোথাও নেই! কারও জানা নেই, তুই কোথায়!

নিপুণ: পুরা ফ্যামিলি সুদ্ধা গায়েব! আমি আরও ভাবলাম, সিরিয়া চইলা গেল কি না!

ক্র্যাঙ্কি সেইন্ট: খেক...ভালা কইছস!

নিপুণ: ভ্যাটকাইস না। হাচাই। ডরে-ডরে ছিলাম কয়টা দিন!

খান মোহাম্মদ খালেদ রউফ: জাণ্টু, ট্রিট দে...ট্রিট!

তানজিলা আমজাদ: খানেওয়ালা খান সাহেব আয়া পড়সে! ওই, 'জাণ্টু' কী রে? হৃদি তোর জাণ্টু হইল কবে?

সাইকেলের ডানা: দুইন্নার কথা কইতাছস তোরা, মাগার আসল কথা কেউ কইলি না! চেনা যায় আমাগো হৃদিরে?

ফৌজিয়া খন্দকার স্বর্ণা: আরেহ, তা-ই তো!

প্রিন্সেস বিদিশা: চুল তার কবেকার... (আফসোসের ইমো হবে)

ভোরের পাখি ভোরের পাখি: ওই, তোর চুল গেল কই! এত্ত সুন্দর চুলগুলা... ☹

অনিন্দিতা মুৎসুদ্দি: বয়-কাট না দিয়া চান্দিছিলাই হইতি! গররররর্...

অনীক ধর রানা: হৃদি, শোন...তোর জন্য কী ভোগান্তিটাই না হয়েছে! সেই কোন্ কামরাঙ্গীরচর থাকিস তুই...সপ্তায় অন্তত একবার খোঁজ নিয়েছি ওখানে গিয়ে। প্রথম দু'দিন ভালভাবেই কথা বলল লোকে। তারপর তো আর দরজাই খোলে না। ভগবানই জানে, কী ভেবেছে ওরা আমাকে! নাহ, আশপাশের কেউই তোর খোঁজ দিতে পারেনি। তবে এটা বুঝতে পেরেছি, একেবারে বাড়ি ছাড়িসনি তোরা, দীর্ঘ সময়ের জন্য অন্য কোথাও গেছিস। আচ্ছা, কোথায় গিয়েছিলি, বল তো! এখনও কি ওখানেই আছিস?

তামজীদ মাহিন: হা-হা-হা! মনে হয়, ডাকাইত ভাবছে তোরে...যে একখান মোচ! তামিল হিরোর ভাত নাই বাংলায়।

অনীক ধর রানা: হালা, মাকুন্দা! জ্বলে, না?

জান্নাতুল ফেরদৌস: নাম্বারটা দিলি না!

সুস্মিতা জাফর: আমিও পাই নাই।

বৈশাখী ঝড়ের রাত্রিতে: মানায় নাই।

জান্নাতুল ফেরদৌস: মানে?

বৈশাখী ঝড়ের রাত্রিতে: বললাম, ছোট চুলে মানায় নাই।

ফটোগ্রাফার তানভীর: যা-ই বল, ছবিটা কিন্তু ভালই আসছে। ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটে ফুটছে ভাল। তুলছে কে? ফটো-ক্রেডিট দিস নাই কেন? আচ্ছা, এক্সিফটা একটু বল তো! ম্যানিপুলেটেড মনে হচ্ছে। কী দিয়ে এডিট করছিস? র কপি দেখাতে পারবি?

সাইকেলের ডানা: থামবি তুই? পাইছে একটা জিনিস!

বীথি সায়ন্তনী: আমার নাম বীথি সায়ন্তনী। আমি একটা ছড়া বলব। 'কুঁচবরণ কন্যা রে, তোর মেঘবরণ কেশ; অমন সাধের চুলগুলা কে টাইনা করল শেষ?'

প্রিন্সেস বিদিশা: আহা রে, আমার চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা! কী বুইঝা তুই কেশ বিসর্জন দিলি (আহাজারির ইমো হবে)!

নীহারিকা চাকমা: আমার কি মনে হয়, জানিস...পরচুলা পরেছে হৃদি। সামনা-সামনি দেখা হলে সারপ্রাইজ দেবে। ওই যে...তেল না শ্যাম্পু–কীসের বিজ্ঞাপনে দেখায় না?

জান্নাতুল ফেরদৌস: পরচুলা মনে হয় না। বাই দ্য ওয়ে, নাম্বার কিন্তু এখনও পাইলাম না।

প্রফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্: দুঃখ পেলাম। আপনার চুল দেখে আপনাকে ফ্রেণ্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলাম। সেই চুল কেটে ফেলে মোটেই ঠিক করেননি আপনি। কথায় আছে: দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। লম্বা চুল হচ্ছে বাঙালি নারীদের বৈশিষ্ট্য। বাঙালি সংস্কৃতির বদলে পশ্চিমা কালচারে গা ভাসানোর অপরাধে আপনাকে আনফ্রেণ্ড করা হলো।

মঈন আলী: বা-বা-বা! আইছে আমার মুরুব্বি! কোথাকার প্রফেসর গো আপনি, আঙ্কেল? আমাদের বন্ধু চুল রাখবে, না ফেলে দেবে, তা আপনি ঠিক করার কে? বাঙ্গালা সংস্কৃতির অভিভাবক হয়েচেন! ফাইজলামির জায়গা পান না, না? 'অ্যাড মি, অ্যাড মি' কইয়া ফ্রেণ্ডলিস্টে ঢুকসেন, আবার আনফ্রেণ্ড মারান!

নিপুণ: হালায় একটা লুইস! মার হালারে!

ক্র্যাঙ্কি সেইন্ট: মারবি যে, পাবি কই! হালায় তো ভাগলওয়া!

নিপুণ: খাড়া তাইলে! আইডি খায়া দিতাছি! ওই, সব গণহারে রিপোর্ট কর!

জান্নাতুল ফেরদৌস: হৃদি, এই-লোকটাকে তুই চিনিস? যার-তার রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করিস কেন?

সানজিদা অ্যামি: তুই কি, দোস্, কালো হইছস একটু? নাকি সাদা-কালো ছবি বইলা এইরকম লাগতেছে?

ফৌজিয়া খন্দকার স্বর্ণা: আরে, ট্যান করছে! বোঝো নাই ব্যাপারটা? ...কী রে, ঠিক বলছি না?

সানজিদা অ্যামি: কী আর কমু, দোস্ত! কেমন জানি...কেমন জানি পিকিউলিয়ার লাগছে তোকে!

ইমতিয়াজ মাহমুদ: হৃদি, তুই কি বিদেশে? দেশে আসবি কবে?

রোকসানা নাজনীন: ভার্সিটিতে কবে আসবি?

মোঃ আসলাম: আমার এই কমেন্টটা হয়তো আপনাদের চোখেও পড়বে না, পড়লেও স্ক্রল করে নিচে চলে যাবেন। আবার অনেকেই হয়তো পুরোপুরি পড়বেন না কমেন্টটা। সবাইকে বলছি: একজন আমার কথায় গুরুত্ব দেয়নি। সে এখন প্রেসক্লাবের ওভারব্রিজের নিচে দলিল লেখকের কাজ করে। কাজেই, সাবধান! ধৈর্য ধরে পুরো লেখাটা পড়বেন। বিষয়টা হচ্ছে: তিনশো টাকার এনার্জি লাইট মাত্র একশো টাকা, শুধুমাত্র কোম্পানির প্রচারের জন্য।

শায়লা শারমিন: এসব কী!

সুস্মিতা জাফর: অ্যাকাউন্ট পাবলিক কইরা রাখলে এই সব বালছাল তো ঢুকবই!

সামান্থা পিয়া: শুকাইছিস অনেক। ডায়েট ধরলি নাকি? চকোলেট বাদ? নাকি ঘোরাঘুরির ফল এইগুলা? রোদে পুড়ে কালো হইছিস, দেখা যায়।

উম্মে কুলসুম: বন্ধু, আমার একটা নোট-খাতা তোমার কাছে রয়ে গেছে কিন্তু! খেয়াল আছে তো? আমি তো ভাবলাম, মেরে দিলা কি না!

জান্নাতুল ফেরদৌস: দূরে গিয়া মর, বেটি চশমিশ! একটু কমন সেন্সও নাই গাধীর!

উম্মে কুলসুম: আমি আবার কী করলাম!

আব্দুল্লাহ আল হাদী: যারে নিয়া এত কথা, তারই তো দেখি আওয়াজ নাই! গ্যালারিতে বইসা পপকর্ন খাইতেছে, মালুম হয়!

শায়লা শারমিন: অনলাইনে আছে কি না, তা-ই বা কে জানে!

আদনান ফারুক: অ্যাই, শোন তোরা! গরম খবর আছে! হৃদির মত নীলও 'ইন' হয়েছে!

সানজিদা অ্যামি: ???

জান্নাতুল ফেরদৌস: মানে কী?

প্রিন্সেস বিদিশা: কথা সত্য! এক্ষণি প্রোফাইল চেক করে আসলাম (খুশিতে পাগল হয়ে যাওয়ার ইমো হবে)!

ইমতিয়াজ মাহমুদ: কিন্তু কথা হইল, অ্যাদ্দিন পর কইথিকা উদয় হইল ব্যাটা? খেয়াল আছে, হৃদিটা উধাও হওয়ার পর থিকাই এই বান্দাও লাপাত্তা? এইটা তো আরেক রহস্য-মানব! ফুল ফ্যামিলি থাকে বিদেশে...খোঁজ যে নিমু, সেই উপায়ও নাই!'

আদনান ফারুক: ট্যাগ তো দিলাম। দেখা যাক, কী কয়।

নীল নির্জন: প্রেজেন্ট, প্লিজ!

ইমতিয়াজ মাহমুদ: হালারে কী করতে ইচ্ছা হয়, ক তো! দিনের পর দিন টেনশনে রাইখা ভেটকি দিতাছে অহন। খাড়াও, হাজিরা দেয়া বাইর করতাছি তুমার!

রোকসানা নাজনীন: কই ছিলি, কী বৃত্তান্ত...খুইলা ক সব! @ নীল নির্জন

নীল নির্জন: সব খুইলা কইতে হইব! আণ্ডিটা না খুললে হয় না? ইজ্জত কা সওয়াল!

রোকসানা নাজনীন: দেখ, পোলা, চেতাইস না! মেজাজ এমনেই বহুত খারাপ আছে!

উম্মে কুলসুম: হৃদি আর তুমি পর-পর 'নেই' হয়ে গিয়েছিলে...কিছু জানো নাকি ওর ব্যাপারে? #নীল

নীল নির্জন: জানব না কেন? ছবিটা তো আমারই তোলা।

ইমতিয়াজ মাহমুদ: এতক্ষণে, অরিন্দম...

জান্নাতুল ফেরদৌস: তার মানে, তুই এখন ওর সাথেই আছিস! দে না, প্লিজ, ওর নাম্বারটা!

উম্মে কুলসুম: অ্যাটেনশন, এভরিওয়ান! সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে! সব সময় পড়ালেখার কথা বলি বলে তোমরা আমাকে 'গাধী' বলো। কিন্তু এক্ষুণি প্রমাণ করে দিচ্ছি, মিস মার্পলের চেয়ে কোনও অংশে কম যাই না আমি...

জান্নাতুল ফেরদৌস: পকপকানি রাখ! কী বুঝছস, সেইটা ক আগে!

উম্মে কুলসুম: না, কমু না...মানে, বলব না। আগে বলো, আর কখনও 'গাধী' বলবে না আমাকে!

জান্নাতুল ফেরদৌস: এইটা আরেক হারামি! গাধী, তুই খ্রাপ! খুব খ্রাপ!

ক্র্যাঙ্কি সেইন্ট: অ্যাদ্দিন ভাবতাম, গাধীটা বইয়ের ভাষায় কেমনে কথা কয়...এই মাত্র বুঝলাম, পুরাটাই শো-অফ ওর...সুশীল সাজার চেষ্টা।

উম্মে কুলসুম: আচ্ছা, আচ্ছা, বলছি। নীলের প্রোফাইলে যাও...লাস্ট পোস্টটা দেখো। একটা গান শেয়ার করেছে কিছুক্ষণ আগে...'তোমায় হৃদ্‌মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না...'

জান্নাতুল ফেরদৌস: তো?

উম্মে কুলসুম: হৃদ্‌মাঝারে...হৃদি...কী মিন করে?

জান্নাতুল ফেরদৌস: কী মিন করে?

সুস্মিতা জাফর: আরে, টিউবলাইট, এইটা বুঝলি না! ডুইবা-ডুইবা পানি খাইতেছে আমাগো হৃদি আর নীল! সাব্বাস, গাধী!

উম্মে কুলসুম: আবার!

জান্নাতুল ফেরদৌস: সত্যি নাকি রে, নীল? তলে-তলে অ্যাদ্দূর! টেরই তো পাইলাম না!

আব্দুল্লাহ আল হাদী: এই জন্যই তো 'মহীনের ঘোড়াগুলি' বলে গেছে: মানুষ চেনা দায়। কী রে, নীল, বাসায় জানে?

কামরুন নাহার: জানে কী রে! আলবত জানে! নীলেরটা না জানলেও হৃদির বাসায় ঠিকই জানে! দেখছিস না, হাওয়া হয়ে গেছে ওর গোটা পরিবার...আবার নীলও আছে ওদের সাথে...কী দাঁড়ায় ব্যাপারটা? আমার তো মনে হয়, শুভ কাজও সারা, হানিমুনে আছে এখন।

সামান্থা পিয়া: @ নীল: রিয়েলি?

নীল নির্জন: হা-হা। একসাথে থাকাটাকে যদি হানিমুন বলে, তা হলে তা-ই সই।

খান মোহাম্মদ খালেদ রউফ: মারেম্মা! আবার ডায়লগও দেয়! বিয়া করলি, আর দাওয়াত পাইলাম না! কিপ্টার কিপ্টা... দুইজনেই!

সামান্থা পিয়া: তোরা কোথায় এখন?

নীল নির্জন: সিঙ্গাপুর।

সামান্থা পিয়া: ফিরবি কবে?

নীল নির্জন: এই তো...সবগুলো কেমো দেয়া শেষ হলেই।

সামান্থা পিয়া: কেমো...মানে!?

জান্নাতুল ফেরদৌস: এসব কী বলছিস তুই! কার কেমো? কীসের কেমো?

নীল নির্জন: হৃদির। ক্যানসার ওর...নন-হজকিন লিম্ফোমা...

জান্নাতুল ফেরদৌস: না-না-না...

সামান্থা পিয়া: ও, মাই গড!

আদনান ফারুক: জোক করছিস, নীল...ভয়ঙ্কর প্র্যাকটিক্যাল জোক! কিন্তু, দোস্ত, রাখাল আর বাঘের গল্পটা জানা আছে তো?

নীল নির্জন: না রে, জোক না! প্রথম যখন শুনলাম, আমিও বিশ্বাস করতে পারি নাই। কিন্তু বাস্তবতা বড় নির্মম, রে! লাইফ নিয়া প্রত্যেকেই আমরা বড়-বড় কথা বলি, কিন্তু একটা সময় আসে, যখন লাইফ ফাকস আস অল! তখন শুধু সুমনের গানটারে বুকের মধ্যে নিয়া আশাবাদী হওয়ার চেষ্টা করা...হাল ছেড়ো না, বন্ধু...

উম্মে কুলসুম: ক্ষমা করো আমাকে...আমি আসলেই একটা গাধী!

সুস্মিতা জাফর: এত বড় একটা ঘটনা...অথচ কেউই তোরা কিচ্ছু জানাইলি না! আমরা কি...

নীল নির্জন: চাইছিলাম জানাইতে। কিন্তু হৃদিই মানা করল। চায় নাই যে, ওর জন্য কষ্ট পাস তোরা। আমারেও বলে নাই প্রথমে। একটা খটকা লাগায় আমিই চাপাচাপি কইরা আসল খবর বাইর করছি খালাম্মার কাছ থিকা...তারপর...

নিপুণ: তুই শালা মাইর খাবি, হারামজাদা! কোন্ হাসপাতাল? জলদি ক...

নীল নির্জন: ন্যাশনাল ক্যানসার সেন্টার। আসবি নাকি? কোনও দরকার নাই। দুইটা কেমো নেয়া হয়ে গেছে অলরেডি। তোদের খুব মিস করতেছে, বলল। তাই ওর অ্যাকাউন্টে ছবিটা আপলোড করে দিলাম। দোয়া করিস...

নিপুণ: দরকার আছে-কি-নাই, আমি বুঝব! তুই শালা আর একটা কথাও কবি না!

আঙুল দিয়ে আলগোছে চোখ দুটো মুছে নিল নীল। কানে হেডফোন গুঁজে আরও একবার শুনতে লাগল লোপামুদ্রার বুক-হু-হু-করা গানটা:

ওরে, ছেড়ে দিলে সোনার গৌর
ক্ষ্যাপা, ছেড়ে দিলে সোনার গৌর
আমরা আর পাব না...আর পাব না...
তোমায় হৃদ্‌মাঝারে রাখিব
ছেড়ে দেব না
তোমায় হৃদ্‌মাঝারে রাখিব
ছেড়ে দেব না... ■

হক বুক স্টল

১৫ স্যর ইকবাল রোড, খুলনা।
রহস্যপত্রিকা সহ সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের নতুন ও সমস্ত রিপ্রিন্ট বই পাওয়া যায়।
মোবাইল: ০১৭৪২-০৩৯৯৫০

প্রশ্ন-উত্তর

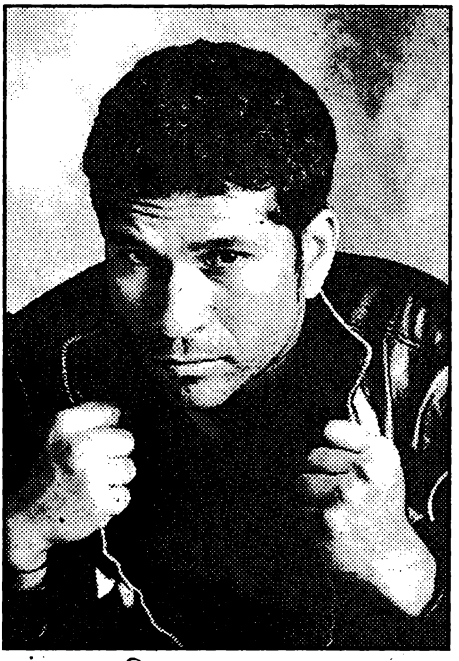

প্রশ্ন: বর্ষাকালে দেশলাই কাঠির বারুদ অনেক সময় মিইয়ে যায়, বাক্সে কী রেখে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব?

উত্তর: কয়েকদানা চাল।

প্রশ্ন: পিরান কী?

উত্তর: ঢিলে ধরনের পোশাক।

প্রশ্ন: কোন পিতলের জিনিসে কোন্ দুটি ধাতু থাকে?

উত্তর: তামা ও দস্তা।

প্রশ্ন: শচীন টেণ্ডুলকার কোন্ দেশে ১০০তম সেঞ্চুরি করেছেন?

উত্তর: বাংলাদেশে।

প্রশ্ন: মহারাষ্ট্রে চিউড়া নামে কোন্ খাদ্য পরিচিত?

উত্তর: চানাচুর।

প্রশ্ন: সোডিয়াম বাইকার্বনেট কী?

উত্তর: বেকিং সোডা।

প্রশ্ন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া কোন্ বিখ্যাত বাঙালী জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: রাধানাথ সিকদার (মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয়কারী)।

প্রশ্ন: সুরসপ্তকের (সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি) প্রতিটি শুদ্ধ স্বর প্রথাগতভাবে কোন না কোন প্রাণীর ডাক অনুযায়ী সৃষ্টি করা হয়েছে বলে প্রচলিত। এর মধ্যে সুরসপ্তকের প্রথম স্বর 'সা' কোন্ প্রাণীর ডাক অনুযায়ী সৃষ্ট বলে মনে করা হয়?

উত্তর: ময়ূর (সা অর্থ ময়ূর)।

প্রশ্ন: সেলভা কী?

উত্তর: দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান অববাহিকায় অবস্থিত ঘন চিরহরিৎ নিরক্ষীয় অরণ্য। ■

সংগ্রহে: **ফরিদা ইয়াসমিন**

আলহাজ্ব মোঃ ইসহাক
চট্টগ্রাম
এখানে মাসিক রহস্যপত্রিকা বিক্রি করা হয়
মোবাইল: ০১৮২৩-২২৭২৫৬, ০১৭১৯-২২৮৮১০
ফোন: ২৫৫৪৭৭

রাক্ষসের হাত

অনীশ দাস অপু

যে হাতটির স্পর্শ তিনি পেলেন সেটি কোনও মানুষের হাত নয়।

অনেক বছর আগে জাপানে একটি বড় সমভূমি ছিল। লোকে বলত ওখানে এক মানুষখেকো রাক্ষস থাকে। ওই সমভূমিতে কেউ গেলে আর ফিরে আসত না। কাছেপিঠের গাঁয়ের মানুষজন ফিসফিসিয়ে নিখোঁজ মানুষগুলোকে নিয়ে ভয়ঙ্কর সব গল্প বলত। বলত রাক্ষসটা পথহারা পথিকদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলে।

একদিন রাতের বেলা ওয়াতানাবি নামে এক সাহসী নাইট ঘোড়ায় চেপে ওই সমভূমিতে এলেন। তখন ঝড়বাদল শুরু হয়ে গেছে। মুষলধারে ঝরছে বৃষ্টি আর পাহাড়ি নেকড়েদের মত গর্জাচ্ছে বাতাস। দূরে কতগুলো গাছের আড়ালে একটি বাতি জ্বলছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ঝড়ে বিপর্যস্ত নাইট।

ওখানে রাতের মত আশ্রয় মিলতে পারে ভেবে ওয়াতানাবি আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখলেন একটা জরাজীর্ণ ছোট্ট কুটির। কুটিরের বাঁশের বেড়া ভেঙে পড়েছে, ফাঁকা জায়গাটায় গজিয়ে উঠেছে ঘাস আর আগাছা। জানালায় কাগজের পর্দাগুলোয় বড়-বড় ফুটো। খড় দিয়ে ছাওয়া বাড়ির ছাদ হেলে পড়েছে।

কুটিরের দরজা খোলা। দরজায় টোকা দিলেন নাইট। এক যুবক, পোশাক দেখে মনে হয় চাষাভুষা, ঘরে বসে ভাত খাচ্ছিল। টোকার শব্দে মুখ তুলে তাকাল। নাইটের পোশাক পরা

ওয়াতানাবিকে দেখে সে খুব অবাক হয়ে গেল।

'শুভ সন্ধ্যা, স্যর,' বললেন নাইট। 'আজ রাতের জন্য আপনার বাড়িতে একটু আশ্রয় চাইছি।'

'নিশ্চয়ই,' বলল কৃষক। 'আপনাকে আপ্যায়ন করার মত কিছুই নেই আমার। তবু আসুন দয়া করে। আপনার জন্য আমি আগুনের ব্যবস্থা করছি। একটু গরম করে নেবেন গা।'

নাইটকে সে আস্তাবলে ঘোড়াটিকে বেঁধে রেখে আসতে বলল। সে আস্তাবলেরও বাড়ির মতই ভগ্নদশা। ওয়াতানাবি আস্তাবলে ঘোড়া রেখে পায়ের বুটজুতো খুলে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। যুবক তাঁকে এক কাপ চা দিয়ে বলল, 'ঘরে লাকড়ি বেশি নেই। কিছু লাকড়ির ব্যবস্থা করা দরকার। আমি যাই। জঙ্গল থেকে কিছু লাকড়ি নিয়ে আসি।' তবে যাওয়ার আগে সে নাইটকে সাবধান করে দিল, 'যেখানে আছেন সেখানেই বসে থাকুন। ভুলেও পেছনের ঘরে যাবেন না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' বললেন নাইট। কৃষকের এই সাবধান বাণী তাঁকে খানিকটা বিস্মিত করল।

চলে গেল কৃষক। একটু পরেই চুল্লির আগুন নিভে গেল। আলো বলতে রইল শুধু একটি টিমটিমে লণ্ঠন। পেছনের ঘরে যেতে মানা করে গেছে কৃষক যুবক, কিন্তু তার কথার সুরটা ওয়াতানাবির মধ্যে কেমন অস্বস্তি এবং সে সঙ্গে কৌতূহলও বাড়িয়ে তুলছিল।

অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন পেছনের ঘরে একবার উঁকি দিয়ে দেখবেন। ঘরের মালিক তো আর কিছু জানতে পারছে না। ওয়াতানাবি পা টিপে-টিপে পেছনের ঘরে গেলেন। ধাক্কা মেরে খুলে ফেললেন দরজা। যা দেখলেন তাতে তাঁর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। মেঝে বোঝাই মানুষের হাড়গোড়, ঘরের এক কোণে স্তূপ করে রাখা মরা মানুষের খুলি। সেই খুলির পাহাড় মেঝে থেকে ছাদে গিয়ে ঠেকেছে।

ওয়াতানাবি দ্রুত তাঁর বুটজুতো পরে আস্তাবলের দিকে রওনা হলেন। কারণ ঘোড়ার পিঠে তিনি অস্ত্রশস্ত্র রেখে গেছেন।

কিন্তু আস্তাবলে ঢুকে যেই তরবারির দিকে হাত বাড়িয়েছেন, মনে হলো কেউ একজন তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। পেছন থেকে ভেসে এল কৃষকের কণ্ঠ, 'প্রিয় অতিথি, এই ঝড়জলের রাত্রে চলে যাবার এত তাড়া কীসের? আপনাকে যেখানে উঁকি দিতে নিষেধ করা হয়েছিল সেখানে কি উঁকি মেরেছিলেন? হায়! আমরা তো ভালভাবে কথাই বলতে পারলাম না।'

এ কথা বলার পরপরই একটা হাত চেপে ধরল ওয়াতানাবির মাথার শিরস্ত্রাণ। পাঁই করে ঘুরলেন নাইট, চট করে মাথায় হাত দিলেন দেখতে কে তাঁর মাথা চেপে ধরেছে। তবে যে হাতটির স্পর্শ তিনি পেলেন সেটি কোনও মানুষের হাত নয়। হাতে বড়-বড় শক্ত-শক্ত লোম। আর হাতটিও গাছের গুঁড়ির মত প্রকাণ্ড।

গা মুচড়ে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন ওয়াতানাবি এবং পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখলেন সেই চাষা তার মানুষের রূপ বদল করে এখন রাক্ষসের চেহারা ধরেছে। এটাই তার আসল রূপ। উচ্চতায় সে দুই মানুষ সমান লম্বা। ভাঁটার মত জ্বলজ্বলে চোখ, লম্বা-লম্বা চুলগুলো যেন ফণাতোলা সাপ, মুখভর্তি টকটকে লাল দাঁত।

রাক্ষসটা আবার তাঁকে ধরার জন্য থাবা চালাল। ওয়াতানাবি রাক্ষসের হাত লক্ষ্য করে

সেবা প্রকাশনী এবং প্রজাপতি প্রকাশনের সব ধরনের বইয়ের জন্য বগুড়ায়
মুসলিম বুক ডিপো
আকবরিয়া মার্কেট, বগুড়া।
ফোন: ৬৪২৬৪
মোবাইল: ০১৯১১-৪০২৭৮২

প্রচণ্ড জোরে তরবারি চালিয়ে দিলেন। ব্যথায় হাউমাউ করে উঠল রাক্ষস, পিছিয়ে গেল। এবারে নাইট তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে আক্রমণ করলেন রাক্ষসকে। দানবটা নিরীহ পথচারীদের পথ ভুলিয়ে নিজের ডেরায় নিয়ে আসতে পটু হলেও মারামারিতে মোটেই দক্ষ নয়। সে নাইটের সঙ্গে লড়াইতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিল।

পলায়নপর রাক্ষসের পিছু ধাওয়া করলেন ওয়াতানাবি, তবে ওটা গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত হারিয়ে গেল। আস্তাবলে ফিরে এলেন ওয়াতানাবি। পায়ে কী একটা ঠেকল। ঝুঁকে দেখেন রাক্ষসের কাটা হাত। মারামারির সময় নাইটের তরবারির আঘাতে কাটা পড়েছে হাতটি।

ওটাকে কাপড়ে মুড়ে নিয়ে কোয়োটোতে, নিজের বাড়ির পথ ধরলেন ওয়াতানাবি। রাক্ষসের কাটা হাত নিয়ে যাচ্ছেন বিজয়ের স্মারক হিসেবে দেখাতে। বন্ধুদেরকে কাটা হাতটি দেখানোর পরে তারা সবাই তাঁকে 'হিরো' বলে সম্বোধন করল এবং তাঁর সম্মানে বিরাট ভূরিভোজের আয়োজন করল। ওয়াতানাবি রাক্ষসের হাত কেটে এনেছেন, এ খবর শীঘ্রি ছড়িয়ে পড়ল। দূরদূরান্ত থেকে লোকজন আসতে লাগল কাটা হাতখানা দেখার আশায়।

কিন্তু ওয়াতানাবি জানতেন রাক্ষসটা এখনও বেঁচে আছে এবং তার হাত চুরির চেষ্টা করতে পারে। তাই তিনি খুব শক্ত কাঠ দিয়ে একটি বাক্স বানালেন, চারপাশটা মুড়ে দিলেন লোহায়। সেখানে হাতটি রাখলেন এবং কাউকেই ওটা দেখতে দিলেন না। নিজের ঘরে নিয়ে এলেন বাক্সটি যাতে ওটি কখনও চোখের আড়াল না হয়।

কয়েকদিন পরে, এক রাতের বেলা ওয়াতানাবির কাছে এল এক দর্শনার্থী। বৃদ্ধা মহিলাকে দেখামাত্র তিনি চিনতে পারলেন: এ তার শিশুকালের দাইমা। মহিলা ওয়াতানাবিকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। তিনি দাইমাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন। যদিও অবাক লাগছিল ভেবে এত রাতে তাঁর কাছে কেন এসেছে বুড়ি।

দু'জনে মিলে চা পান করার পরে বৃদ্ধা বলল, 'প্রভু, রাক্ষসের সঙ্গে আপনার সাহসী লড়াইয়ের কথা এতদূর ছড়িয়েছে যে আমার মত বুড়ো মানুষের কানেও তা এসেছে। এ কথা কি সত্যি আপনি এক রাক্ষসের হাত কেটে নিয়েছেন? ঘটনা সত্যি হলে শতমুখে আপনার প্রশংসা করতে হয়।'

'হ্যাঁ, ঘটনা সত্যি,' স্বীকার করলেন ওয়াতানাবি। 'তবে লজ্জার ব্যাপারই বলতে হবে রাক্ষসটাকে আমি হত্যা করতে পারিনি। দানবটা তার কাটা হাত ফেলে রেখেই পালিয়ে যায়।'

'ওহ্! সত্যি আপনার সাহসের কোনও তুলনাই নেই! দয়া করে আমাকে হাতটি দেখতে দিন!' অনুনয় করল সে।

'আমি দুঃখিত,' বললেন ওয়াতানাবি। 'আমি তা পারব না। রাক্ষসরা খুব প্রতিহিংসাপরায়ণ। আমি যদি বাক্সটি এক মুহূর্তের জন্যও খুলি, রাক্ষস হঠাৎ উদয় হয়ে হাতটা কেড়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই আমি ওই হাত কাউকে দেখাই না।'

'আপনার সাবধান হওয়ার পেছনে যুক্তি আছে,' বলল বৃদ্ধা। 'কিন্তু আমি আপনার পুরানো দাইমা। আমাকে হাতখানা দেখতে দিতে অসুবিধে কোথায়? এতখানি পথ বয়ে এলাম শুধু হাতটি দেখতে। আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন, প্রভু?'

বৃদ্ধার কাতর অনুনয় এবং হতাশ চেহারা নাইটকে বিচলিত করে তুলল। তবু তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

এবারে রেগে গেল বৃদ্ধা। 'আপনার কি ধারণা আমি রাক্ষসের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতে এসেছি?'

'না, আমি অবশ্যই তা ভাবছি না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ওয়াতানাবি। 'আপনি আমার বুড়ি দাইমা।'

'তাহলে এই বুড়ো মানুষটার মনের ইচ্ছাটা একবার পূরণ করুন,' কাতর গলায় বলল বুড়ি। তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

স্নেহ এবং ভালবাসার কাছে পরাজয় মানতেই হলো নাইটকে। বললেন, 'ঠিক আছে। আমি আপনাকে রাক্ষসের হাত দেখাব। আসুন আমার সঙ্গে।'

তিনি বৃদ্ধাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন। সাবধানে বন্ধ করলেন দরজা, তারপর ঘরের কোণে রাখা বাক্সের লোহায় মোড়ানো ভারী ঢাকনিটা খুলে ধরলেন।

'দেখি, আমাকে একবার দেখতে দিন,' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল বৃদ্ধা। সে জ্বলজ্বলে মুখে এগিয়ে আসতে লাগল।

বাক্সের সামনে এসেই সে হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে, চেপে ধরল রাক্ষসের কাটা হাত। তারপর এমন ভয়ঙ্কর জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে গোটা ঘর কেঁপে উঠল থরথর করে। 'আমি আমার হাত ফিরে পেয়েছি!'

চোখের পলকে বুড়ি ধাত্রী সেই ভয়ানক রাক্ষসে পরিণত হলো। ছাদে গিয়ে ঠেকল তার মাথা। ওয়াতানাবি সবসময় সঙ্গে তরবারি রাখেন, সাঁৎ করে কোমরের কোষ থেকে মুক্ত করলেন ধারাল অস্ত্রটি। রাক্ষস জানে ওয়াতানাবি অস্ত্র চালনায় কতটা দক্ষ। সে আর মারপিটের দিকে না গিয়ে ছাদ ভেদ করে দিল লাফ। এক লাফে ছাদ ফুটো করে মিলিয়ে গেল রাতের আকাশে।

লোকে যদিও ওয়াতানাবি এবং রাক্ষসের কাটা হাতের গল্প বলত গর্ব ভরে কিন্তু নাইটটি রাক্ষসের ওপরে ভয়ানক চটে গিয়েছিলেন তাঁকে এভাবে কাঁচকলা দেখানোর কারণে। রাগের চোটে তিনি চলে গেলেন সেই ভুতুড়ে সমভূমিতে দানবটার সঙ্গে লড়াই করতে। কিন্তু ঝড়ের কবলে পড়ে চাষার কুটির ততদিনে ধসে গেছে এবং বাতাস ও বৃষ্টিতে সেই হাড়গোড় ও খুলিগুলো মাটির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছে।

অদৃশ্য রাক্ষসকে উদ্দেশ্য করে তরবারি বাগিয়ে তাঁর মুখোমুখি হওয়ার জন্য একের পর এক চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যেতে লাগলেন ওয়াতানাবি। কিন্তু জবাবে শুধু উপহাসের মত হাসির শব্দ শোনা গেল। এতই হালকা সে আওয়াজ যা পাইন গাছের ডালে বয়ে যাওয়া বাতাসের শব্দ বলেই মনে হয়। ■

প্রকাশিত হয়েছে
অনুবাদ
দুটি বই একত্রে

দ্য লায়ন'স স্কিন/রাফায়েল সাবাতিনি/সায়েম' সোলায়মান: মা'র করুণ মৃত্যুর বদলা নিতে ইংল্যাণ্ডে এসেছে ক্যারিল। উদ্দেশ্য: রাজদ্রোহিতার দায়ে ফাঁসিয়ে দেবে লর্ড অস্টারমোরকে, যিনি ওর জন্মদাতা হয়েও ওর সবচেয়ে বড় শত্রু। কিন্তু ঘটতে শুরু করল একের পর এক আজব ঘটনা। ক্যারিলের দ্বিধাবিভক্ত মন শোধ নেয়ার আগে ভালোবেসে ফেলল এক অসহায় অনাথ মেয়েকে। ওদিকে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছে ওরই সৎ ভাই, তাতে ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড। শেষ পর্যন্ত যে-নাটকীয় ঘটনা ঘটল, সে-ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও কোনো ধারণা ছিল না ক্যারিলের।

দক্ষিণের যাত্রী/জুল ভার্ন/ডিউক জন: বন্দিশিবির থেকে এল পয়গাম। কিন্তু যথাযথ কর্তৃপক্ষের আচরণ কংস মামার মতো। মানবিকতার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে রাজনীতির নোংরা খেলা। শেষ পর্যন্ত বাকি রইল একটা কাজই। বিপন্ন জাহাজীদের উদ্ধারে এগিয়ে চলল ওরা সাতজন। ...মানুষগুলো কোথায়? প্রকৃতির হারামিপনা তো রয়েছেই, ষোলো কলা পূর্ণ করতে মুখ খিঁচাল রক্তলোভীর দল। প্রাণ বাঁচানোই এখন দায়। এত কিছু সামলে পাবে কি অভিযাত্রীরা সেই মানুষটির হদিস– যার আছে দুই জিভ, দুই হৃৎপিণ্ড?

দাম ■ একশ' আটত্রিশ টাকা

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বই-পরিচিতি

মীর কাশেম আলী

সোয়ালো–হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড। রূপান্তর–সায়েম সোলায়মান। প্রকাশক–সেবা প্রকাশনী। পৃষ্ঠা–৪০৮ (নিউজপ্রিন্ট)। দাম–১৪১ টাকা।

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের আরেকটি শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনি এটি। দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল ঘেঁষে যাচ্ছিল একটা জাহাজ। ভীষণ ঝড় উঠল সাগরে। জাহাজটা ঝড়ে পড়ল। কিন্তু ওই জাহাজ থেকে বেঁচে ফিরে এল রাল্‌ফ্‌ নামের এক ইংরেজ ছেলে। শুরু হলো ঘটনার পর ঘটনা–যা পড়তে গিয়ে পাঠক

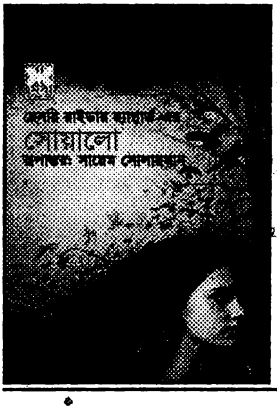

রোমাঞ্চিত না হয়ে পারবেন না। এখানে কাহিনির সামান্য অংশ তুলে দিচ্ছি: মিনিট পাঁচেকের মধ্যে নদীর একেবারে মাঝখানে এসে পড়ল ওরা। এখানে স্রোতের গর্জন সবচেয়ে বেশি, শক্তিও সবচেয়ে বেশি। রোনটার মাথা বার-বার ডুবে যাচ্ছে পানিতে, তখন কোনওভাবে নাকটা তুলে রাখতে পারছে ওটা। সুয্যান আর সিহাম্বা ধরেই নিল একাধিকবার, আর পারবে না রোনটা, ডুবে যাবে, সেই সঙ্গে ডুবে মরবে ওরাও। দু'জনের ভার বহন করতে কষ্ট হচ্ছে ভেবে একটা কাজ করল সিহাম্বা এমন সময়। পিছলে নেমে পড়ল সে ঘোড়াটার পিঠ থেকে, রোনের ঘাড়টা নিজের জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে স্রোতের বিরুদ্ধে। ওটার কেশর খামচে ধরে ভেসে আছে কোনও রকমে, ওটার সঙ্গে তাল রেখে দুই পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগোনোর চেষ্টা করছে। ওদিকে স্যাডল হর্ন সর্বশক্তিতে আঁকড়ে ধরে ঘোড়াটার পিঠে বসে আছে সুয্যান, এই পরিস্থিতিতে কী করা যায় সে-ব্যাপারে কোনও বুদ্ধিই খেলা করছে না ওর মাথায়...। হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের অন্যান্য বইয়ের মত এ বইটিতেও রয়েছে পাতায়-পাতায় চমক। বইটি শীঘ্রি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। রনবীর আহমেদ বিপ্লবের প্রচ্ছদ কাহিনির সঙ্গে মানিয়ে গেছে।

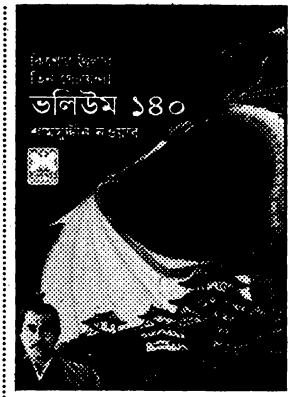

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১৪০–শামসুদ্দীন নওয়াব। প্রকাশক–সেবা প্রকাশনী। পৃষ্ঠা–১৭৬ (নিউজপ্রিন্ট)। দাম–৭৭ টাকা।

তিন গোয়েন্দার এই ভলিউমে মোট তিনটি কাহিনি সংকলিত হয়েছে। বদলী মহিলা সেক্রেটারি আসার পর থেকে একে-একে বিগড়ে যেতে লাগল গ্রীন হিলস স্কুলের যন্ত্রপাতিগুলো। ওই মহিলা কি গ্রেমলিন? কারণ দুষ্ট প্রাণীটার সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত মিল...। 'গ্রেমলিন' নামের গল্পটির শুরু হয় এভাবেই। 'ঘড়ি-রহস্য' একটি গোয়েন্দা কাহিনি। গোল্ডউইন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্মিলনীতে যোগ দিয়েছে তিন গোয়েন্দা, সঙ্গে আছেন জ্যাক নানা। মাঝরাতে রহস্যময় আলো আসে কোথা থেকে? আর ভুতুড়ে ক্লক টাওয়ারের রহস্যটাই বা কী? জড়িয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা 'ঘড়ি-রহস্য' উদ্‌ঘাটন করতে। এবার সংকলনটির তৃতীয় কাহিনি 'মেঘ-ড্রাগন' থেকে সামান্য অংশ এখানে তুলে

দিচ্ছি: দূরে একটা ঘণ্টা বাজছে। শব্দটা জোরাল হলো। এবার ঘোড়ার খুরের শব্দ। কিশোর আর জিনা গুটিসুটি মেরে বসল। সামান্য মাথা উঁচিয়ে রাখল যাতে জানালা দিয়ে দেখতে পায়। ফুলভরা গাছের ডাল ভেদ করে, ওরা দেখতে পেল বাগান চিরে ছোট এক শোভাযাত্রা আসছে। ওই শোভাযাত্রার নেতৃত্বদানকারী লোকটা ঘণ্টা বাজাচ্ছে। ব্যানার তুলে ধরে, দু'জন লোক পায়ে হেঁটে অনুসরণ করছে তাকে। তাদের পিছনে মন্থর গতিতে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে চারজন লোক। তাদের সবার পরনে ঢোলা ট্রাউজার আর শার্ট। মাথা কামানো, তবে কালো চুলের গিঁট রয়েছে। প্রত্যেকের দুটো করে তরোয়াল—একটা লম্বা, একটা ছোট—কোমর থেকে ঝুলছে। শোভাযাত্রার শেষে অশ্বারোহী এক লোক। তার পরনে বেগুনী তরঙ্গায়িত আলখিল্লা আর ছোট বেগুনী হ্যাট। তার প্রকাণ্ড কালো ঘোড়াটার লাগাম থেকে লাল-লাল ঝালর ঝুলছে...। তিন গোয়েন্দার এই ভলিউমটি কাহিনির বৈচিত্র্যের জন্য পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করবে। দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদের জন্য ভিক্টর নীলকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয়।

ভালবাসার পদাবলী। সম্পাদনায়—ইভান ফেরদৌসী ও মীর আজাদ। প্রকাশক—নূর-কাসেম পাবলিশার্স, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। পৃষ্ঠা—১০৪ (হোয়াইটপ্রিন্ট)। দাম—২০০ টাকা।

দশজন নবীন লেখকের মোট বিশটি গল্প সংকলিত হয়েছে 'ভালবাসার পদাবলী'-তে। সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট, রহস্য-রোমাঞ্চ ও হরর—সব ধরনের স্বাদই পাওয়া যায় গল্পগুলো পড়তে গিয়ে। লেখকদের সবার লেখাই যে মানসম্মত—এ কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না, তবে তাঁদের লেখায় আন্তরিক প্রচেষ্টার কোনও কমতি ছিল না—এটি নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে। এখানে রুবেল কান্তি নাথ- এর 'প্রেতাত্মার প্রতিশোধ' থেকে সামান্য অংশ তুলে দিচ্ছি: অপরূপা বাথরুমে বসে আয়েশ করে সুগন্ধীযুক্ত সাবান ঘষতে থাকল শরীরে। ঠিক তখনই বুঝতে পারল, পানিতে বসেও ওর গায়ে যেন আগুন ধরে গেছে। ফট-ফট করে খই ফোটার মত একটার পর একটা ফোস্কা পড়তে শুরু করল ওর মোমের মত ফর্সা শরীর জুড়ে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল ও। কিন্তু কোনও এক কারণে চিৎকার বাথরুমের বাইরে যাচ্ছিল না।

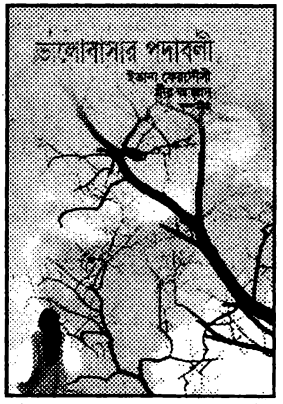

হঠাৎ করে ও শুনতে পেল, কেউ যেন ওর এহেন দুরবস্থা দেখে খন-খন গলায় শব্দ করে হাসছে। হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছে। ওর অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে শ্যামলা রঙের এক মানবী। ওকে মানবী বললে ভুল হবে। হয়তো কোনও এক সময় ছিল। হাসতে হাসতে ও এগোতে লাগল অপরূপার দিকে। অতি বীভৎস চেহারার দানরীটা ওকে রেহাই দিল না। শুরুতেই বিশাল নখযুক্ত হাত দুটো দিয়ে থাবা বসাল ওর অস্বাভাবিক উঁচু বুকটাতে...। তরুণ লেখকদের পরিশ্রমের ফসল 'ভালবাসার পদাবলী'-র মত ভবিষ্যতেও এ ধরনের আরও গল্প-সংকলন প্রকাশের জন্য পাঠকদের পক্ষ থেকে প্রকাশকের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে রাখলাম। ■

বইয়ের জগতে আপনাকে স্বাগতম

সেবা ও প্রজাপতি প্রকাশন-এর গল্প, উপন্যাস, ওয়েস্টার্ন, ক্লাসিক, অনুবাদ, তিন গোয়েন্দা, কিশোর হরর, মাসুদ রানা ও যাবতীয় রিপ্রিন্ট বই বিক্রেতা

নিউজ হোম

৭ গোল্ডেন প্লাজা, সোনাদিঘির মোড়, রাজশাহী।

সেবা প্রকাশনী

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই বই পাঠানো যাবে।

গ্রাহক চাঁদা

রহস্যপত্রিকা

ষান্মাসিক সডাক ২২৫.০০ টাকা, বার্ষিক সডাক ৪৪৫.০০ টাকা

সেবা'র আগামী কয়েকটি বই

১/১২/১৬	ক্যামেলটের জাদুকর+কয়েন-রহস্য+মৃত্যুকূপ (তিন গোয়েন্দা ভলিউম-১৪০/২)		শামসুদ্দীন নওয়াব
৭/১২/১৬	বেনামী চিঠি	(অনুবাদ)	আগাথা ক্রিস্টি/সায়েম সোলায়মান
৭/১২/১৬	ডুয়েল	(ওয়েস্টার্ন)	তৌফির হাসান উর রাকিব
১৩/১২/১৬	দ্য গোস্ট কিংস	(অনুবাদ)	হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড/সাইফুল আরেফিন অপু